সুন্দর, হে সুন্দর

অমিয়রতন মুখোপাধ্যায়
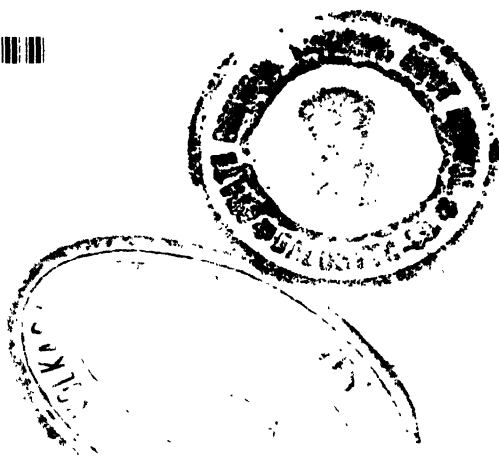
শান্তি লাইব্রেরী

কলিকাতা :: এলাহাবাদ

সুন্দর, হে সুন্দর

প্রথম প্রকাশ : ভাদ্র, ১৩৬২

প্রকাশক : অজিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

শান্তি লাইব্রেরী

১০-বি, কলেজ রো, কলিকাতা—৯

৮১, হিউয়েট রোড, এলাহাবাদ—৩

মুদ্রাকর—অজিতমোহন গুপ্ত

ভারত ফোটোটাইপ স্টুডিও

৭২।১, কলেজ স্ট্রীট,

কলিকাতা—১২

প্রচ্ছদপট : আশু বন্দ্যোপাধ্যায়

পাঁচ টাকা

শ্রীমতী কল্পনা দেবী মুখোপাধ্যায়কে
দিলাম

সাধনামন্দির : কলিকাতা-৮
৫. ৫. '৬২

এই লভিনু সঙ্গ তব, সুন্দর, হে সুন্দর।
পুণ্য হল অঙ্গ মম, ধন্য হল অন্তর,...
তোমার মাঝে এমনি করে
নবীন করি লও-যে মোরে,
এই জনমে ঘটালে মোর, জন্ম-জন্মান্তর,
সুন্দর, হে সুন্দর॥

—রবীন্দ্রনাথ

জানালার সার্সি ভেদ করে' ভোরের আলো ঘরে এসে পড়তেই ঘুমটা ভেঙে গেল। 'জয় শ্রীবুদ্ধদেব' বলে' বিছানা ছেড়ে' উঠে পড়লাম।

মনে হ'ল—গত ছত্রিশটা বৎসর যেন ঘুমিয়েই ছিলাম, আজ-ই আচম্বিতে উঠলাম জেগে। গতকাল ছত্রিশ বছর আমার পূর্ণ হল—জন্মদিবস উপলক্ষে সারাদিন ব্যস্ত থাকতে হ'ল অতিথি-অভ্যাগতদের সম্মানে। যাকেই আসতে দেখলাম, উঠে দাঁড়ালাম কৃতাঞ্জলি। 'বহুত মেহেরবানী' বললাম কৃতজ্ঞ। স্মিতমৌনে গ্রহণ করলাম অভিনন্দন।......ফুলে-ফুলে ভরে গেল গৃহ, গানে-গানে মুখর হ'ল ঘরের আকাশ, প্রীতি-উপহারে পূর্ণ হ'ল বস্তুবিলাসী সংস্কারের অহংকার।......অবারিত প্রাপ্তির পুলকে সামাজিক বিধি ও নিয়মগুলোকেই যৌবনের রসোচ্ছ্বাস বুঝি মনে হ'ল? পেয়ে পেয়ে দেহ হ'ল ক্লান্ত, হৃদয় শ্রান্ত, তবু ক্ষুধাতুর মনে শেষ কোথায় আরো চাওয়ার! সন্ধ্যায় সম্বর্ধনা-সভায় এলাম আরো কী নূতন পাওয়ার নেশায়!

সভায় এলেন বোম্বে শহরের অসংখ্য গণ্যমান্য। এলেন মাননীয় গভর্ণর মহোদয়, এলেন মাননীয় মন্ত্রিবর্গের-ও কেউ কেউ, এলেন সরকারী কর্মচারীমহলের অনেকে, এলেন কবি, সাহিত্যিক ও অধ্যাপকবৃন্দ, এলেন মঞ্চ ও সিনেমার দেশপ্রসিদ্ধ অধিকাংশ অভিনেতা, এলেন স্বপ্নচারিণী হৃদয়শোভনা রূপরম্যা অভিনেত্রীরা, এলেন সুরশিল্পী, নৃত্যশিল্পী—এমন কি চিত্রশিল্পীদেরো অনেকে।

কিন্তু ব্যক্তিহিসাবে কার কথাই বা এখন আমার মনে পড়ছে? মনে হচ্ছে: অনুরাগী শোভনভক্তজনের অনুপম একটা সমষ্টিরূপের প্রতিচ্ছায়ার সামনে মুহূর্তকাল দাঁড়ালাম সম্মোহিত। তারপর ঘুমিয়ে পড়লাম কী যেন

নেশার উত্তেজনায়। কিংবা হয়তো এই কথাই ঠিক—আত্মা থেকে যন্ত্রে নিলাম আকস্মিক জন্ম, হাসলাম যন্ত্রের মত নিখুঁত ছন্দে, মুখ তুললাম যান্ত্রিক সৌজন্যের স্বাচ্ছন্দ্যে, কথা বললাম যন্ত্র-নিয়মিত মাধুর্যের সুর-ঝংকারে!

দেশবিখ্যাত আমি নট এবং নাট্যকার, ভক্তরা বলেন: শিল্পী-মণ্ডলের একচ্ছত্র আমি মহানায়ক, আর কবিবন্ধুরা: অত্যুজ্জ্বল মহান 'চিত্র-সূর্য', চিত্র-তারকারা যার প্রভায় নাকি অন্ধকার। তবু আমার সৌভাগ্য এই: প্রতিষ্ঠার অহংকারে মন আমার মলিনান্ধ হয় নি এখনও। মনে মনে আমি জানি—আমার চেয়ে বড় আছে দেশে অনেকে, আরো, আরো আ—রো বড় হবে যারা, তারাও আবির্ভূত হচ্ছে সাধনান্তে।

এই স্বীকৃতি সুস্পষ্ট ভাষায় প্রকাশ করতে কখনও কোথাও দ্বিধা করি নি, তাই বোধ হয় বন্ধুদের ধারণায় আমি আরো বড়, আরো মহান! সাফল্যের আনন্দোচ্ছ্বাসে অহংকার যদি অনুভব করে' থাকি কখনও, বিনয়ের নম্রতায় তা ঢেকে রাখার সৌজন্য আছে আমার চরিত্রে, কী জানি এইজন্যই বুঝি সকলের আমি প্রিয়, সবার আমি শ্রদ্ধাভাজন!

সারাজীবন ধরে চাইলাম কত কী, কিন্তু পেলাম-ও তো অনেক। আজ আমার যশের অন্ত নেই, অর্থের অভাব নেই, সুখ-বিলাসেরও নেই সীমা। অন্ততঃ জন্মোৎসবের সম্বর্ধনাসভায় গণ্যমান্যরা আর বন্ধু-বান্ধবীরা এই কথাই তো বললেন বারবার। আজকের সকালের সংবাদপত্রে সেই সব অভিনব কথামালার প্রকাশ দেখব বড় বড় হরফে। পত্রের প্রথম পাতাতেই হয়তো মুদ্রিত থাকবে আমার 'বুদ্ধ' চিত্র—দেশ বিদেশের শিল্পীরা আমার কীর্তি ও কৃতিত্ব সম্বন্ধে যখন যা বলেছেন, সে-সব হয়তো ছাপা হবে নূতন করে, নূতন উদ্দীপনায় আর একবার সুরু হবে 'অটোগ্রাফ-হান্টার'দের আক্রমণ। আমার দারোয়ান তাদের সামনে গেট রাখবে বন্ধ করে'—তবু তারা আমার জয় গাইবে, দর্শন চাইবে, স্পর্শন পেলে তো কবিতা লিখবে উচ্ছ্বসিত আবেগে।...আর কী চাই বলো?

'বাথরুম' থেকে স্নানাদি-সেরে' ভাব-সম্মোহিতের আচ্ছন্নতায় প্রবেশ করলাম 'ড্রয়িংরুমে'।—দেশ আমাকে গ্রহণ করেছে, আর কী চাই বলো? সংসারজীবনে মানুষ, বিশেষ ক'রে কাঁচাবয়সের তরুণ-তরুণী, যা চায়, যা পেলে মনে করে জীবন হ'ল ধন্য, আমি তো পেয়েছি। পেয়েছি অগণিত জনসাধারণের শ্রদ্ধানম্র স্নেহদৃষ্টি, পেয়েছি অগণ্য অপরিচিতের স্বপ্নময় কান্তপ্রেম, পেয়েছি দেবভোগ্য ললনাকুলের ভক্তিশুদ্ধ ভাবপ্রণাম, পেয়েছি ঈর্ষাবিহীন বন্ধু-সমাজের অযাচিত অবারিত ভালোবাসা। আর কী চাই?

একি, আরো কিছু চাই নাকি? মন কেন হাহাকার করে এখনও? কী চাই? কেন শান্ত নই, ক্ষান্ত নই অন্তরে? কী পেলে শান্ত হবে মন, আমি জানি না, তবু কেন যে হঠাৎ মনে হ'ল, যা' পেয়েছি তা কিছুই না, এতদিন যা' পাওয়ার জন্যে কেঁদেছি—দীর্ঘ ছত্রিশটা বছর ধরে' নিদ্রাঘোরেই তা' যেন চেয়েছি কাঙালের মত।

আজ কি তবে আমার জাগরণ হ'ল? এটাও আমার ঘুমিয়ে থাকা স্বপ্ন-দ্যাখা তো নয়? কে জানে, আরো দু'দশ বছর যদি বাঁচি, একদিন কোনো এক ভাবময় ব্যাকুল মুহূর্তে এখনকার কথাগুলিকে ঘুমঘোরে ভুল-বকা বলে' মনে হবে কি না! অভিনেতার জীবন, কি জানি কেন যে আমার মনে হয়, মায়াঘোরে পড়ে-থাকা স্বপ্নশ্রান্ত যেন ক্লান্ত জীবন। দীর্ঘ ছত্রিশটা বৎসর একটানা ঘুম দিয়ে, নানা-রঙের স্বপ্ন দেখে, নানা ভোগের মোহ মেখে হঠাৎ আজ জেগে উঠলাম অভিনব একটা চেতনার বেদনায়, যেন কেঁদে বললাম: কী যে পেয়েছি, কী যে করেছি এতদিন!

ঘরের দেওয়ালে ধ্যানসমাহিত বুদ্ধের একখানি রঙিন ছবি ছিল টাঙানো। ছবিখানি বাস্তবিক শ্রীবুদ্ধের নয়, আমার। আমার সদ্যপ্রকাশিত নূতন ছবি 'শ্রীবুদ্ধদেব'—চিত্রকাহিনীটি আমার-ই লেখা, বুদ্ধচরিত্রের অভিনয়-ও করেছি

আমি। বুদ্ধবেশে আমাকে অপরূপ মানিয়েছে। হঠাৎ দেখলে মনে হবে এটি গুরুদেব বুদ্ধেরই প্রতিচ্ছবি বুঝি। আমারই ভ্রম হয়। চমকে উঠে অনেক সময় ভাবি, আমি যদি এত সুন্দর, এমনি প্রসন্নমূর্তি, তবে আমার মধ্যে দুঃখ কেন, লোভ কেন, ক্ষোভ কেন, কেন-বা এত অকারণ অবারণ হাহাকার? চিরকাল শুধু নকল নিয়েই থাকব, আসলটি' হব না, 'মারের' সঙ্গে সংগ্রাম করে' জয়ী হব শুধু মিথ্যে ক্যামেরার মায়াময় জীবনে, আর সত্যকার অন্তর্জীবনে মারের কাছে পড়ে কেবল মার-ই খাব, হার-ই মানব?

ছবিখানির সম্মুখে এগিয়ে এসে দাঁড়ালাম। দুই হাত প্রসারিত করে' করুণা চাইলাম কাতর বেদনায়। গাইলাম স্তবমন্ত্র।

—কি পাপ করেছ যে এত অনুতাপ?

বলতে বলতে ঘরের ভেজানো দরজা ঠেলে প্রবেশ করলেন শ্রীমতী শো,, বুদ্ধ-চিত্রের গোপাদেবী।

শো ক'লকাতার অভিনেত্রী। থাকেন ক'লকাতায়। আমার জন্মদিবস উপলক্ষে গতকাল প্লেনে এসেছিলেন বোম্বাই-এ। সন্ধ্যায় সম্বর্ধনাসভায় যোগদান করে' রাত্রে অতিথি হয়েছিলেন আমার গৃহে। আজই তাঁর ফেরার কথা। ফিরতেই হবে। তিন চারটে বাঙ্‌লা ছবির সুটিং আছে তাঁর।

অপূর্ব সুন্দরী শো, আমার চেয়ে দু-তিন বছরের ছোট-ই হবেন তিনি, কিন্তু দেখলে তাঁকে উনিশ-কুড়ি বছরের তন্বী তরুণী বলেই ভ্রম হয় এখনও।

প্রাতঃকালেই শো, দেখলাম, স্নান সেরে নিয়েছেন। ভিজে চুলগুলি পিঠে রয়েছে এলানো, প্রসাধনের মধ্যে কপালে শুধু এঁকেছেন কুকুমের টিপ। অলংকার বলতে কিছুই নেই দেহে, বস্ত্রাদি নিতান্তই সাধারণ, একেবারে আটপৌরে বললেই হয়।

তবু কী সুন্দর তিনি! কী অপরূপ তাঁর মুখশ্রী! এ যেন সেই জাতের রূপসৌন্দর্য, যা একবার শুধু দেখতে হয়, তারপর চক্ষু মুদ্রিত করে' রূপের মাধুর্যটি অনুভবের মধ্যে আনতে হয়, সমাহিত হতে হয় ভক্তের আহ্লাদে! বলতে হয়: কী সুন্দর তুমি!

কিন্তু না, শো আমাকে তা বলতে দিলেন না।

—কী সুন্দর তুমি!

বললেন তিনি-ই, সম্মোহিত পুলকোচ্ছ্বাসে। হাত তুলে নমস্কার করলেন আমার বুদ্ধচিত্রটিকে। চিত্রার্পিতার মত দাঁড়িয়ে রইলেন বেশ খানিকক্ষণ। তাকালেন আমার মুখের দিকে। তারপর আবার:

—কী সুন্দর তুমি!

কথার কি আছে সুরলোকের বিদ্যুৎ-তরঙ্গ? নেই যদি, কী তবে প্রবাহিত হ'ল মস্তিষ্কে, মস্তিষ্ক থেকে হৃদয়ে, দেহে, সর্বাঙ্গে? প্রশংসা শুনেছি অনেক। কিন্তু এমন অবস্থায় এমন সুর এমন মুখে কি শুনেছি কোথাও?

—কী সুন্দর তুমি, বৃন্দাবন!

—না শো,

বললাম ক্ষোভবিহ্বল আত্মলজ্জার ছন্দে:

—সুন্দর নই। এই সুন্দর দেহটার ভেতর কত অসুন্দর পশু আছে লুকিয়ে, কেউ জানে না!...কাল রাত্রে তোমার শয্যার শিয়রে জানো কে চোরের মত এসে দাঁড়িয়েছিল?

—জানি।

—জানো? জেগে ছিলে তখন? তবে তো আমার মুখস গেছে খসে'। দেখে ফেলেছ আমি—

—শিল্পী হলেও সন্ন্যাসী, আর সন্ন্যাস নে'য়া সত্ত্বেও শিল্পী!

—এমনি মনোময় তোমার দৃষ্টি!

—তা না হলে তোমাকে দেখব কেমন করে?

—কিন্তু কুৎসিতের মত রাত্রে গেলাম তোমার পাশে, বুঝতে কি পার" না......ঘৃণা কি জাগে নি অন্তরে ?

—ঘৃণা ? কেন বল ? এ যে আমার সান্ত্বনা, তুমি সন্ন্যাসীই শুধু নও, তুমি শিল্পী। না এসে কি পারো ?

—কিন্তু ধরো, যদি......

—না, তা তোমার পক্ষে সম্ভব নয়। বন্ধু, তুমি অন্তরের বেদনায় সন্ন্যাসী-ও বটে, না-ফিরেও যে পারো না !

—এতটুকুতেই কি মন ভরাবো গো ?

—আমি ভরাবো। তুমি যাই হও বুদ্ধদেব, তুমি পৃথিবীর, তুমি মানুষের, তুমি আমার !

—আমি তোমার, এ আমার আনন্দ—আমার গৌরব। তোমাকে হারাতে চাই না বলেই তো তুচ্ছে আমার মন ভরে না !......উচ্চে-ই যে চাই !

—কিন্তু এতটা উচ্চ তোমাকে দেব না চাইতে, যেখানে আমি পারি না যেতে। বুদ্ধদেব, গোপাকে তুমি ছেড়ে যেয়ো না ! আমার বড় ভয় করে !

—যত তুমি ভয় কর গো, তত আমার লজ্জা !

—তোমার লজ্জা, কিন্তু আমার ভয়। বুদ্ধচরিত্র অভিনয়ে তুমি যখন 'মারের' সঙ্গে সংগ্রাম করছ, তখন তোমাকে দেখে কী ভয় যে আমার হয়েছে। মনে হয়েছে, ও তোমার অভিনয় নয়, ওই তোমার আত্মসত্য। তুমি আগুন, কামনা ছাই করে' দেয়ার জন্যে তোমার জন্ম। কী বীর্যবান তোমার ভঙ্গী, কী অগ্নিগর্ভ যোগিত্বের বিদ্যুৎপ্রবাহ তোমার চোখের দীপ্তিতে !

—মিথ্যা, ওসব মিথ্যা গো ! সব মিথ্যা। শক্তিমান নই বলেই জোর করে' করেছি শক্তির অভিনয়। আমার সংযম কল্পনা করে'—মধুরা গো, যত তুমি শ্রদ্ধা দেখাও, অন্তহীন আর্ততায় ততই আমি ভেঙে পড়ি অন্তরে। কত বড় ভাবো আমাকে, অথচ কত নীচ আমি গোপনে।...কাল সভায়, সবার সামনে, আমার নামে কী না তুমি

বললে, বোধ করি কোনো মহাপুরুষের নামেও এমনি স্তুতিবাদ সম্ভব নয় কারুর পক্ষে।

এ কথার কোন জবাব দিল না শো। ধীরে ধীরে এগিয়ে এল কাছে। আমার কাঁধের ওপর রাখল মাথা। সামনের আরশিটায় দুজনের ছায়া পড়ল। দেখলাম আত্মবিস্মৃত অন্যমনস্কতায়। সমাধিস্থ হলাম যেন। তখন শো আর্তকণ্ঠে :

—সন্ন্যাসী, আমার গায়ের ওপর একখানি হাতও কি রাখতে পারো না!

চমকে উঠলান ইঙ্গিতময় আর্তসুরে! রোমাঞ্চ জাগল সর্বাঙ্গে। শোনিতে শিহরিত হ'ল যৌবনের নৃত্যোচ্ছ্বাস।

গভীর ভাবাবেগে দুহাত দিয়ে জড়িয়ে ধরলাম শো-র কোমলকান্ত ললিত তনু।

হঠাৎ কী যে হ'ল, দৃপ্ত ভঙ্গীতে তাকে তুলে নিলাম বুকের মধ্যে। মুখের ওপর আনতে গেলাম মুখ।

সে কোন চাঞ্চল্য প্রকাশ করল না। উদাসীন সুরে শুধু বলল :

—ছাড়ো!

—না!

—ছি!

বলল শো।...আশ্চর্য!

২

অননুভূত একপ্রকার দুর্জ্ঞেয় বেদনারহস্যের অস্বস্তিতে অভিভূত হ'ল শিল্পচেতনা।...শো চলে গেল, মিষ্টিভাবে একটু সহজ-হাসি-ও হাসতে পারলাম না তার দিক চেয়ে। প্লেনে তাকে তুলে দিয়ে গৃহে ফিরলাম—কিন্তু পরাজয়ের গুরুভারে চিত্তাকাশ রইল ছেয়ে। বহির্জগতের লক্ষ প্রশংসা আমার নামে মুদ্রিত হয়ে এই আজ-ই যখন ছড়িয়ে পড়ছে দেশ থেকে দেশান্তরে, কেউ জানে না—তখনই আমি অবগুণ্ঠিত বিষণ্ণ আত্মার নৈরাশ্যে কী গভীর শোচনায় ব্যথাক্রান্ত।...দেশ জানে আমি সুখী, শিল্পসমাজ জানে আমি ভাগ্যবান, বন্ধুরা মনে করে আনন্দশান্ত আমি স্বপ্নসন্ধানী, অন্তরঙ্গের বিশ্বাস—সদাচারী আমি সাধকসন্ন্যাসী, কিন্তু অন্তর্যামীর পরুষভৎর্সনা—কে বলে দেবে কতকাল, কতকাল আমাকে বইতে হবে, সইতে হবে।...

মন ভারাক্রান্ত, দেহটাকেও বড় ক্লান্ত মনে হ'ল ক্রমশঃ। দারোয়ান দেশভূষণকে ডেকে বললাম, কারুর সঙ্গে আজ আর দেখা হবে না। কেউ এলে যেন বলে দেয়, বড় শ্রান্ত, বড় অসুস্থ।

শো কিন্তু সুস্থ আনন্দেই চলে গেল। তার হাসিতে কী আমি দেখলাম?...কাল সান্ধ্যসভায় শো আমার সম্বন্ধে যা বলল—ক'লকাতার পথে যেতে যেতে কৌতুক কি করছে না তা' স্মরণ করে'?...বুদ্ধ-চরিত্র অভিনয়ের পূর্বেই সন্ন্যাস আমি নিয়েছি, অন্তরেবাহিরে সন্ন্যাসী চাইছি হতে।—কিন্তু ভালোই সে যদি বেসেছে, এমনি করে কি তবে দেখিয়ে দিতে হয়, আমি কী! গোপন গহনে আমি যা-ই হই, এই বিশ্বাসে তো সুখী-ই ছিলাম: আমি বুদ্ধশিষ্য, আমি সন্ন্যাসী। অশুভক্ষণে এল শো, কেন এল, কেন জাগিয়ে দিল ভিতরকার মানুষটাকে! জাগিয়ে দিয়ে কেন দেখাল আঙুল দিয়ে: দেখ, দেখ, তুমি এই!

তা আমি সত্যই তো এই, আমি মানুষ। এই থেকে উঠতে চাইছি, পারছি না। পারছি না—এটা কি নূতন ক'রে জানাতে হয়!

শো এসে কিন্তু জানিয়ে দিয়ে গেল। ভালবেসেছে, তাই বুঝি দয়া করল না। জানিয়ে দিয়ে গেল, আমি তুচ্ছ অভিনেতা মাত্র, আর কিছু না।...আমার বুদ্ধ-ছবিটার দিকে অন্যমনস্কভাবে একবার চোখ তুললাম। মনে হ'ল—নকল দেখে ঘুম থেকে উঠি, নকলকে শোনাই মন্ত্রবেদনা, নকল হওয়া ছাড়া তাই বুঝি আমার গত্যন্তর-ই নেই। ও-ছবি তবে ভেঙে ফেলা উচিত। আসলের স্থান নকলে নেয় বলেই জীবনে এত দুর্গতি!

—কী ভাবছ এত?

শো বলেছিল খাবার-ঘরে টেবিলে প্লেট সাজাতে সাজাতে:

—অমন বিষণ্ণ মুখে বসে বসে কী ভাবছ, বু? কী এমন হ'ল যার জন্যে এমনটা হঠাৎ হয়ে গেলে?

—কই, কিছু তো হয় নি শো!

বলে' সহজ হওয়ার একটু চেষ্টা করলাম। কিন্তু আমার মত অভিনেতা-ও হার মানল। পারল না সহজ হতে।

শো হাসল। সে হাসি যেন তীরের মত বিঁধল মর্মে।

—আমাকে তাড়াতে পারলেই এখন বাঁচো বোধ হয়!

অসহায়ের মত চাইলাম শো-র মুখের দিকে। শো বুঝল আমার মনোভাব। তবু দুষ্টামি করল নিষ্ঠুর নৈপুণ্যে:

—একটু পরেই তো বিদায় হবো, বু।

—ক্ষমা করো শো, ক্ষমা করো আমাকে! তুমি যে আমার ঘরে অতিথি-ও বটে, এটা ভুলে গেছি।

—ছি!

চমকে উঠলাম আবার 'ছি'-শব্দে! এ-ছি'-এর আবার সম্পূর্ণ নূতন ধ্বনি। নূতন আবেশ। শো আমার চেয়ে ঢের বড় আর্টিষ্ট। সত্যই

বড়। একটি 'ছি'-ধ্বনির সুর-সম্মোহনে সে পশুকে আনতে পারে মানুষের পথে, কাঙালকে দেখাতে পারে ধনিকের ঐশ্বর্য। বললাম:

—বুদ্ধকে গুরু করেছি, লোকে জানে। কিন্তু কেউ জানে না গুরুর আশীর্বাদ-ও পেয়েছি অন্তরে। তুমি, শো, আমার গুরুর আশীর্বাদ!

—আবার ভয় দেখাচ্ছ 'নটি' বয়!

কতদিন পরে শুনলাম শো-র মুখে সেই 'নটি বয়।' কাঁচা বয়সের শ্যামসমারোহ স্মরণ করিয়ে দিল এই সবুজ শব্দধ্বনি। দশ-এগারো বছর আগে শো-র কাছে যখন কারণে-অকারণে প্রায়-ই যেতাম, কতবার অভিভূত হয়েছি সেই নির্জন মন্ত্রের সুরঝংকারে, কত রোমাঞ্চ, কত মোহাতি, কত উত্তেজনা, কত শিহরণ করেছি অনুভব।...আজ কিন্তু লজ্জা এল, এল ধিক্কার যেন। মুখেও বুঝি প্রকাশ হয়ে পড়ল আত্মযন্ত্রণার চিত্ররেখা।

শো তা দেখল। বুঝল। দুঃখও পেল বুঝি। বলল:

—আমাকে কি সত্যই দূরে সরিয়ে দেবে? দিতে পারো?

—এ-কথা কেন শো? আমার জীবনে তুমি যে কী, আজ-ও কি ব্যাখ্যা করে' বলতে হবে?

শো-র মুখখানি কেমন যেন অসহায়ের মত দেখাল।

—আমাকে মার্জনা কর বু।...আমার অপরাধ আমি স্বীকার করছি!

বলতে বলতে শো চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। এল আমার কাছে। আচম্বিতে বসে পড়ল আমার কোলের ওপর। জড়িয়ে ধরল গলা। বলল মিনতিময় মমতার সুরে:

—নাও। যেতে চাইবো না। যা করবে করো।

সমাধিস্থের মত বসে রইলাম, স্পন্দহীন।

—তুমি কি পাথর?

—না শো!

শো আমার গালের ওপর রাখল গাল। একখানি হাত আনল আমার ঠোঁটের ওপর। সুরু করল গোপা'র অভিনয়:

—আমি কী করেছি তোমার? কেন বিষণ্ণ হয়ে থাকো বসে?... দিতে চাই, কেন চাও না নিতে?

তারপর স্বর বদলে, আবার:

—কই, উত্তর দাও!

অসহায়ের মত হাসলাম। শো বলল:

—ক্যামেরার সামনে না হ'লে বুঝি চোখ জ্বলে না, মুখ খোলে না?

—ক্যামেরার সামনেই আমি সন্ন্যাসী। ঘরে যে কী—

—আমি-ই জানি। পাথর। না, পাথরও নয়। পাথরে তবু ঝর্ণা কলকল করে।

—আমাতে যদি তা না করতো—

—বড় ভালো হ'ত, নয়?

ভালো হ'ত কি মন্দ হ'ত জানি না শো। শুধু এইটুকু জানি—তুমি আমাকে অনেক শিখিয়েছ, আরো অনেক—

—শেখাবো? তবে আজ-ই একটি কথা শেখো খোকাবাবু, বলো: ভালবাসা শিখেছি!

কিছু না বলে' গভীর ভাবাবেগে শো-র কাঁধে একখানি হাত রাখলাম।

—ওই দেখ,

শো উঠে পড়ল তীব্রবেগে:

—ভালবাসা-বাসি করতে গিয়ে ওদিকে খাবারগুলো গেল ঠাণ্ডা হয়ে।

—তুমি ব'সো, শো। 'বয়'কে ডাকি। তুমি আজ আমার অতিথি।

—অতিথি? তোমার আজ কী হ'ল বু, আমি গুরু, আমি অতিথি, কী ভুল-ই করেছি বিনা নিমন্ত্রণে তোমার কাছে এসে—

বলতে বলতে শো উঠে গেল দ্রুতচাপল্যে। চলনে তার বিজয়িনীর নৃত্যছন্দ! নয়নে, সংগ্রামজয়ের গৌরবজ্যোতি।......

—সাব্!

বলে' দেশভুষণ সেলাম দিয়ে খানিকটা তফাতে এসে' দাঁড়াল।

অত্যন্ত সঙ্কুচিত হয়ে এগিয়ে দিল একটা কার্ড!...নাম দেখলাম একজন আই. সি. এস. অফিসারের। এসেছেন অভিনন্দন জানাতে।

—বলে' দে শরীর ভালো নেই।...ঘুমুচ্ছি।

সেলাম দিয়ে দেশ চলে গেল নিঃশব্দে।

শরীরটাকে যতদূর সম্ভব প্রসারিত করে' দিয়ে ইজিচেয়ারটায় শুয়ে রইলাম অনেকক্ষণ।...শো এখন আকাশচারিণী, মেঘের গতি তার মনে, সূর্যের আলো তার মুখে। শো একদিন বলেছিল, আমি নাকি এত দূরে একদিন উঠে যাব, যে নাগাল পাবে না কেউ। সামাজিক যশ ও প্রতিষ্ঠা পেয়েছি বলে' লোকে মনে করে শো-র ভবিষ্যদ্বাণী বুঝি মিথ্যা হয় নি। আমার-ও তাই বিশ্বাস ছিল, ছিল দম্ভ! মানুষের কাছে বন্ধুর ছদ্মবেশ ধরে', বিনয় দেখিয়ে সাধুভাবে, মিষ্টচরিত্রের সৌহার্দ্য প্রকাশ করে' সজ্ঞানে, সকলের উচ্চে ওঠার, উচ্চে থাকার লজ্জাকর যে আশ্চর্য দম্ভ—আমার মধ্যে তা' ছিল তো প্রচ্ছন্ন! অনেকের চেয়ে আমি বড়, বোধ করি সকলের চেয়ে! এমন কি সাধু গুরুদের চেয়ে-ও! তাঁরা তো থাকেন মানুষ থেকে দূরে, পর্বতে, কান্তারে, মঠে, আশ্রমে। আমার মত 'অসংখ্য বন্ধন মাঝে' কে পেয়েছে মুক্তি? সহস্র নারীর বিলোল কটাক্ষের সম্মুখে কে থেকেছে সমাধিস্থ? কে ভেবেছে সিনেমার বিলাসময় পিচ্ছিলপথে-ও টাল রাখা যায় সংযত শান্তছন্দে!

—মিথ্যা, সর্বৈব মিথ্যা,

ভিতর থেকে কে যেন বলল পরুষগর্জনে। চমকে জেগে উঠলাম, হেসে উঠলাম অকারণে।—পুরুষের সংযম, অভিনেতার আবার সন্ন্যাস! এতটুকু ইঙ্গিতে যারা টলে পড়ে, এতটুকু মিষ্টতায় যারা গলে যায়, ভুলে যায় আত্মবিজ্ঞান, আত্মমর্যাদা, তারা নেবে সন্ন্যাস, তারা হবে সংযমী?...মেয়েদের, সিনেমার মেয়েদের, বাইরে থেকে লোকে নিন্দা করে। কিন্তু এটা তো কেউ একবার ভেবেও দেখে না, যে, অন্ধ পুরুষগুলো সন্ন্যাসের দিব্য

সৌন্দর্য দেখতে চায় না, কিংবা পায় না বলেই মেয়েদের চরিত্রে নামে কলঙ্ক! প্রেম বলতে শো যা বোঝে—আমি কি তার মর্যাদা দিতে পারলাম? কেন শুনতে হ'ল 'ছি'-সুরের সাবধানবাণী? ধুলোয় মুখ লুকিয়ে কেন কাঁদতে হ'ল, পরাভূত? প্রেমের সূক্ষ্মবোধের স্বপ্নানন্দেই আছে সন্ন্যাসসুখের শান্ত সৌন্দর্য—এটা কেন প্রকাশ পেল না আমার চরিত্রে? যদি পেত, দুর্বল মুহূর্তটিকে জয় করতে যদি পারতাম, শো আমাকে কত বড়-ই না ভেবে যেত। বুঝে যেত পুরুষের শক্তিমহিমা। বুঝে যেত শুধু অভিনয় করি নি বুদ্ধসুন্দরের দিব্য চরিত্র, অন্তরত হয়েছি সুন্দরে, কেননা জগতকে সুন্দর করতেই শিল্পীর আবির্ভাব!

—আঃ,

বলে' পাশ ফিরে শুতে গিয়ে হঠাৎ উঠে বসলাম।

—দেশ,

ডাক দিলাম দারোয়ানকে। বারান্দায় বেরিয়ে এসে অত্যন্ত ব্যস্তভাবে আবার:

—দেশভূষণ!

—সাব্

বলে' একরকম ছুটেই এল দেশভূষণ।

—যে-সাহেব এসেছিলেন দ্যাখা করতে, চলে গেছেন?

দেশ জানাল, অনেকক্ষণ হল সে-সাব্ চলে গেছেন!

—চলে গেছেন?...আচ্ছা যা তুই!

অন্যমনস্কভাবে ফিরে এলাম ঘরে।...ঘুম, একটু ঘুম চাই।

কিন্তু আই, সি, এস সাহেবটি বড় ক্ষুণ্ণ হয়েই ফিরে গেলেন হয়তো! হঠাৎ এ কী! হৃদয়ের গহনে এ আবার কী নবতর অনুভাব। সূক্ষ্ম সান্ত্বনার এ কী আশ্চর্য সুখানুভূতি: শো কিন্তু ক্ষুণ্ণ হয়ে ফেরে নি। আত্মবিস্মৃত অহংকারে সত্য সত্যই যদি নিস্পৃহ থাকতাম, শো কি তাহ'লে শান্তি নিয়ে

ফিরতে পারত? এটাই কি ভালো হ'ল না—বিজয়িনীর মত ফিরল শো, জেনে গেল আমি আছি, তারি আছি? সে আমাকে ভাববে—সর্বহীন আমি দূরের পথিক, কখন-ও আর ফিরি না পিছন পথে, এ-চিন্তায় আমিও কি কখন-ও শান্তি পাব? নিপ্রেমতা যদি সন্ন্যাস, তবে সে-সন্ন্যাসে শিল্পীর কী হবে?

রহস্যঘন একটা বেদনার আবেগে ককিয়ে উঠল কাতর মন।

—তুমি আমাকে কি সত্যই দূরে সরিয়ে দেবে?

কানে বেজে উঠল শো-র কাতরোক্তি।

—না শো। আমার জীবনে তুমি প্রেরণা, তুমি চেতনার দেবী অধিষ্ঠাত্রী। ...হেরে-ই যদি গিয়ে থাকি, তা আমারি থাক।...তুমি যেন জয় পাও আমার জীবনে। সংসারে সবাই জানুক আমাকে সন্ন্যাসী বলে', কিন্তু একমাত্র তুমি, শুধু তুমি-ই আমার জেনে থাকো—আজ-ও আমি সেদিনের সেই নবীন তরুণ, বয়স আমার পঁচিশ পেরোয় নি।

বয়স তখন আমার পঁচিশ-ই হবে, 'ফিলসফি-'তে এম্-এ দেয়ার উচ্চাকাঙ্ক্ষায় ভর্তি হয়েছি ক'লকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে,—চিত্র-শিল্পী হওয়ার নেশা জাগল, গোপনে শিল্পীমহলে ও পরিচালকমহলে ঘোরাঘুরি করলাম সুরু।

বাঙলাদেশকেই স্বদেশ বলে জানি—যদিও অবাঙালী আমি, জন্মস্থান উত্তরপ্রদেশ লক্ষ্ণৌ। ক'লকাতাতেই মানুষ, বলতে কি ক'লকাতা আমার শিল্পশিক্ষার তীর্থভূমি। লেখাপড়ার জন্যে বাবা আমাকে একটু বেশি বয়সেই পাঠিয়েছিলেন শান্তিনিকেতনে, তারপর শান্তিনিকেতন থেকে আমাকে আসতে হয় ক'লকাতায়। থাকতাম দাদুর কাছে, দাদু, আমার মাতামহ। দাদুর একমাত্র সন্তান আমার মা। আমি ছিলাম দাদুর বিশেষ স্নেহভাজন। বাঙলায় আপনারা যাকে বলেন, অন্ধের যষ্ঠি, শিবরাত্তিরের সল্‌তে, আমি তাঁর কাছে তা-ই-ই ছিলাম। দাদুর কাছে মানুষ হতে পেয়ে এই ভালোটুকু আমার হয়েছিল—আমি স্বাধীনজীবনের স্বাদ পেয়েছিলাম। যখন যা করতাম, করতাম সম্পূর্ণ স্বেচ্ছায়, কিছুতেই তিনি নিষেধ করতেন না। যখন যা তাঁর কাছে চেয়েছি, পেয়েছি; যখন যা করেছি, তাঁর সমর্থন অনুভব করেছি অন্তরে!... অগাধ সম্পত্তির মালিক, অনেকগুলি ব্যবসার একচেটিয়া বিধাতা, তার ওপর অনেকগুলি সিনেমাকোম্পানীর প্রভাবসম্পন্ন সক্রিয় ডিরেক্টর ছিলেন দাদু। ফলে উঠ্‌তি বয়সে যতগুলি সুযোগসুবিধা পাওয়ার প্রয়োজন ছিল, পেয়েছিলাম বিনা আয়াসেই।

অবাধ স্বাধীনতা ছিল বলেই একেবারে মন্দ হয়ে যেতে পারি নি এই আমার বিশ্বাস। তার ওপর, এ-যুগের তরুণসমাজ শুনে হয়তো হাসবেন, ধর্মবোধের একটি সূক্ষ্ম প্রভাব ছিল আমার চরিত্রে। এ-বোধ আমি মা ও দাদুর কাছ থেকে এবং সর্বোপরি মায়ের গুরুজীর কাছ থেকে

আহরণ করেছিলাম। বিভিন্ন চরিত্রের ছেলেমেয়ের সঙ্গে আমি মিশেছি, হৈ-হুল্লোড় যে কম করেছি তা নয়, কিন্তু অহরহ অনুভব করেছি—কে একজন অনাসক্ত মানুষ বসে আছে আমার মর্মমূলে! পাপের পথে নেমেছি কৌতূহলী, অসামাজিক লিপ্সার অতলে নামতে গেছি মত্তের মত, হঠাৎ কে যেন আমাকে হাত ধরে টেনে তুলেছে, অঙ্গুলী নির্দেশে দেখিয়ে দিয়েছে পথ।

কিন্তু ক্ষোভ রয়ে গেল এম্-এ পাসটা আর আমার করা হ'ল না। লেখাপড়ায় অবশ্য ভালোছেলে ছিলাম না কোন কালেই, তবু চেষ্টা করলে এম্, এ পাসটা যে করতে পারতাম না, তা নয়। 'ছবি ছবি' করে সে-সময় মত্ত হলাম, দু-খানিতে প্রতিনায়ক এবং একখানিতে নায়কের ভূমিকা অভিনয় করে' নাম করলাম আশাতীত: বাঙ্লার মা বীণাপাণি গ্রন্থবিদ্যার কৃচ্ছ্রসাধনটি মস্তিষ্ক থেকে নিলেন কেড়ে, হৃদয়ে দান করলেন শিল্পবিদ্যার ভাবানুরাগ।

শ্রীমতী শো—তখন বাঙলাদেশের একজন সর্বজনবরেণ্যা প্রতিভাময়ী চিত্রাভিনেত্রী। অপরূপ সুন্দরী। যেন কালিদাসের শকুন্তলা কি সেক্‌শ্‌পীয়রের জুলিয়েট। তাঁর অনেকগুলি ছবি আমি দেখেছি। মনে মনে, কারুকে অবশ্য জানাই নে, আমি তাঁর অনুরাগী, তাঁর ভক্ত। স্বপ্নে কতবার অভিনয় করতে গেছি তাঁর সঙ্গে। হাত ধরতে গেছি, 'ভালবাসি' বলে'। বলা-তে গেছি, 'আমি-ও তোমাকে', কিন্তু কী জানি কেন, ধীরে ধীরে 'ফেড্ আউট্' হয়েছে তাঁর মূর্তি। চিৎকার করেছি, 'কই, বলে' যাও'। উত্তর পাই নি।

এ-হেন শো, বন্ধু সু একদিন বললেন, আমার ছবি দেখেছেন। নাকি প্রশংসা-ও করেছেন উচ্ছ্বসিত অনুরাগে। একদিন আসতে-ও পারেন দেখা করতে।

সু আমার অভিন্নহৃদয় বন্ধু। অবিশ্বাস করি না তাঁর কথা। আমার চেয়ে পাঁচ সাত বছরের বড় হলে-ও সমবয়সীর মত তাঁর অন্তরঙ্গ ব্যবহার।

শো-র সঙ্গে তাঁর বিশেষ হৃদ্যতা আছে বলে' জানি, শো সম্বন্ধে অনেক কথা-ও শুনেছি তাঁর মুখে। কিন্তু আমার মত একজন সাধারণ অভিনেতাকে তাঁর মত শিল্পী আসবেন সম্মান জানাতে—এ-কথা সহজে কি বিশ্বাস হয়! স্বপ্ন কখন-ও সত্য হয়? স্বপ্নচারিণী হয় প্রাণপ্রতিমা?

সু জোর দিয়েই বললেন, হয়, হয়, আলবৎ হয়। অর্থাৎ তিনি আসবেন, স্বপ্ন আমার সফল-ও করবেন। কিন্তু দিন গেল, স্বপ্ন হল না সফল, শো এলেন না। এমন কি আমার ক'লকাতার বন্ধুরা যখন আমাকে কেন্দ্র করে' একটা অভিনন্দন সভার আয়োজন করলেন, সে-সভায় তিনি আসবেন, গান গাইবেন বলে' কথা দিলেন, তবু-ও এলেন না।

বন্ধুরা বিমর্ষ হলেন। সু হলেন বিশেষভাবে ক্ষুব্ধ। আর আমি—আশাভঙ্গের নৈরাশ্য গোপনে ঢেকে বাইরে হাস্যমুখে করলাম কৌতুক:

—তিনি আসবেন, এটা তোমরা সাহস করে' ভাবতে-ও পারো কি করে'? যেখানে সেখানে তিনি শিল্পী, কেন আসবেন?

—আলবৎ আসবে, তার বাপ আসবে, বলল সু, উত্তেজিত, ক্রোধান্ধ। বন্ধুদের অনেকেই সু-র এই কাপুরুষোচিত উক্তিতে কি যে আনন্দ পেল, হো হো করে' হাসল আকাশ ফাটিয়ে। আমার কিন্তু মনের গোপন থেকে সমস্ত বেদনার রসাস্বাদ হল তিরোহিত। বেশ ছিলাম 'তিনি আসেন নি'—এই বেদনার স্বপ্নগহনের অহেতুক অভিমানটুকু নিয়ে, কিন্তু বন্ধুবর্গের ইতর ভদ্রোক্তির প্রবল ঝঞ্ঝাঘাতে মুহূর্তেই তা বিলীন হল শূন্যতায়। উক্ষ হয়ে উঠল মন:

—তুমি সু, একটি লোফার যেন, বললাম উদাসীন।

—আর যিনি কথা দিয়ে কথার ঠিক রাখেন না?

—হয় তিনি বিশেষ কোনো কাজে ব্যস্ত, নয় অসুস্থ।

—বিশেষ কোনো কাজে ব্যস্ত! অসুস্থ!—সু উত্তেজিত হ'ল চতুর্গুণ ক্রোধে: তার সম্বন্ধে কী জানো তুমি?

—কিছুই জানি না সু। কিংবা যা জানি তাই-ই যথেষ্ট: তিনি শিল্পী, তিনি স্রষ্টা।

—অকোয়ার্ড। তোমার কোনো কথার অর্থই পাই নে খুঁজে। তাকে না দেখেই এত প্রেম?

—বলতে পারো বাঙ্‌লাদেশে তাঁর প্রতি প্রেম নেই কার?

—আমার আর নেই।

—মানুষ থেকে তবে পশুজগতে গেলেই পারো!

—তাই যাবো হে!

বলল সু, কতকটা উদাসীন আক্রোশে। বন্ধু-সভা নিস্তব্ধ হল কিছুক্ষণ। অভিনন্দিত হতে এসে এমনভাবে বিড়ম্বিত হব, কে জানত? সু-কে কৌতুক করে' কথাটা এক সময় বলেও ফেললাম। সু কোনো কথা বলল না। গুম হয়ে বসে রইল। তারপর মুখ ভার করে' কখন যেন উঠে গেল কারুকে কিছু না বলেই।

প্রায় মাসখানেক গেল কেটে এর পর। সু-র আর দেখা নেই। বন্ধুমহলে কানাঘুষা শুনলাম : শ্রীমতী শোর সঙ্গে সে নাকি খুবই অভদ্র ব্যবহার করেছে সেই ব্যাপারটা নিয়ে। শ্রীমতী শো তাই তার সঙ্গে বন্ধুত্বের বন্ধন করেছেন ছিন্ন। ব্যাপারটা খুবই খারাপ লাগল। এমন একজন মহান শিল্পীর মান দিতে জানে না সু, অথচ শিক্ষার অহংকার করে, ঐশ্বর্যের দম্ভ দেখায়। চিত্র-জগতে শো-র জনপ্রিয়তার অনুকূলে সু নাকি অঢেল টাকা ব্যয় করেছে বলে' শুনি। তা করেছে বলেই কি অন্যায় দাবী সে করতে পারে? শো শিল্পী, তার ওপর মহিলা, অনিন্দ্য-সুন্দরী, অনুপম সৃষ্টি বিধাতার—যেদিক দিয়েই বিচার করুন না কেন, তিনি সম্মাননীয়, তাঁর ওপর অভদ্র আচরণ কি করে' মানুষ করে? অন্যায় চিন্তা-ই বা আসে কেন তাঁর সম্বন্ধে?

সু-কে চিঠি লিখলাম এই মর্মে। সু উত্তর দিল না। একদিন কিন্তু অপ্রত্যাশিতভাবেই এল আমার গৃহে।

—শো-র কাছ থেকে আসছি,

বলল গম্ভীর ঔদাস্যে :

—যাবে ব্ব তার কাছে !

—হঠাৎ ?

—সে তোমার অনুরাগিণী। তোমাকে দেখতে চায়।

সু-র কথার সুরে কেমন যেন পরিহাসের শ্লেষ রহস্য। মনটা তিক্ত হয়ে উঠল অকস্মাৎ। তবু সংযত সুরে বললাম :

—তিনি আমার অ্যাড্‌মায়রার, এ-কথা যদি সত্যি হয়, আমি কৃতার্থ। কিন্তু তাই বলে' যে বাড়ী বয়ে তার কাছে অকারণে যেতে হবে, এমন কি কথা আছে !

—অনুরাগিণীর মান রাখতে যাবে, এটা অকারণে যাওয়া হল ?

—পরিহাসটা ভদ্রোচিত হ'ল না সু।

—তাহ'লে যাবে না ?

—না।

—এটা তোমার প্রতিশোধ নে'য়া হচ্ছে, ব্ব।

—প্রতিশোধ ?

—তা নয় তো কী ? শো একদিন নিজে থেকে বলেছিল, আসবো। আসে নি।...কিন্তু আসবো যে বলেছিল—এতেই তো তোমার ওপর তার অনুরাগ প্রকাশ পেয়েছে, ব্ব ! প্রতিশোধ নিয়ো না, তার মান রাখো, চলো !

—চুপ করে' রইলে কেন ?...কথা বলো ?

—× × ×

—একটা মেয়েমানুষের ওপর এমন অভিমান রাখা কি ভালো ?

তীব্র বিরক্তি জাগল সু-র কথার ভঙ্গিতে। মনে হল, বন্ধু নয় সু। বন্ধু মনে করে' ভুল করেছি এতদিন। বললাম :

—আমার কাজ আছে, সু !

—উঠতে বলছ ?

—× × ×

—তবে তাকে কী বলবো?

—আমাকে তার সঙ্গে কেন জড়াচ্ছ সু?

সু, মনে হল, একটু যেন তুষ্ট হল এই প্রশ্নে।

কিন্তু পরক্ষণেই ক্ষুণ্ণ স্বরেঃ

—তাকে আনতে পারলাম না তোমার কাছে, তোমাকে নিয়ে যেতে পারলাম না তার কাছে!

— × × ×

—বু, বন্ধুর কথা রাখো! একবার চলো!

—ক্ষমা কর, সু! এ-প্রসঙ্গ থামাও!

—তাহ'লে যাবে না?

—না।

—কখন-ও না?

—অন্ততঃ তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে কখনও না-যাওয়া-ই সঙ্গত।

—মানে?

—মানেটা তুমি কি আমার চেয়ে কম বুঝছ?

সরল বালকের মত মুখ করে' সু আমার দিকে তাকাল। কী অসহায় অথচ নির্মেঘ তার চাউনি।...সু আমার চেয়ে যে কত বড় অভিনেতা, আজ যখন এ-সব চিন্তা করি, তখন তা' স্বীকার না করে পারি না। সু বললঃ

—তোমাদের সব কথা আমি বুঝতে পারি না, বু!

সু-র এ-কথায় কি বিশ্বাস সেদিন করি নি?

অবশ্য শো-র কাছে আমি গেলাম না—এবং সু এতে অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ-ই হল যেন। গম্ভীর বিষাদে মুখটা কালো করে' গেল চলে। বোধ হয় ভাবলাম, সু-র কথামত একবার গেলেই পারতাম!

কেটে গেল আরো কয়েকটা দিন। সু-র মধ্যে একটা আশ্চর্য পরিবর্তন লক্ষ্য করলাম ক্রমশঃ। সে নানা পত্র-পত্রিকায় আমার শিল্প নৈপুণ্য সম্পর্কে নানা কথা প্রচার করতে সুরু করল অপ্রত্যাশিতভাবে।

সিনেমার পত্রিকাগুলোতে আমার ছবি ছাপল নূতন রঙে। প্রেস-রিপোর্টারদের পাঠাল কারণে অকারণে। ভাড়াটে লেখকদের দিয়ে আমার জীবনকথা, চরিত্র, শিক্ষাদীক্ষা ও আদর্শ সম্বন্ধে ছাইভস্ম কত কী লেখাতে লাগল বিচিত্র কৌশলে। আমি কী করি, সকালে কী খাই, কী পড়তে ভালবাসি, কোন লেখক আমার প্রিয়, রাজনীতিতে আমার বিশ্বাস আছে কি না, গান্ধীজি কতবার এসেছেন আমার দাদুর কাছে, রবীন্দ্রনাথ কবে কী বলেছেন আমার সম্বন্ধে, কবে শান্তিনিকেতনে রক্তকরবী-নাটকে 'বিশু-'র ভূমিকা অভিনয় করে' পুরস্কার পেয়েছিলাম স্বর্ণপদক আর গুরুর আশীর্বাদ, জওহরলালজী সপ্তাহে কখানি করে' চিঠি লেখেন আমাকে, রাজনৈতিক সংগ্রামে আমাদের পরিবারের কত দান, ধর্মজীবনে কী গভীর আমার বিশ্বাস—এই সমস্ত অপ্রাসঙ্গিক বহু কথা সু প্রচার করতে সুরু করল আমার জীবনটাকে কেন্দ্র করে'।

একখানি পত্রিকা লিখল: আমি নাকি আসলে একজন দার্শনিক—খেয়ালে পড়ে এসেছি শিল্পের জগতে, সিনেমার জগতে। এম্-এ যদি পড়তাম, পাস তো করতাম-ই, হয়তো দর্শনশাস্ত্রে অধ্যাপক হয়ে জ্ঞানজগতে বহু কল্যাণ করতে পারতাম, এবং—সেটাই নাকি আমার পক্ষে সঙ্গত ও শোভন ছিল।—অর্থাৎ?

সিনেমায় যে কয়খানি ছবিতে অভিনয় করেছি তা একেবারে পণ্ডশ্রম হয়েছে—এই নাকি তাৎপর্য? সু আমাকে প্রচার করতে গিয়ে এ কী অদ্ভুত অপপ্রচার করল সুরু? বিরক্ত হলাম অত্যন্ত।

—এ-সব কী লেখাচ্ছ?

বললাম কিন্তু কথার সঙ্গে একটু কৌতুকের সুর মিশিয়ে।

সু আকাশ থেকে পড়ল যেন। পত্রিকাখানি টেনে নিল হাতে। পড়ল যেন মন দিয়েই। তারপর:

—তাই তো। এ অদ্ভুত ভক্তিরসের প্রবন্ধ লিখল কে?

—জানো না?

—জানি না তো! তবে সন্দেহ হচ্ছে, শো।

—শো লিখেছেন? হতেই পারে না। আমার সম্বন্ধে তিনি এত কথা জানবেন কি করে?

– তা বটে,

বলে' সু কৃত্রিম গাম্ভীর্যে হঠাৎ গাল দুটো ফোলাল। বুঝলাম, শো-র কাছে সে আমার সম্বন্ধে যা নয় তাই অনেক কিছুই প্রচার করেছে। কিন্তু কেন? অত্যন্ত ভালবাসে বলে? সু-র ভালবাসা আমি অনুভব করি, কিন্তু তবু কোথায় যেন দ্বিধা থাকে জেগে! এমন অত্যদ্ভুত ব্যাজস্তুতি প্রচার করানোর কারণ কি? শো-ই বা এমনটা হঠাৎ লিখতে যাবেন কেন? তিনি আমার অভিনয় পছন্দ করেন—এটা না-হয় কথার কথা, কিন্তু কৌশলে পরোক্ষভাবে আমার চিত্রাভিনয় সম্পর্কে এমন ক্ষতিকর পরিহাস তিনি করবেন—এমনটা তো মনে হয় না। সু-র যত মিথ্যা কথা, যত অন্যায় অসঙ্গত অনুমান। উদাসীন ভাবেই তাই:

—তুমি না বলো সু, যে, শ্রীমতী শো আমার ছবির একজন 'আরডেন্ট অ্যাড্‌মায়রার'!

—অ্যাড্‌মায়রার বলেই তো এত ভক্তি হে।

—কিন্তু এইভাবে লেখাটায় আমার শিল্প-জীবনের ক্ষতি হতে পারে তিনি নিশ্চয়ই জানেন।...নাঃ, বিশ্বাস হয় না এ-লেখা তাঁর লেখা।

—তা-ও যে হতে পারে না, তাই বা বলি কি করে?

—তাই বলো।...কিন্তু সু, এত লোক থাকতে হঠাৎ শো-র কথাই তোমার কেন মনে হল।

—তোমার দুটি একটি প্রবন্ধ পড়ে, বিশেষ করে তোমার অভিনয় দেখে তোমার সম্বন্ধে তার এমনতর একটা ধারণা হয়েছে বলেই তো শুনেছি।

ধারণাটা হয়তো খুবই উচ্চ। একজন সিনেমার এ্যাক্টর হওয়ার চেয়ে দর্শনের অধ্যাপক হাওয়ার গৌরব ঢের বেশি, স্বীকার করি। অধ্যাপক দরিদ্র, বাইরের জগতে তাঁর তেমন খ্যাতি-ও থাকে না হয়তো, তবু তিনি স্বদেশের ভক্তিভাজন, তরুণলোকসমাজে পরম পূজনীয়।... অধ্যাপক হওয়ার প্রতিভা আমার নেই—কিন্তু কেউ যদি বলে আছে, তবে আত্মগৌরবের আনন্দই তো করব অনুভব! কেন বিষাদঘন একপ্রকার দুঃসহ ক্ষুণ্ণতায় আচ্ছন্ন হবে চিত্ত? কেন মনে হবে, শো যে আমার ছবির এ্যাড্‌মায়রার, এটা সু-র মিথ্যা প্রচার মাত্র।...ঠিক, ঠিক, জলের মত তথ্যটা সরল হয়ে এল ঃ কেন শো সেদিন আমার অভিনন্দন সভায় আসেননি।

—কি ভাবছ, ব?

জিজ্ঞাসা করল সু।

—ভাবছি, তুমি আমার নামে এতসব প্রচার করছ বা করাচ্ছ কেন সু? কী হবে এসব প্রচার করে?

—ওই তো, দার্শনিকই তো বটে ঃ সব মায়া, সব মিথ্যা। তোমার বাপু সিনেমাজগত থেকে সরে যাওয়াই উচিত।

—যাবো?

—যাবো, খিঁচিয়ে উঠ্‌ল সু ঃ

—এই উপদেশ দিতেই যেন এসেছি। ভণ্ডামী রাখো। শোনো, জুপিটার ফিল্মস্-এর কর্তারা শ্রীযুক্ত সেনগুপ্তের একটা গল্প তোলার কথা পাকাপাকি করেছে। প্রস্তাব হয়েছে—তোমাকে 'হিরো'র পার্ট দেয়া হবে।...গরম চা আর সিঙাড়ার অর্ডার দাও—সুখবর দিলুম।

—তা দিচ্ছি! কিন্তু শিল্পী হতে ছবিতে নামবো, না ছাত্র হয়ে য়ুনিভার্সিটি যাবো।

—এই সেরেছে!...শো-র একটি বুলেটেই কাত্?

—শো-ই হ'ক আর সু-ই হ'ক কিংবা যে-ই হ'ক না কেন—কথাটা ঠিক বলেছে কি না, ধৈর্য ধরে একবার পরখ করে' দেখতে ক্ষতি কি?

—অর্থাৎ ময়লা চাদর কাঁধে আর ছেঁড়া জুতো পায়ে একবার অধ্যাপক তোমাকে হতেই হবে?

—অধ্যাপকদের দারিদ্র্যে পরিহাস ক'রো না সু। তাঁদের একজন হতে পারা আমাদের কর্ম নয়।...এক পয়সা তেমন উপার্জন না করেই আমরা বড়মানুষী করছি—কিন্তু যে ময়লা চাদর বা ছেঁড়া জুতো দেখে আমরা তাঁদের পরিহার করতে সাহস করি—জানবে, তা তাঁদের উপার্জিত অর্থ দিয়েই কেনা!—ক্রোধভরে খোঁচা দিলাম সু-কে। সু কিন্তু তামাসা হিসাবেই গ্রহণ করল খোঁচাটা। বলল কৌতুকরঙ্গে:

—ও বাবা, একেবারে সাম্যবাদী সারমন!

—× × ×

—যাই তবে।...তাহ'লে দরিদ্র মানে পূজ্যপাদ অধ্যাপক হওয়াটাই মনস্থ করলে?

—× × ×

—অল রাইট। সিনেমাজগতের অপূরণীয় ক্ষতির কথা বিবৃত করে' একটা প্রবন্ধ লিখি গে।

—× × ×

—চা আর এল না। তবে উঠি।

—ব'সো।...তুমি বলছ শো-ই এ প্রবন্ধ লিখেছে?

—তা নইলে কথাটা মান্যযোগ্য হবে না তো? ওটা আমি লিখেছি।

—মিথ্যা কথা। তোমার মাথায় এমন 'হাই থিঙ্কিং' জাগবে, আমি বিশ্বাস করি না।

—ধন্য শো। তাকে না জেনে, না দেখেই এত শ্রদ্ধা, এত অনুরাগ। আর আমি হতভাগা, বানের জলে ভেসে এসেছি, তা এসেছি তো অনেক কাল, তবু অদৃষ্টে শুধু অনাদর, উপেক্ষা, নিন্দা, পরিহাস।

সু দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল। হেসে ফেললাম তার অভিনয়েঃ

—তুমি ছবিতে নামো না কেন সু?

—এই চেহারায়?

—কেন তোমার চেহারাটা এমন কি মন্দ।

—বন্ধু আলিঙ্গন দাও। তুমি যদি নারী হতে, সার্থক হতাম ইহজীবনে।...থাক বাজে কথা। জুপিটার ফিল্ম্স বোধ হয় কাল আসবে তোমার সঙ্গে কথা কইতে। শো-ও রাজী হয়েছে।

একটু থেমেঃ

—এবার দেখব কে কাকে হারায়ঃ শো ব্র-কে, না ব্র শো-কে!

আতঙ্কে উল্লাসে, যৌবনঘন প্রত্যাশার উচ্ছ্বাসে হৃদয়টার যন্ত্র বুঝি বন্ধ হয়ে এল। কিন্তু কি আশ্চর্য আমার মন। সু-কে বললামঃ

— স্থির করেছি, এম্-এ-টা পড়বো।

—মানে?

—এখন ছবিটবি আর করবো না।

—কিন্তু বয়স তোমার জন্যে বসে থাকবে না বৎস।

—আমি-ও তো একদিন এখানে থাকবো না বন্ধু।

—হরিবল্! কী কুক্ষণে শো-কে ওই প্রবন্ধটা লেখার জন্যে উৎসাহিত করেছি।

গুম হয়ে বসে রইলাম। হঠাৎ কোনো কথা এল না মুখে। সু এমন অদ্ভুত প্রবন্ধ কেন লেখাল আর শো-ই বা এমন প্রবন্ধ লিখলেন কেন? শো-র কি ইচ্ছা এই—সিনেমা জগৎ থেকে আমি সত্যসত্যই সরে যাই? এতে তাঁর কী লাভ? সু চায়? তবে আমার শিল্পনৈপুণ্যে তার এত উচ্ছ্বাস কেন? নূতন ছবি করার প্রস্তাব নিয়ে আসে-ই বা কেন?

—কি ভাবছ হে দার্শনিক!

—কিছু না।

—আর কিছু না......আচ্ছা, চা এসে গেছে, এক চুমুক দিয়ে গরম হয়ে নাও।

চা-য়ে দু'চার চুমুক দিতে দিতে

—কাল সকালে কিন্তু বাড়ীতে থেকো। জুপিটারকে নিয়ে আসবো।

—× × ×

—কথা বলছ না যে!

—বছর দুই ছবিতে নামবো না, সু।

—শো শুনে মূর্ছা যাবে জানো?

হঠাৎ উষ্ণ হয়ে উঠল মন। সু-র কথাবার্তা, কাণ্ডকারখানা—সমস্তই আমার কাছে কেমন-কেমন ঠেকল যেন। তিক্ত স্বরেই তাই:

—শো-র সঙ্গে আমার সম্বন্ধ কি সু? কেন তাঁর কথা বারবার বলে' আমাকে বিড়ম্বিত করছ!......

সু নীরবে চায়ে চুমুক দিতে লাগল। হঠাৎ গম্ভীর স্বরে:

—তোমার সঙ্গে অভিনয় করবার সুযোগ হচ্ছে শুনে শো-র যে কী আনন্দ যদি জানতে।

বুকের মধ্যে বিদ্যুৎ খেলে গেল চকিতে।......কিন্তু না, সু-র সমস্ত মিথ্যা কথা। এমনি মিথ্যা রচনা করে' তার উল্লাস। আমাকে সে ভালবাসে, জানি। কিন্তু আমাকে এমনভাবে খেলিয়েও তার স্বভাবের তৃপ্তি। সে-তৃপ্তি আজ তাকে পেতে দেব না।

মুখটাকে কঠিন করে আমি বসলাম। তারপর:

—বাঙ্‌লাদেশে আর্টিষ্টের তো অভাব নেই সু, খুঁজে দেখ না, ঢের পাবে।

—তা পাবো। আর্টিষ্ট এখানে আছেন অনেক, কিন্তু ব্ তো আছে একজন-ই।

—যখন ছিল না?

—তখন ছিল না। অতএব দুঃখ-ও ছিল না। এখন আছে, অতএব থাকা চাই, না থাকলে দুঃখ, ক্ষোভ, বিবাদ, মূর্ছা।

—× × ×

—চুপ করে রইলে যে !

—আমাকে একটু ভাবতে দাও, সু।

—তবেই হয়েছে। যাও, যাও, ষ্টুডিও-র স্বর্গ থেকে বিদ্যালয়ের নরকেই যাও।

—গেলে তো তোমরা খুসি-ই হবে !

—ক্যাট্ ইজ্ আউট অব্ দি ব্যাগ্। যাকে এখন-ও একবার দেখলে না তার ওপরেই, সখা, এত গভীর অভিমান !

চমকে উঠলাম যেন বিদ্যুতের চাবুকস্পর্শে। সু কি মনের গহন কথাটা-ও পারে জানতে ? কে বলে তাকে স্থূলমনা ? কি অদ্ভুত তার অন্তর্দৃষ্টি !

—রাখো সখে অভিমান !

সু গান গাইতে গেল কৌতুক করে। কঠিন স্বরে তাই :

—পরিহাস রাখো সু। অভিনয় করা আমি ছেড়েই দেব।

—তামাসা করছ ?

—তামাসা নয়, সত্য !

পরদিন সু জুপিটার ফিল্ম্স্‌এর কর্তৃপক্ষকে তবু নিয়ে এল—আমাকে রাজী করাতে। শো-র সঙ্গে অভিনয় করব, এ তো আমার স্বপ্নসাধ, তবু বিচিত্র কথা এই, আমি রাজী হলাম না কিছুতে। সরাসরি প্রত্যাখ্যান করলাম তাঁদের প্রস্তাব। এবং দিনকয়েক পরে সু যখন এসে সংবাদ দিল শো-র অপজিটে হিরো হচ্ছেন শ্রীযুক্ত অ, তখন অ-এর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হলাম অকারণে। সু শঙ্কাকুল গাম্ভীর্যে আমার মুখের দিকে চেয়ে রইল, নিস্তব্ধ। সু-এর স্বভাবটাই এই : কোনো বিষয় বা ব্যাপারের সবটা সে যখন বুঝতে পারে—তখন বোকার ভান করে' অনেক সময় খোকার মত বলে, 'তোমাদের কথা বুঝি না কিছু।' আর সত্যই যখন তলিয়ে বুঝতে পারে না, আতঙ্কিত সংশয়ে অন্ধকার হয়ে থাকে বসে'। তখন তাকে দেখলে বন্ধু বলে' আর চেনা যায় না।

৫

আসল কথা, সু-র সঙ্গে আমি অভিনয়ই সুরু করলাম।... কী করে ঠিক স্পষ্ট জানি না, আমার ধারণা হল শো-র সম্পর্কে আমি যত উদাসীন হব, তত-ই সু আশ্বস্ত হবে, আমার ওপর তার ভালবাসা ও বিশ্বাস ততই অক্ষুন্ন থাকবে। শো-র সঙ্গে তার সম্পর্ক খুবই গভীর, সুতরাং বন্ধু যদি হই তবে বেদনা তাকে দিতে পারিনেঃ শো থেকে বাক্যে, ব্যবহারে দূরে সরে যাওয়ার চেষ্টাই আমি করলাম! কিন্তু স্বপ্নে, যেখানে জোর চলে না?

সু-র সঙ্গে ছলনা করলাম, কিন্তু অন্তর্যামীর সঙ্গে তো ছলনা করতে পারিনে। শো-কে দেখবার এবং তার সামনে মুখোমুখী বসে কথা কইবার কামনা যে আমার মধ্যে কত প্রবল, আমি-ই তা জানি। এমন শো-র সঙ্গে অভিনয় করবার সুযোগ পেয়েও ত্যাগ করলাম, এ যেন হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলার মত। তা সু মর্মতঃ তুষ্ট হয়নি আমার আচরণে?... ছলনা রাখো। সু-কে তুষ্ট করার জন্যেই যেন তোমার মাথাব্যথা। নিতান্ত নগণ্য মানুষগুলোর মতই আছে তোমার কামকামনা, লোভমোহ, কিন্তু সংসারের পাঁচজনকে নানা কৌশলে তুমি বোঝাতে চাও—পাঁচজনের মত তুমি নও, অনেক, অনেক উঁচুতে তোমার আসন।

মাথা নিচু করে' মনের কথাগুলি নিবিষ্ট হয়ে শুনলাম। মনে হল মন বড় চেঁচিয়েই যেন গোপন কথাগুলি বলে দিলে। চারপাশের সবাই বুঝি শুনতে পেল—আমাকে চিনতে পারল।

যৌবনকামনার এই স্বাভাবিক ধর্ম যদি পাশবিক, তবে এই ধর্মদমনের যে ছলনাময় দম্ভ আছে আমার চরিত্রে, তা-ও কেন নয় পাশবিক? মনে মনে আমি সহস্রবার নতি স্বীকার করছি শো-র রূপের কাছে—আর বাইরে নানাছলে সু-কে বুঝিয়ে চলেছি, শো-র কোন প্রভাব নেই আমার যৌবনে! মনের গোপনে পৃথিবীর কোনো সামান্যজনের-ও চেয়ে নই

উন্নত, জ্বলে মরছি এই পাপের তাপে, তবু বাক্যে কি ব্যবহারে সচ্চরিত্র সারল্য-সংযমের কি অবিশ্বাস্য অহমিকা!

হ্যাঁ, আমি অভিনেতাই বটে। শক্তিমান, নিপুণ অভিনেতা। সু যে বলেছে আমি দার্শনিক, সেটা আমার অভিনয়, আমার বাইরের রূপ মাত্র। সু আমাকে চেনে না, সু-র সাধ্য নেই আমাকে চেনে।

কিন্তু অভিনেতার বাইরের রূপ দেখেই তো দর্শকে মুগ্ধ হয়, কে প্রবেশ করতে চায় তার ভিতরকার অন্ধকারে? ভিতরে আমি যাই হই না, বাইরে যদি ভালো তো সবাই বলে ভালো, বাইরের রূপে যদি আনন্দ, তবে বাইরের সবাই তাতেই আনন্দিত। দার্শনিকতার অভিনয়ে সু যদি মুগ্ধই হয়ে থাকে—তবে বুঝতে হবে আমার অভিনয় হয়েছে নিখুঁত। সু যদি জেনে থাকে শো সম্বন্ধে আমি অনাসক্ত, তবে সেই অনাসক্তির আশ্চর্য অভিনয়ে সাফল্য পেয়েছি অবশ্যই। আর এই সাফল্যেই আমার আনন্দ, বোধ করি আমার মুক্তি-ও। কে বললে, সু-র জন্যে শো-র সান্নিধ্য আমি ত্যাগ করতে চাই? আমার অভিনয়-সত্তার অহমিকাকে তুষ্ট করার আনন্দে আমি অন্ধ। এ অন্ধতা সূর্যকে উপেক্ষা করতে পারে, পৃথিবীকে মিথ্যা বলতে পারে, শো তো তুচ্ছ।

অভিনেতার চরিত্রই বুঝি এই: অন্ততঃ আমার মত সচেতন অভিনেতার! অতএব—

সত্যকার দার্শনিক হওয়ায় আমার কৃতিত্ব নেই, দার্শনিকতার অভিনয়েই আমার কৃতিত্ব। অভিনয় করতেই আমার আসা, অভিনয় করব নিখুঁত নৈপুণ্যে। সংসারের চোখে যাঁরা বড়, তাঁরা এক একজন নিপুণ অভিনেতা ছাড়া কিছু না। আমাকে বড় হতে হবে আপন ক্ষেত্রে। তখন—

কি আশ্চর্য, শো-র কথা মনে আসে কেন? আহা বালক যেন, বোঝে না কিছু। শো-কে ছাড়িয়ে যেতে চাও কৃতিত্বের সৌভাগ্যে। ছাড়িয়ে গিয়ে তাকে পেতে চাও বিজয়ীর অহংকারে। শো-কে তোমার চাই—

ঠিক। একেবারে ঠিক। বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুবর্গকে দূর থেকে নমস্কার করলাম। গোপনে মুহূর্তের জন্য কান্নার মেঘ যেন এল ঘনিয়েঃ অধম শিষ্য আমি, আপনাদের চরণ স্পর্শ করবার যোগ্য নই আমি, বললাম অকারণে। তারপর দাদুর নাম নিয়ে অথচ দাদুকে কিছু না জানিয়েই বিখ্যাত সব চিত্র কোম্পানীর সঙ্গে দেখা করতে করলাম সুরু।

জুপিটারের আবেদন অগ্রাহ্য করলাম—কিন্তু জুপিটারের প্রতিদ্বন্দ্বী চার-চারটি কোম্পানীর সঙ্গে অল্প কয়েকদিনের মধ্যে কনট্র্যাক্ট হয়ে গেল। একসঙ্গে চার জায়গাতেই ছোটাছুটি করতে হল অহরহ। সু অচিরেই তা জানল। মনে করেছিলাম, অভিমান করবে। গালাগাল করবে। কিন্তু না, অভিমানের একটি কথাও সে বলল না। বরং এক একদিন সে আমার সঙ্গে সুটিং দেখতে বার হল স্বেচ্ছায়।

এম-এ-টা পড়ব বলে দাদুকে ইতিপূর্বে বলেছিলাম, বেশ কতকগুলি দরকারী বই-ও কিনেছিলাম উৎসাহভরে। কিন্তু 'ছবি ছবি' করে আবার মত্ত হয়েছি দেখে দাদু হঠাৎ এলেন আমার ঘরে। কৌতুক করলেনঃ

—কি পড়ছ দাদু? ও হরি, আমি বলি 'বেদান্তদর্শন' কি 'নব্যন্যায়ে' আছ নিবিষ্ট। এ যে দেখছি চিত্রদর্শন। তা ও চিত্রখানি কার? বালিকাটির নাম কি?

একজন মহিলাশিল্পীর একখানি রঙিন ছবি দেখছিলাম সিনেমাপত্রিকার পাতায়। দুঃসাহসিক স্ত্রীলোকের ভূমিকায় অভিনয় করে' সম্প্রতি তিনি বেশ নাম করেছেন। বাঙলাদেশে ঝগড়াটে মেয়ে অনেক মেলে, কিন্তু বোম্বের মত লড়নেওয়ালী মেয়ে তেমন মেলে না। শ্রীমতী নি নাকি বাঙলা দেশের লড়নেওয়ালী মেয়ে, দেশের ছেলেরা আদর করে' নাম দিয়েছে 'ডাকাত মেয়ে'। ঘোড়ায় চড়তে, ড্রাইভ করতে, লাঠি ধরতে কি রাইফেল ধরতে—এমন কি সামনাসামনি ঘুষোঘুষি করে' জোয়ান পুরুষগুলোকে চক্ষের নিমেষে ধুলোয় শুইয়ে দিতে নাকি ওস্তাদ। সত্যকথা

বলতে কি, মেয়েদের এই জাতীয় ওস্তাদী দেখতে আমার মোটেই ভালো লাগে না—মনে হয় অত্যন্ত লজ্জাকর ও কৃত্রিম এবং সেইহেতু অত্যন্ত হাস্যকর এই ব্যাপারগুলো। বাঙ্‌লাদেশের সব চেয়ে নামকরা হাস্যরসাভিনেত্রী শ্রীমতী নি, বন্ধুমহলে এমন অদ্ভুত অভিমত-ও প্রকাশ করে' নি-র ভক্ত সম্প্রদায়কে আমি বিরক্ত করেছি একাধিকবার, যদি-ও চুপি চুপি বলি, তাঁর কোনো অভিনয়ই এখনো দেখি নি। আজ কিন্তু দেখবার জন্যে বাসনা জাগল। পত্রিকার পাতায় তাঁর এই স্বাভাবিক ছবিখানি দেখে অকারণেই যেন আত্মমগ্ন হলাম কিছুক্ষণের জন্যে। এমন সময় এলেন দাদু। পত্রিকাখানি মুড়ে রাখতে গেলাম, বললেন তিনি কৌতুক করে':

—তা' আমি-ও একবার দেখি, দেখি।...বাঃ, খাসা মেয়েটি। কোথায় যেন দেখেছি একে।

—× × ×

—তা ছ-সাত বছর আগেকার কথা দাদাভাই, বুড়োর কি তা মনে রাখার কথা?...বেশ।

বলে' পত্রিকাখানি টেবিলে রেখে দিলেন পরম সন্তর্পণে। তারপর একটু মৃদু হেসে:

—বলি, এম্-এ পড়ার কতদূর দাদাভাই!

—×

—হয়ে গেল তাহ'লে?

—আমি ভাবছি দাদু, প্রাইভেট ছাত্র হিসাবে এম্-এ দেব!

—আর দাদু তুমি দিয়েছ!

—তুমি দেখে নিয়ো, আমি নিশ্চয়ই দেব!

দাদু হাসলেন। দেখে আমি-ও হাসলাম।

—কতগুলি নূতন বন্ধু জুটল?—কৌতুক করলেন দাদু:

—মানে, লেডী-বন্ধু!

—দাদু, তুমি আমাকে বিশ্বাস করো না!

—এমন দাদাকে বিশ্বাস করবো না তো কাকে করবো দাদাভাই ?... তোর বাবা কিন্তু একটা বেরসিক ব্যক্তি, কাব্য, নাটক, রোমান্স—কিছু বোঝে না, যখন-তখন যা' তা' লেখে, তাও রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে...কী লেখে জানিস ?

—থাক দাদু।

—আচ্ছা থাক। পুরাতন কথায় কাজ নেই। কিন্তু পুরাতন কালের সেই প্রেয়সীটির কি সত্যসত্যই সন্ধান মিললো এতদিনে ?

আশ্চর্য স্মরণশক্তি আমার দাদুর। যে-মহিলাশিল্পীটির ছবি নিবিষ্ট চিত্তে দেখছিলাম, দাদু এক নিমেষে দেখেই তাহ'লে চিনতে পেরেছেন সে কে ?

ছ' সাত বছর আগের কথা।

গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের একখানি নাটিকা অভিনয়ের জন্যে শান্তিনিকেতনের একটি দল এল ক'লকাতায়। শান্তিনিকেতনের আমি তখন বিখ্যাত ছাত্র, লেখাপড়ায় অবশ্য নয়, কিন্তু নাচে, গানে, অভিনয়ে, চিত্র-অংকনে। অভিনয়ে প্রধান অংশ নেয়ার জন্যে আমাকে পাঠানো হ'ল শান্তি-নিকেতন থেকে। সেবার অভিনয়ে আমি অতুল কৃতিত্ব অর্জন করলাম, আর অর্জন করলাম একজন কিশোরীর বন্ধুত্ব। মেয়েটি থাকত ক'লকাতায়, লেকের একটা পাড়ায়। এসেছিল নাটক দেখতে।

অভিনয়ের শেষে সে যেচে এল আলাপ করতে।

নাম তার কুমারী ল। প্রজাপতির মত চঞ্চল। ফুলের মত সুন্দর। বলল :

—আপনার অভিনয় আমার ভারি ভাল লেগেছে।

তারপর বেণী দুলিয়ে :

—কী সুন্দর! ভারি সুন্দর! সত্যি, তুমি ভারি সুন্দর!

আমার-ও মনে হয়েছিল ভারি সুন্দর সে। কিন্তু সেদিন আমি অসংখ্য পদকপ্রাপ্ত জনপ্রিয় আর্টিষ্ট, সাফল্যের অহংকারে সেদিন তাকে তেমন

আমল দিলাম না। মনের মধ্যে কিন্তু ভাবের একটি আশ্চর্য আবেগ বহন করেই ফিরে গেলাম শান্তিনিকেতনে। কিন্তু তিনচারদিন পরে যখন একখানি পত্র তার কাছ থেকে পেলাম, নিজেকে আর গোপন করতে পারলাম না, ছাই-ভস্ম কত কী যে লিখলাম স্বপ্নাবিষ্ট সম্মোহে।

চলল কথা চালাচালি। সে সব কী কথাই মাত্র? কত সোনালি আশা, রামধনুর মত কত রঙিন স্বপ্ন, ভবিষ্যৎজীবনের কত কল্পনা, পরিকল্পনা—সবার ওপরে কত ভাব, কত ভালবাসা, কত আশ্চর্য ইঙ্গিত, কত অমর কবিতা!

সেই কাঁচা বয়সে সমবয়সী সেই মেয়েটির সঙ্গে দূর থেকে সুরের সখ্য উঠল জমে। ক্রমশঃ দূরকে নিকট করতে জাগল বাসনা। দাদুর কাছে আসছি বলে' ক'লকাতায় ল-এর সঙ্গে দেখা করতে এলাম হামেশাই। দাদুকে তার কথা বললাম-ও। দাদু শুনে কিছুই মনে করলেন না, শুধু বললেন, লেখাপড়ায় অবহেলা করিস্ না। ল-কে একদিন দাদুর কাছে নিয়েও এলাম। দাদু দেখে বললেন: চমৎকার মেয়ে।

কেটে গেল প্রায় বছর দেড়েক। প্রবেশিকা পরীক্ষার তখন মাস আষ্টেক বাকি। ল-এর বাড়ীতে বৈঠকখানায় বসে' জীবন সম্বন্ধে তার সঙ্গে নানা গভীর আলোচনা হচ্ছিল। আমরা দুজনে জীবনের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বড়ই চিন্তান্বিত হচ্ছিলাম দিন দিন। ল বলছিল, পৃথিবীটা ব্, ঠিক যেন মনের মত নয়। এইজন্যে মনের মত স্বপ্ন রচনা করতে হয় ছবিতে। ছবিতে নামবে ব্? ছবির জগৎটাই সুন্দর, এ-জগতে, দুর, ভালবাসা কোথা?

বসে বসে শুনছিলাম।

—কথা বলছ না যে?...নামবে ছবিতে? আমি একেবারে 'ডিসাইড' করে' ফেলেছি, নামবো। প্রবেশিকা আর দেব না। কী হবে দিয়ে?

—ইস্কুল ছাড়াটা কি ভালো?

—উঃ, কী আমার ভালোছেলে? ইস্কুল-ইস্কুল করে' কি 'চান্স' হারাবো?

বলে' একজন বিখ্যাত চিত্র-পরিচালকের একখানি পত্র সে আমাকে দেখাল। সে মনোনীতা হয়েছে।

—বাড়ীতে কেউ কিছু বলবে না?

—ভয় করিনা কারুকে। বেশি হৈ-চৈ করে, চলে যাবো বাড়ী থেকে।

—× × ×

—যাবে তুমি সঙ্গে?

—না ল।

—কেন, বাড়ীর ভয়?

—তা একটু আছে বৈ কি!

—কচি খোকা!...দেখতে তো ইয়ং এ্যাপোলো! চোখে কত বুদ্ধি, গালে কত ভালবাসা। কিন্তু মনটা একেবারে মায়ের কোলে শুয়ে দুধ খায়।...দূর, এত ভীতু! আর্টিষ্ট এত ভীতু হয়?

বলতে বলতে ল আমার কাছ ঘেষে এসে দাঁড়াল। অপ্রত্যাশিত ভাবে হঠাৎ গলাটা ধরল জড়িয়ে। বলল সুর করেঃ

—গুড্ বয়! আমি যদি তোমার 'হিরোইন' হতাম!

—এই ছাড়ো!

—এই বুঝি তোমার ভালবাসা?

বলে' ল বড় বড় চোখ দুটি তুলে' আমার মুখের দিকে তাকাল। কী যে হল তারপর! নেশাচ্ছন্ন সম্মোহিতের মত বিপুলবেগে জড়িয়ে ধরলাম ল-এর তন্বী তনু, সুর করে' বলতে গেলাম—আমি তোমার হিরো, তুমি হিরোইন, বলতে গেলাম, কিন্তু হঠাৎ চোখ তুলে যা দেখলাম তাতে মুখ দিয়ে আর কোনো কথা ফুটল না। দেখলাম—বন্ধ ঘরের জানালায় পাথরের মত দাঁড়িয়ে আছেন ল-এর মা।

দুর্গতির সীমা রইল না তারপর। অকথ্য লাঞ্ছনা ও অপমানের দুর্বহ ভার বহন করে' ফিরতে হল ল-এর বাড়ী থেকে। শাস্তিটা এইখানেই শেষ হল না—বাবার কাছে চিঠি গেল, চিঠি গেল

শান্তিনিকেতনের কর্তৃপক্ষের কাছে। একদিন উত্তরায়ণ থেকে স্বয়ং গুরুদেব আমাকে ডেকে পাঠালেন। মৃদুভাবে তিরস্কার করে' বললেন, শিল্পীকে তুচ্ছ থেকে সর্বদা দূরে থাকতে হয়, বৃ। বড় হবে, এই যে আমি চাই। কেঁদে ফেললাম। তাঁর পায়ে হাত রেখে পণ করলাম—বড় হবো। তিনি স্নেহভরে আমার মাথায় হাত রাখলেন। গুরুদেবের ক্ষমা পেলাম, কিন্তু বাবা, আমার বাবা কি ক্ষমা করবেন? তাঁকে চিনি। তিনি আমাকে এই মাটিতে জীয়ন্ত গোর দিয়ে নিজে ফাঁসির মঞ্চে উঠবেন, কিন্তু দুশ্চরিত্র ছেলেকে ক্ষমা করবেন না। সুতরাং মানে মানে পালানো ভালো। একদিন রাত্রে, বাবা আসার আগেই, শান্তিনিকেতন ত্যাগ করলাম।

এলাম ক'লকাতায়, দাদুর কাছে। আসার কারণ তাঁর কাছে লুকিয়ে লাভ নেই, সব বললাম। তিনি তিরস্কার করলেন না। হাসতে লাগলেন। বললেন :

—তা থাক্ দাদু লুকিয়ে। কিন্তু কথা দে, লুকিয়ে আর প্রেয়সীর মন্দির অভিমুখে কখন-ও যাবি নে।

— × × ×

—চুপ করে রইলি যে! যেতে ইচ্ছে?

—না দাদু।

—এই তো ভদ্রমানুষের শিভাল্‌রি। বুক ফাটবে, তবু পা উঠবে না, মন চাইবে তবু মুখ বলবে, না, কদাচ না—এই তো সভ্য শিভাল্‌রি। তা এখন কিছুদিন গা-ঢাকা তো দিলি, পরে কী করবি শুনি?

—ফিল্ম্-এ নাম্‌বো। আমাকে একটা ভালো ফিল্ম্ কোম্পানীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দাও।

—উত্তম প্রস্তাব। কিন্তু লেখাপড়া?

—ও-সব আর করবো না।

—এই তো চাই। আমাদের জাতে আর বেশি লেখাপড়া করে' হবেই বা কী? আমরা কী বাঙালী যে কলম পিষবার জন্যে লেখাপড়া শিখবো? যা শিখেছিস—তাতেই কাজ চলে যাবে!

জাতের কথা ওঠাতে মনে একটু লাগল। আঘাত লাগল আত্ম-মর্যাদাবোধে। বললাম :

—আমি দাদু বাড়ীতে পড়বো।

—তোর বাপকে সেই কথাই বলি।

—বাবাকে জানিয়ো না দাদু তোমার কাছে আছি। তা'হলে এই ক'লকাতায় এখনি ছুটে আসবে, হয়তো আমাকে—

—ধরে নিয়ে যাবে? আমার কাছ থেকে? যাক তো নিয়ে পাজি বেটা।

বাবা কিন্তু এলেন কয়েকদিনের মধ্যেই। পুনরায় তিরস্কারের একশেষ হ'ল। কিন্তু দাদুর মধ্যস্থতায়, বলা ভালো দাদুর কৃপায়, কলকাতাতেই আমাকে থাকতে দেয়া হল। কথা রইল : বাড়ীতে প্রাইভেট টিউটরের কাছে আমি পড়ব, এবং বাড়ীর বার হব না মুহূর্তের জন্যে। দাদু বললেন—হবে, হবে তাই হবে। তারপর বাবা চলে যেতে :

—দেখিস দাদু, বাড়ীর বার হ'সনি যেন, বলে' হাসলেন দাড়িতে হাত বুলিয়ে। তাঁর নিষেধ ও হাসির অর্থ আমি বুঝলাম। দৃষ্টিতে তাঁর অভয়দানের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত। সাহস বাড়ল। বুড়ো ছেলে আমি, তবু শিশুর মত তাঁকে জড়িয়ে ধরে' আবদারের সুরে বললাম :

—বাবার ভয়ে তিনদিন ঘরে বন্দী আছি দাদু, আজ একটু ঘুরে আসি, সন্ধ্যের আগেই—

—আচ্ছা, আজ প্রার্থনা মঞ্জুর।

আমি তিন লাফে বাড়ীর বার হয়ে গেলাম চকিতে। সন্ধ্যার পর যখন বাড়ী ফিরলাম—দাদু দেখি বৈঠকখানায় বসে' গম্ভীরপ্রকৃতির একজন প্রবীন ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ করছেন। মাথা নিচু করে' পাশ কাটিয়ে পালাতে যাচ্ছি, দাদু আমার হাত ধরে' ফেললেন, ভদ্রলোকটির দিকে চেয়ে বললেন :

—ওই আপনার ছাত্র স্যার, আপনার হাতে তুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হলাম।

—বেশ ছেলে, সুন্দর ছেলে!

—দেখতেই ওই রকম। কাজে স্যার কিছু না।

—না, এ আমার খুব কাজের ছেলে হবে, বলে' মাষ্টারমশায় পরম সাদরে কোলের কাছে আমাকে টেনে নিলেন। অহেতুক স্নেহাবেগে দাদুর চোখদুটি ছলছল করে' উঠল।

স্নেহে মানুষ নষ্ট হয়ে যায়—এ-কথা আর যে কেউ বিশ্বাস করে করুক, আমি করি না। আজ এই জীবনোপন্যাস লেখার কালে বার বার দাদুকে আমার মনে পড়ছে, বুঝতে পারছি—আজ আমি যা, তা তাঁর-ই সৃষ্টি। সেদিন দাদুর স্নেহে বাইরের জগতে যতই চপল চঞ্চল হয়ে উঠি না কেন, অন্তরের জগতে কৃতজ্ঞতার অবারিত ভাবাবেগে নূতন এক জীবনে যেন মঞ্জুরিত হয়ে উঠলাম ক্রমশঃ। দাদু আমার কোন কাজেই বাধা দিতেন না বলে' তাঁর কোন কথা বা উপদেশ অগ্রাহ্য করার সাধ্য আমার ছিল না। দাদু বলতেন যা করিস্ বু, করিস্ কিন্তু পড়াশুনোটা ঠিক মত করিস্ যেন।··· একটু পরে গম্ভীর হয়ে:

—যে মাষ্টারমশায়ের কাছে পড়ছ, বিশেষ মানী ব্যক্তি তিনি, তাঁর মর্যাদা যেন রেখো ভালোভাবে পাস করে'।

পড়াশুনো সত্যসত্যই মন দিয়ে সুরু করলাম এবং সাহসে ভর করে' প্রবেশিকা পরীক্ষাটা দিয়েই দিলাম, এবং, দাদুর কী অহংকার, আমি এক চান্সেই পাস করলাম, তা-ও আবার ফার্ষ্ট ডিভিসনে!

যে বয়সে বাঙালীদের ছেলেরা এম, এ পাস করে' চাকুরীতে ঢোকে, প্রায় সেই বয়সে, অর্থাৎ আঠার উনিশ বৎসর বয়সে প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাস করাটা এমন কিছু কৃতিত্বের পরিচয় নয়। বাঙালী ভাইদের কাছে এটা একটা উপেক্ষার বিষয়ই বটে, কিন্তু দাদু এমনভাবে উল্লাস প্রকাশ করতে লাগলেন, যেন ওর চেয়ে বড় সংবাদ জীবনে তিনি কখনও প্রত্যাশা করেন নি। নাকি খবর এসেছে, ইলেক্সন জয়ের? কিংবা

ডক্‌টারেটের থিসিস্‌ হয়েছে এ্যাক্‌সেপ্‌টেড্‌? বাড়ীতে নাচ গানের জলসা বসল, লাখোপতিরা এলেন নিমন্ত্রণে, উপঢৌকনে ভরে গেল গৃহ, আমার টিউটারকে সম্মানিত করা হল নানাভাবে, তাঁকে উপহার দেয়া হ'ল শান্তিপুরী ধুতি, আদ্দির পাঞ্জাবী, সোনার চশমা, সোনার কলম, টাকার তোড়া আর ফুলের মালা। জোড় হাতে দাদু দাঁড়ালেন তাঁর সামনে, 'আপনার দয়াতেই'—বললেন বিনয়নম্র সৌজন্যে। আমাকে বললেন 'প্রণাম কর'।... তারপর গেজেট বেরুলে তিনি নিজেই বেরিয়ে গেলেন কেনার উদ্দেশ্যে। নিয়ে এলেন তিন চার, না পাঁচ কাপি। 'অতগুলি কী হবে' জিজ্ঞাসা করার আগেই বললেন, 'পাঠাতে হবে নানা জায়গায়।...তোর বাবাকেও এক কাপি পাঠাতে হবে,' বললেন গম্ভীর অহংকারে।

গেজেটে আমার নামটা একবার, দু বার, তিনবার—অন্য সব নাম দেখতে দেখতে ফের পাতা উল্টে'—আর একবার দেখলাম। তারপর—অকারণেই বুঝি, অগণ্য সেই নামের গহনে তন্ন তন্ন করে' একটি বিশেষ নাম খুঁজে বার করবার চেষ্টা করলাম।

কাকে খুঁজেছিলাম সেই অগণিত নামের অরণ্যে?

এই তো! এতদিন পরে তার সন্ধান মিলল। ফিল্‌মে তাহ'লে সত্যি নেমেছে! 'টেনাসিটি' আছে বটে! নাম বদলে নেমেছে, চিনতে পারি নি তাই। ছবি দেখেই চিনেছি। তাহ'লে এই নি হচ্ছেন সেই ল?

কিন্তু দাদুর কী চোখ। দেখেই চিনে ফেলেছেন! কতদিনের কথা, তবু—

—পুরাণো কথা সব মনে পড়ছে তো দাদাভাই!...বোধ হয় একবার যেতে হবে ইনটারভিউ দিতে, তাই না!

দাদু যেন অন্তর্যামী!...মৃদু হাস্য করে' সিনেমাপত্রিকাখানি ড্রয়ারে রেখে দিলাম। দাদু বললেন:

—তা হলে একবার যেতেই বাসনা? কেমন?

হাসতে লাগলাম।

—তা যাওয়া ভালো।

—না!

—না কেন?

— × × ×

—অপমানের ভয়?...এখন তো বালিকাটি আর নাবালিকা নেই।

—তাতে কী?

—দাদু আমার সরল বালক!

—তুমি আমাকে মেয়েমহলেই কেবল ঘুরতে দেখছ দাদু!

—ছি, ছি, এমন কথা কে বলে? তুমি তো কেবল মঠে মন্দিরে ঘুরছ দাদাভাই!...তা এ-মেয়েটি বুঝি তোমার কো-এ্যাক্‌ট্রেস?...এর সঙ্গেই কাজ চলছে!

—সার্কাসওয়ালা তো নই যে এর সঙ্গে কাজ চলবে।

—মানে?

—এর অভিনয় তো দেখ নি দাদু, দেখলে বুঝতে এ মেয়েমানুষ নয়।

দাদু তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে একবার তাকালেন। মনে হল আমার অন্তস্থল পর্যন্ত দর্শন করে নিলেন চকিতে। অকারণ স্বস্তির প্রশান্তিতে উজ্জ্বল হল তাঁর মুখ। কিন্তু না, কৃত্রিমভাবে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে কান্নার সুরেই যেন বললেন:

—তবে তো আর কোন আশাই নেই!

দাদুর রসিকতায় কান দিলাম না। চুপ করে' রইলাম কিছুক্ষণ। তারপর আত্মগতভাবে:

—এ মেয়ে মেয়ে নয়, তাই শিল্পী-ও নয়। জাত হারিয়ে কেউ কখনও শিল্পী হয় না।

দাদুর মুখে আবার জ্বলে উঠল স্বস্তি-পুলকের দিব্য আলোক। তিনি অকারণে আরো কাছে আমার এগিয়ে এলেন, স্নেহভরে কাঁধে রাখলেন হাত:

—ক-টা ছবিতে নামা হচ্ছে?

—চারটে।

—একসঙ্গে চার-চারটে বই ?...ভালো হবে ?

— × × ×

—অভিনয় যদি শিল্প হয়, তবে তা ধ্যানের বস্তু। একাগ্রতাতেই ধ্যান জমে।

আপন মনে বললেন দাদু! তারপর হঠাৎ সুর বদলে :

—পড়াটা তাহ'লে আর হ'ল না !...বেশ !

এই হ'ল দাদুর তিরস্কার। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলাম—এই ছবিগুলো তোলা শেষ হলেই, আর নয়, এম-এ'র জন্যে লাগতেই হবে। সব সইতে পারি, কিন্তু দাদুর দুঃখ বা অভিমান সইতে পারি না।

জুপিটারের ছবির কাজ শেষ হ'ল বছরখানেকের মধ্যেই। সু বলল আসবে নাকি ট্রেড শো-এ ?

—বড় ব্যস্ত। অন্য কোনদিন দেখে আসবো সু।

—আজ গেলে পারতে। শো আসবে। আলাপ হ'ত।

—আলাপের জন্যে এত ব্যস্ত কেন? একদিন হলেই হ'ল।

—আচ্ছা,

বলল সু, সরল বালকের ভঙ্গীতে। তারপর :

—তোমার ছবিগুলি কবে বের হচ্ছে ?

—দুখানি বোধ হয় আগামী মাসেই !

—শো তো তোমার ছবি দেখার জন্যে অধীরভাবে প্রতীক্ষা করছে।

—তাঁর কাছে আমি কৃতজ্ঞ। ধন্যবাদ জানিয়ো তাঁকে।

বললাম সহজ সুরে। সু খুসী হল। নিশ্চিন্ত।

দিনদুই পরে গোপনে দেখে এলাম শো-র অভিনয়। সত্য কথা বলব? শো-র সঙ্গে অভিনয় না করে' আমি ভালোই করেছি। অভিনয়-শিল্পে যে-কোনো পুরুষই শো-র কাছে মনে হয় বালক মাত্র। অমন যে দক্ষ অভিনেতা শ্রীযুক্ত অ, তিনি-ও শো-র রূপ, ব্যক্তিত্ব ও নৈপুণ্যের কাছে, মনে হল, জড়বৎ একটা পুতুল ছাড়া আর কিছু না।

অপরিমিত রসানুভূতির সম্মোহের মধ্যে অস্বস্তি কিছু থাকতে পারে? রহস্যঘন কোনো অসূয়াভাস? ললনাজনললামভূতা বরবর্ণিনী শ্রীমতী শো-র ওপর অসূয়া? ধিক আমার পৌরুষে, আমার শিল্পসাধনায় !

গৃহে ফিরলাম আনন্দ ও দ্বন্দ্ব নিয়ে। যদি শো-র নায়ক রূপে আমাকেই অভিনয় করতে হ'ত—কী জানি কী হ'ত। তাঁর প্রেমাবৃত

সুন্দর চোখ আর পদ্মবিকশিত আশ্চর্য মুখশ্রীর দিকে চেয়ে বিচার ঠিক রেখে—ভাবসমূহের সামঞ্জস্য ও পারম্পর্য রক্ষা করে' অভিনয় করা কি এতই সহজ? না, না, শো-র সঙ্গে অভিনয় আমি করতে পারব না। মনে হল, আমি যা তাই তাঁর কাছে প্রকাশ করতে পারি, অপর কোনো বহিশ্চরিত্রের অভিনয় তাঁর সম্মুখে নয় সম্ভব।

শো-র সঙ্গে অভিনয় করার সুযোগ নিজে থেকে নষ্ট করেছি বলে গহন মনে যে গোপন বেদনা ছিল, চকিতে তা যেন তিরোহিত হল।

তবু জানি শিল্পীর জীবনে বেদনা ও আতঙ্কের নেই শেষ সীমা? শো-অভিনীত এই আশ্চর্য চিত্রের তুলনায় আমার চিত্রগুলির মূল্য কতটুকুই বা হবে? তড়িৎবেগে এ-চিন্তাটা একেবার মনের মধ্যে উদিত হতে না হতে-ই কেমন একটা অস্বস্তির অননুভূত চেতনা সর্বশরীর ও মনকে আলোড়িত করল অকস্মাৎ।

কিন্তু না, অদৃষ্ট যার সহায়, নগণ্যের শক্তি নিয়ে সে জঞ্জালে-ও গণনীয়ের সাফল্য ও সম্মান পায় জীবনে।...ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, আমার যে দুখানি ছবি কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই আত্মপ্রকাশ করল, সাফল্য লাভ করল আশাতীত। প্রায় সকল শ্রেণীর পত্র-পত্রিকাই আবেগময়ী ভাষায় অভিনন্দন জানাল আমাকে। বিদ্যুৎগতির মত দেশময় ছড়িয়ে পড়ল আমার নাম। দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিকের পৃষ্ঠায় আমার শিল্পনৈপুণ্যের গুণগরিমা ব্যাখ্যাত ও বিশ্লেষিত হল নিয়মিত। সেই বৎসর নিখিল ভারত চিত্র-পরিচালক সমিতি শো-কেই শুধু যে সর্বশ্রেষ্ঠা অভিনেত্রী বলে' স্বর্ণপদকদানে সম্মানিত করলেন, তা নয়, আমাকেও মনে করলেন শ্রেষ্ঠ অভিনেতা, পদক চাই না বলে' কয়েক শত টাকার গ্রন্থদানে করলেন পুরস্কৃত। এবং এরও চেয়ে স্মরণীয় ঘটনা: সর্বজনমান্য নট-গুরু পুজনীয় শি অনাহূতভাবে এলেন আমার গৃহে, আশীর্বাদ করলেন আনন্দের আবেগে।

স্বপ্নাতীত এ সম্মান! তাঁর পায়ে হাত দিয়ে ঠিক বাঙালী শিষ্যের মত তাঁকে প্রণাম করলাম। আমাকে বুকে ধরলেন জড়িয়ে তিনি। মস্তক চুম্বন করে' আবৃত্তি করলেন নাটকীয় ভঙ্গীতে:

—মুগ্ধ আমি। তৃপ্ত আমি। জয় হ'ক, বৎস জয় হ'ক।...

শি এসেছেন সংবাদ পেয়ে দাদু সসম্ভ্রমে এলেন ছুটে:

—তুমি এসেছ; ভাই, কী সৌভাগ্য আমাদের!

—বৃ-র নূতন ছবি দেখলুম সখে। থাকতে পারলুম না দেখা না ক'রে!...বাধা দিয়ো না একে...উৎসাহ দাও। শিল্পের পথ-ই ওর পথ।...ভালো হচ্ছে, বেশ হচ্ছে।...এগোও।

আহ্লাদে, উচ্ছ্বাসে, ভাবাতিশয্যে আমি বুঝি মরে গেলাম। দাদু বললেন:

—তোমার আশীর্বাদ পেয়েছে দেখে সাহস হচ্ছে।

শি দাদুর দিকে চেয়ে আমাকেই জিজ্ঞাসা করলেন:

—ষ্টেজে আসবে?

—× × ×

—তাড়াতাড়ির কিছু নেই। ভেবে দেখো কথাটা। পারো তো, সপ্তাহ পরে দেখা ক'রো আমার সঙ্গে।

শি এসেছিলেন—এ সংবাদটা দু-একদিনের মধ্যেই রটে গেল সংবাদ পত্রে। ভক্তরা হানা দিতে সুরু করল গৃহে। প্রতিদিন চিঠি আসতে লাগল রাশি রাশি। প্রথমটা উৎসাহের আতিশয্যে মনে করলাম—প্রত্যেককে দেব উত্তর, কিন্তু শেষে বুঝলাম, ভক্তদের উত্তর দেয়া সিদ্ধিদাতা গণেশের পক্ষেও নয় সম্ভব।

কিন্তু দাদুর মত অন্যপ্রকার। তাঁর ধারণা চিত্র-শিল্পীর জীবনে ভক্তরাই লক্ষ্মী। তাদের অপ্রসন্ন করা শিল্পীর কর্তব্য না।

—কিন্তু প্রতিদিন একশো চিঠির উত্তর দেয়া সহজ কথা?

—অন্তত কঠিন কথা নয়। সেক্রেটারী রাখো। একজন না হয়, দুজন এ্যাপয়েন্ট করো।

একটু হেসে তারপর :

—একজন সুন্দরী মেয়ে-সেক্রেটারী বোধ হয় রাখা যায় ?

আমার চিত্র-সাফল্যে দাদু খুব খুসি হয়েছেন—এটা থেকে তা' বুঝতে বিলম্ব হল না। লেখাপড়া না শিখে যে দুঃখ তাঁকে দিয়েছি, অভিনব সাফল্যে তার চেয়ে ঢের বেশী উৎসাহ দিতে পেরেছি ভেবে গভীর শান্তি অনুভব করলাম অন্তরে।

নাঃ, পড়াশুনো আর হবে না। যেটা হবে সেটাতেই সর্বমন ও আত্মা ঢেলে দেয়া ভালো। দাদু যখন আর দুঃখ পাচ্ছেন না, তখন আর কিসের ভয় ? কাকে ভয় ? বাবাকে ? বাবা কি তাঁর পুত্রের গৌরবে আজ তুষ্ট হবেন না ? বাবার মনোভাব বুঝতে পারি না। তিনি আমার ছবি দেখেন কি না, একটাও দেখেছেন কি না, জানতে পারি নি। মা-বেটীও কি নিষ্ঠুর! বাঙলাদেশের প্রশংসাবাদ লখ্‌নৌ-এ পৌঁছুচ্ছে কি না—একটা চিঠি লিখেও তো জানাতে হয় ?...না জানাক, আমাকে অগ্রসর হতে হবে আপন ক্ষেত্রে। বাবাকে ভয় করি, কিন্তু সে-ভয় ভয় ছাড়া আর কিছু নয়, নেই তাতে নবজীবনের কোনো প্রেরণাভাস। সেটা বিমূঢ় একটা বন্ধ্যা বেদনাতেই নিঃশেষিত, চিত্তে কোনো নবতর ভাবের দেয় না জন্ম, যা আমার স্বপ্নকে করতে পারে সচেষ্ট, যৌবনকে করতে পারে ভাবনালিপ্ত। দাদুকে ভয় করি না, কিন্তু করি না বলেই এমন কিছু করি, যা মর্ম থেকে স্বপ্নে, স্বপ্ন থেকে ধর্মে সঞ্চারিত হয়ে ব্যাকুল করে আমাকে। দাদু যদি বলতেন, ছবি করতে পারবে না তুমি, তবে ভাবনা ছিল, দুর্ভাবনা ছিল। দাদু, আমার দাদু, যখন আমার শিল্পকর্মটিকে স্নেহ দিয়েছেন, সমর্থন করেছেন, তখন 'জয় মা'—আমাকে এগোতে হবে।

তা মনে তো হচ্ছে, এগোচ্ছি দিন দিন। তবু কেন যেন শান্তি পাই নে, তৃপ্তি পাই নে যৌবনে। মনে হচ্ছে, সাফল্যই জীবনের একমাত্র কাম্য না। সাফল্য মানুষ সহজে পায় না, আর পায় না বলেই সেটাকে

কাম্য বলে' করে ধারণা। পেলেই কিন্তু বুঝতে পারে ওটা কিছু না, সত্যিই কিছু না।

সু-কে বোঝাচ্ছিলাম এই তত্ত্বটা। পাইপটা টানতে টানতে সু গম্ভীর বিজ্ঞতায় মাথা নাড়ল। বলল:

—বুঝেছি।

—বুঝেছ, না ছাই। তোমার মোটা মাথায় এ-সব তত্ত্ব ঢুকবে না।

—এ-কথাও ঠিক। ...এক্সকিউজ্ মি স্যর, এ-মতটা কিন্তু আমার নয়। শো-র।

হেসে বললাম:

—শ্রীমতী শো-র তো দেখছি তোমার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা!

—হ্যাঁ, শ্রদ্ধাই তাকে বলতে পারো। তোমার মত প্রতিভার অন্তরঙ্গ বন্ধু হওয়া সত্ত্বেও সুব বা সূক্ষ্মতার কোনো ধার ধারি না, আত্মস্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে' যেমনটি ছিলাম তেমনটিই আছি এখনও—এটা কি শক্তির লক্ষণ, সেই হেতু শ্রদ্ধার বিষয়, মনে করো না?

সু-র বলার ভঙ্গীতে না হেসে পারলাম না।

—হাসছ? অর্থাৎ শ্রদ্ধার বিষয় তাহ'লে মনেই করো না! শো করে। পুরুষ-শিল্পীর সঙ্গে নারী-শিল্পীর এইখানেই তফাৎ।

সু-র কথার সুরে বড় মধুর কৌতুক। বললাম:

—তোমার মধ্যে সূক্ষ্মরস নেই এ-কথা যে বলে, সে অরসিক।

—বলো কি! হাতে হাত দাও। কথাটা এখনি শোকে বলে আসি! নাঃ, বোধ হয় বিশ্বাস করবে না আমার মুখের কথা। লিখে দাও, এক কলম লিখে দাও!

হাসতে লাগলাম। সু-কে বড় ভালো লাগল আজ। হঠাৎ

—ক্রিং, ক্রিং, ক্রিং, ক্রিং, ফোনে আহ্বান এল।

আবার কে?

বিরক্ত হয়ে রিসিভারটা হাতে তুললাম। বলল সু:

—দেশবিখ্যাত অভিনেতা, তোমার কি অল্পেতে বিরক্ত হওয়া সাজে?

—ফোনটা এ-ঘর থেকে তুলে দেব,

বললাম নিষ্প্রাণ। তারপর :

—হ্যালো। কে ?

—ব্ব আছেন ?

একজন মহিলার কণ্ঠস্বর। কে যেন...

—আমি ব্ব।

—আপনি ব্ব !...কী ভাগ্য আমার। আজ এক ডাকেই সাড়া মিলল... আমি শো।

শো ! এক ঝলক যৌবনের বিদ্যুৎ সুর হয়ে নেচে গেল হৃৎপিণ্ডের স্পন্দনে। মুখ দিয়ে হঠাৎ আর কোন কথা এল না।

—ব্যাপার কি, ডাকে কে ?

—শো !

অস্থিরতার একখণ্ড কালো মেঘ ভেসে গেল সু-র চোখের ওপর দিয়ে। কিন্তু সেটা মুহূর্তের ব্যাপার মাত্র। চকিতে পূর্ববৎ কৌতুকের সুরে গান গেয়ে উঠল সু :

—মেঘ না চাইতেই জল। ভাগ্য ভালো। তবে আর লিখতে হবে না—মুখেই ভাই বলে দাও—

অর্থাৎ কিছুই যে বলতে হবে না, তা বুঝে চুপ করে' রইলাম।

—এ কি, চুপ করে' আছেন যে !

—সত্যি আমার কী সৌভাগ্য—

—মিথ্যা অভিনয় রাখুন।...আপনাকে অভিনন্দন জানিয়ে যে চিঠি দিলাম—তার উত্তর কি একটা দিতে নেই ?

—সে কি, আপনার চিঠির উত্তর দেব না ?...আমি তো আপনার কোনো চিঠিই পাই নি।

—পান নি ? আশ্চর্য। সু তো নিজের হাতে নিয়ে গেল সেই চিঠি।

—কবে দিয়েছেন সে চিঠি ?

—সে তো আজ দশ বারো দিন হয়ে গেল।

—সু, আমার চিঠি ?—জিজ্ঞাসা করলাম সু-কে। শো সেটা শুনতে পেলেন। তাই :

—সু ওখানে আছে নাকি ?

শো-র গলার স্বর কেমন যেন বেসুরো শুনাল।

—এই যে, আমার পাশেই আছে বসে!...এসো সু, কৈফিয়ৎ দাও। চিঠি গাপ্ করেছ। জানো সে আমার কত মূল্যবান্ চিঠি !

—হ্যাঁ, কী বলছ ?

—সু ?...আমার চিঠি দাও নি বৃ-কে ?

—একেবারে ভুলেছি !

—আজও দিলে না কেন ?

—সত্যি কথা বলতে কি, চিঠিখানি কোথায় হারিয়ে ফেলেছি। তা তুমি যা লিখেছ, বৃ-কে বলেছি ঠিকমতো।

—মানে ? তুমি আমার চিঠি খুলেছ ? পড়েছ ? এ তোমার অন্যায় সু।

—× × ×

—স্রেফ্ মিথ্যাকথাটা শো-কে বললে বৎস! তা কী ছিল সেই চিঠিতে, বলো।

—প্রেম।

—তোমার সকল ব্যাপারই কৌতুক !

—× × ×

—হ্যালো...যাক, কানেকসন কেটে দিয়েছে। বাঁচা গেল।

রিসিভারটা যথাস্থানে রেখে দিয়ে সু বসল স্থির হয়ে। যেন কিছুই এমন হয়নি, এই ভাব দেখিয়ে পুনরায় পাইপ ধরাল। টান দিল আপনমনে। নিস্তব্ধতায় কিছুক্ষণ কাটলে—

—সে চিঠি তুমি পেতে চাও ?

বলল উদাসীন গাম্ভীর্যে।

—না।

বললাম কঠিন স্বরে। চমকে মুখ তুলল সু। পকেট থেকে বার করল নীল খামে ভরা চিঠিখানি।

—রাগ রাখো বৎস। নাও।

চিঠিখানি টুক্‌রো-টুকরো করে' ছিঁড়ে ফেললাম খাম সমেত। বিস্মিত সু হাঁ করে' চেয়ে রইল আমার মুখের দিকে। বলে' গেলাম:

—যা তুমি প্রাণ ধরে দিতে পারো না, তা আমি নিতে চাই না সু।

পাইপটা এ্যাস্‌ট্রেটার ওপর হেলান দিয়ে রেখে দিয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল সু। আমার হাতদুটো চেপে ধরল হঠাৎ। বলল আর্ত ছন্দে:

—ক্ষমা করো বন্ধু। আমি বড় দুর্বল।

—কিন্তু তোমার আজকের কথায় আশ্বস্ত হলাম বু। আর আমার কোন ভয় নেই।...আমাকে ক্ষমা করো ভাই।

—অমন কঠিন হয়ে বসে থাকলে লজ্জায় আর কোনদিন তোমার কাছে আসতে পারবো না বু!

বর্ষার মেঘের মত থমথমে হ'য়ে এল সু-র মুখ।

অদ্ভুত অভিনেতা এই সু। একফোঁটা চোখের জল দেখিয়ে মুহূর্তে আমাকে জয় করে' নিল।

শো তাহ'লে আমাকে *চিঠি লিখেছিলেন, চিঠি লিখেছিলেন* অভিনন্দন জানিয়ে! সু আমার বিশেষ বন্ধু, তবু এত বড় একটা স্মরণীয় পুরস্কার থেকে সে আমাকে বঞ্চিত করল! কেন যে করল! কেন যে করল—তা অনুমান করা যে খুবই কঠিন, তা নয়—কিন্তু বন্ধুকে এমনি দীনের মত হীনের মত অবিশ্বাস করা কি এতই সহজ? তার প্রণয়িণী যদি শো, তবে সেটা তো সুখের কথা, আনন্দের কথা। বন্ধুর প্রণয়ণী কি বন্ধু পারে না হতে? শো শিল্পী, আমিও শিল্পসাধনায় হয়েছি অগ্রসর, এতে যদি তাঁর শ্রদ্ধা জেগে থাকে, জেগে থাকে অনুরাগ, তবে সহজভাবে সেটাকে কেন সে নিতে পারে না? নিজের দিকে চেয়ে কেন সে যা তা ভাবে, ভেবে দুঃখ পায়, দুঃখ দেয়?...পুরুষের প্রতি নারীর ভালবাসা শুধু কি বিশেষ একটি প্রাকৃত বিধিকেই নির্দেশ করে? কিংবা নির্দেশ করে গতানুগতিক একটা সামাজিক নীতি? মানে—নারী হলেই হয় সে মা কি মেয়ে, ভগ্নী কি প্রেয়সী? বন্ধু হতে পারে না—আত্মার বন্ধু? চাওয়া নয়, পাওয়া নয়, দায় নয় দায়িত্ব নয়, শুধু আত্মার আনন্দে বন্ধু? স্মরণে বন্ধু, বরণে বন্ধু, মননে বন্ধু? নারী কি বন্ধু হতে পারে না পুরুষের?

সু-র সঙ্গে এ-সব আলোচনা করা বৃথা। বোধ করি আধুনিক সমাজে কারুর সঙ্গে-ই এ-আলোচনা করে ফল নেই।...বোধ করি সু-ই সত্য: সুন্দরে নারীর নিত্য অভিসার। ঈশ্বর আমাকে সর্বাঙ্গসুন্দর করে গড়েছেন—তাই বন্ধু হয়েও সু-র নাকি আমাতে ভয়? বলে না হ'ক, ছলে ও কৌশলে তাই সে আমাকে শো থেকে অহরহ দূরে রাখার চেষ্টা করে। কিন্তু সু তো এমন ছিল না! কত নারীবন্ধুর কাছে সে আমাকে জোর করে' নিয়ে গেছে—না যেতে চাইলে অভিমান করেছে, এই শো-কেও তো সেবার আমার সম্বর্ধনাসভায় স্বেচ্ছায় নিয়ে আসার চেষ্টা করেছে—শোর সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দেয়ার প্রস্তাবও করেছে একাধিকবার।

শো সম্বন্ধে আমি যে খুব সবল ব্যক্তি, তা অবশ্য বলি নে, কিন্তু বিধাতা আমাকে শালীনতার ও ভদ্রতার সম্পদ থেকে তো বঞ্চিত করেন নি। উপরন্তু বোধ করি সু-র জন্যই শো সম্বন্ধে জ্ঞাতসারে অথবা অজ্ঞাতসারে কোন ঔৎসুক্যই আমি প্রকাশ করি নে। এটাই কি সংশয় অবিশ্বাস ও আতংকের কারণ? কিংবা এটাও কি হতে পারে না, যে, সু-র কাছে মাঝে মাঝে শো নিজেই আমার সম্বন্ধে এমন কথা, এমন ঔৎসুক্য প্রকাশ করে, যা—সু-র মত প্রণয়ী পুরুষে সহ্য করতে পারে না?...শো কি আমার কথা বলে? কী বলে? কেমন ভাষায় বলে?

আতংকে, আনন্দে অকস্মাৎ বুকটা গুর গুর করে উঠল। শো কী বলে? এমন কিছু কি বলে যার ভাবে শ্রদ্ধা, ভাষায় ভক্তি, ছন্দে মিনতি, ব্যঞ্জনায় প্রেম!

সু বলে গেল তার চিঠিতে ছিল প্রেম। না, তামাসা নয়। সত্য না হলে সু সেটাকে গোপন করতে যাবে কেন?

আমার অভিনয় তার ভালো লেগেছে! কী রোমাঞ্চ এই চিন্তায়। কী উত্তেজনা এই চিন্তার ছন্দে! যাকে দেখে আমার শিল্পসাধ ও সাধনা—সে-ই কৃতাঞ্জলি গান ধরেছে, ভালো, তুমি বড় ভালো? ভালবাসি তোমাকে?...

—অভিনন্দন জানিয়ে চিঠি দিলাম, কিন্তু উত্তর তো দিলে না—

—চিঠিটা ছিঁড়ে ফেললাম।

—সু-র সন্দেহ তাতে আরো কি বাড়ল না?

—বাড়ুক, বাড়তে দাও। প্রেম যদি অনুভব করে থাকি, মানবো না কারুকে।

—জোর আছে?

— × × ×

—আসলে তুমি দুর্বল, তুমি ভীরু। যেটাকে তুমি শালীনতা বলে' রুচিরসের আনন্দ আস্বাদ করছ, আসলে সেটি ভদ্র-হৃদয়ের বন্ধ্যা ভীরুতা ছাড়া আর কিছু না।

—তবে কি ?

—আসতে হবে। এসো।

চমকে জেগে উঠলাম ডাক শুনে। নিস্তব্ধ হয়ে মনের রঙ্গমঞ্চে শো ও বৃ-র কথা শুনছিলাম আত্মমগ্ন। যাব? একদিন যাব? যাব না-ই বা কেন? কতজনের কাছে যাই, একবার তো গেলেই পারি তার কাছে? কিসের বাধা? সু-এর? আত্মপ্রতারণা অনেক করেছ, আর নয়।...শিল্পীর কাছে শিল্পী যাবে—এতে দোষের কিছু নেই। নাকি নেই? শো একজন কুরূপা হলে মুগ্ধ হতে তার শিল্পনৈপুণ্যে? কিংবা শো যে চিঠি লিখল তার মূলে কি শুধু শিল্প প্রতিভার প্রতি অনুরাগ? রূপ কি রূপকে টানে না, টানছে না? কিন্তু তাতে হয়েছে-ই বা কী? রূপ কি নয় স্বয়ং শিল্প—যে শিল্প বিধাতার সৃষ্টি? শো বিধাতার অনিন্দ্যসৃষ্টি—কেন তাতে মন যাবে না?

সিনেমাপত্রিকায় মুদ্রিত শো-র রঙিন ছবিগুলি দেখতে দেখতে রাত বুঝি বারোটা বাজল। কিন্তু চমৎকার ছবি! যেন দা ভিঞ্চির মানসকন্যা, র‍্যাফাএলের প্রিয়সখী। সুন্দর ফ্রেমে একখানি বাঁধিয়ে দেওয়ালে টাঙিয়ে রাখলে কেমন হয়?

চমৎকার হয়। এই ছবি টাঙিয়ে রাখব আমার ঘরে—যেখানে মার ছবি আছে টাঙানো, যেখানে ফুলের মালায় সাজানো আছে মা-র গুরুদেবের তৈলচিত্র!

—মতিচ্ছন্ন,—অন্তরাত্মার গহনে কে যেন হেসে উঠল ভর্ৎসনার ভঙ্গীতে। তা মায়ের ছবির নিচে আমারো তো একখানি ছবি রয়েছে। আড়চোখে গর্বভরে ছবিখানি দেখলাম। শোর ছবিখানি ঠিক তার পাশে টাঙালে কি দোষের হয় বলো।...শো ভালো আর্টিষ্ট, এ-বিষয়ে তো কোন সন্দেহ নেই। ভালো দেখতে হলেই যে দেওয়ালে স্থান দিতে হবে এমন কোন যুক্তি দেখাব না, কিন্তু গুণীর আদর তো করতে হয়।

তা যদি করতে চাও, তবে টাঙাও না কেন সী-র ছবি? তাঁর মত গুণী শিল্পী ক-জন আছেন ভারতবর্ষে? বয়স হয়েছে, এখন আর অভিনয়ে

বড় একটা নামেন না, ছোকরা-রাও তেমন আর তাঁকে স্মরণও করে না আগের মত, কিংবা যদি করে, ধ্যান করে না আগ্নেয় যৌবনে !...তোমারও কি তাই দশা নয় বাপু ?

না, না—সী-কে আমি শ্রদ্ধা করি। তাঁর ছবি একখানি রাখলে মন্দ হয় না। তাঁর একখানি তরুণবয়সের ছবি কি মেলে না ?...তা কেন ? বুড়ো বয়সের রূপে মন দোলে না কেন ? যৌবনেই শিল্পসৌন্দর্য, বার্ধক্যে নয় ?

কত ভণ্ডামোই যে করে এই মন। চেতনায় কত শিল্পরুচির অনাসক্তি, কিছু বেদনায় কত উগ্ররুচির হাহাকার ! সত্যি, সী-র মত শিল্পীর ছবি সংগ্রহে-ও কোন উত্তাপ করি না অনুভব। অথচ কতই না ভক্তি করি তাঁকে, কত জ্ঞানই না লাভ করেছি তাঁর কাছ থেকে।

চিত্রের মোহে পড়ার সময়ে প্রথম প্রথম প্রায়ই যেতাম তাঁর কাছে। যখন যেতাম—তখনই তাঁর পঞ্চাশ পার হয়ে গেছে। প্রায়ই তাঁকে দেখতাম যোগিনীর বেশে, পূজার ঘরে।

একদিন তিনি আমাকে অপ্রত্যাশিতভাবে প্রশ্ন করলেন :

—প্রায়ই তুমি আসো দেখি। কিন্তু কেন আসো ?

—ভালো লাগে।

—ভালো লাগে ? কী ভালো লাগে ?

—আপনার চালচলন, কথাবার্তা !

—ছেলেমানুষ।

একটু থেমে আপন মনেই পুনর্বার :

—ভালো না।

—খারাপটা কী দেখলেন ?

—সময়ের অপচয়। শুনেছি তুমি এম্-এ ক্লাসে ভর্তি হয়েছ।...লেখাপড়া করো। এখন তোমার সেই বয়স। কত কী তো শেখার আছে। কেন অসময়ে বিপথে যাচ্ছ ? মানুষ হতে চাও না ?

—নিজের ক্ষেত্রে হতে চাই মানুষ...আমি চিত্রাভিনেতা হবো। সেই আমার ব্রত।

—ব্রত? ওটা তোমার কাঁচা বয়সের মোহ। বলি, মেয়েমানুষের সঙ্গে মেলামেশা করে' মজা পাও তো? ভালো লাগে তাদের?

—সত্য কথা ব'লবো। লাগে।

—লজ্জাহীন ছোকরা। দূর হও আমার সামনে থেকে।—বললেন সী। হঠাৎ তারপর মায়ের মত স্নেহাকুলতায় গলে গিয়ে সুর বদলে পুনর্বার ঃ

—কথা শোনো। ভদ্রঘরের ছেলে তুমি। সত্যবাদী। শিক্ষিত। এ-পথ তোমার নয় বৃ। এ-পথ বড দুঃখের, বড় লজ্জার। এখানে পদে পদে পরীক্ষা, পলে পলে পতন।

—পরীক্ষা বা পতনকে জয় করতে চাই।

— ওটা কথার কথা। এ ঘাটে এসেছে অনেকে, নেমেছে অমৃত-স্নানের শান্তি-অভিলাষে, ভেসে গেছে মোহের তরঙ্গে। অনেককে আমি নষ্ট হতে দেখেছি বৃ।

—আমিও যে অনেকের মত নষ্ট হয়ে যাবো, এটা ভাবছেন কেন?

—তোমার রূপ দেখে, তোমার আদর্শবাদের আতিশয্য চিন্তা করে'। বাবা, আমাদের এ-লাইনে এখনও কেউ শিল্পের ব্রত নিয়ে আসে না, আসে মোহবিলাসের পাপ নিয়ে। দু-একটি যারা আসে, বাণের জলে তারা ভেসে যায়। সিনেমার পথ শিল্পব্রতের পথ নয়, এ-পথে তোমাদের মত ছেলেদের আসার তাই সময় হয় নি।

—কবে হবে?

—শিল্পের প্রতিভাধারীরা যখন চরিত্রধর্মকে জানবে এবং মানবে। উন্নত রুচি, শিক্ষা ও সংস্কৃতির সাহায্যে এখানকার দূষিত আবহাওয়া যখন দূর করবে, তখনই তোমরা শিল্পব্রতের আদর্শ নিয়ে এদিকে আসতে পারো। তার আগে না।

—তার আগে আমরা সব পেছিয়ে থাকবো? অপেক্ষা করবো?

—করতেই হবে বৃ। আমি ছবির শিল্পী। বহুদিন এ-শিল্প নিয়ে আছি। আমি জানি, বাজে মেয়েদের পাল্লায় পড়ে কত সোনার চাঁদ ছেলে গেল নষ্ট হয়ে।

—কিন্তু মেয়েদেরই শুধু দোষ দিচ্ছেন কেন? বাজে ছেলেদের প্রভাবে পড়ে ফুলের মত মেয়েও কি পায় না কষ্ট?

—ও তো একই কথা হ'ল বৃ। ছেলে হলেই সে ভালো আর মেয়ে হলেই মন্দ, এমন কথা বলা আমার উদ্দেশ্য নয়। তবে আজ পর্যন্ত দেখে আসছি—সিনেমার জগতে ভদ্রঘর থেকে আসে ছেলের দল, তাদের অনেকেরই থাকে উচ্চ সংস্কার—কিন্তু মেয়ের দল আসে সমাজের অত্যন্ত নীচু স্তর থেকে—অনেকেই আবার তাদের মধ্যে একেবারে নিরক্ষর। এই কারণে তুচ্ছে-ই দেখি তাদের আনুরক্তি।

—তাহ'লে এই কি বলতে চাচ্ছেন, যে, ভদ্রঘরের শিক্ষিত মেয়েরা এ-পথে এলে তুচ্ছ বিষয়ে আনুরক্তিটা আর থাকবে না?...ভদ্র ঘরের মেয়েরা কি তুচ্ছ বিষয়ে নামতে পারে না?

—সেটা ছেলেরা-ও পারে বৃ।...কিন্তু তুচ্ছ বিষয় বলো কাকে? সত্যকার প্রেম তো তুচ্ছ বিষয় নয়, দায়িত্ববিহীন উচ্ছৃঙ্খলতা-ই তুচ্ছ বিষয়, লজ্জার বিষয়। শুধুমাত্র সাময়িক তৃপ্তি, কয়েকটা টাকা, দু-একটা স্ফূর্তির আসর, দুচার বোতল মদ—এ-সবের জন্যে শিক্ষিত মেয়ে অপরিণামদর্শী দেহবিক্রয়ের পথে নামবে না বলেই তো জানি। তারা সংযত থাকবে নিজেদেরি গৌরবে, শিল্পের আদর্শটাই তাদের কাছে হবে বড়, ভালবাসা হবে পবিত্র, রুচিসুন্দর, তাদের প্রেরণায় পুরুষেরা পাবে গান রচনার আনন্দ, ফলে আয়ু বৃদ্ধি পাবে তাদের, আয়ুক্ষয়ের লজ্জা জাগবে না যৌবনে।

—বাজে মেয়ে যাদের বলছেন, তাদের মধ্যে কি এসব গুণ থাকতে পারে না?

—পারে না, তা বলি নে। কিন্তু অধিকাংশের মধ্যেই তো দেখেছি—নানাকারণে উচ্চ সংস্কারের অভাব। এতটুকু প্রমোদ পেলেই তারা

প্রমত্ত। আমি যে দেখেছি। আমি নিজেই কি কম পুরুষকে নষ্ট করেছি! বড় কষ্ট হয় আজ!

তাঁর বড় বড় চোখদুটি বুঝি বেদনার জলে টলটল করে উঠল। সেই জলে যেন প্রতিচ্ছায়া পড়ল তাঁর হৃদয়ের। নিতান্ত নিম্ন সমাজ থেকে তিনি এসেছিলেন। নিজের প্রতিভায় এবং যথোচিত সাধনায় উন্নীত হয়েছিলেন সম্মানের শীর্ষলোকে। তাঁর ধারণা ভদ্রসমাজের সংস্কার যদি তাঁর থাকত, তিনি অন্তরের দিক থেকে আরও অনেক বড় হতে পারতেন। তাঁর এ-ধারণাকে আমি সত্য বলে গ্রহণ করতে পারি নি। তিনি-ই তো প্রকৃষ্ট প্রমাণ, পাঁকের মন্দ দুর্গন্ধ পরিবেশ থেকে-ও পদ্মের মত নির্মল রুচির প্রকাশ ঘটতে পারে।...অবস্থার চক্রে ঘুর্ণিত হয়ে অসহায়ভাবে মানুষ কী করেছে—জীবনব্যাপারে সেটাই বিচার্য বিষয় নয়, নিতান্ত দুরবস্থার দুর্গম দুর্গ থেকে সবলে বেরিয়ে এসে মুক্তির স্বাচ্ছন্দ্যে মানুষ তার কল্যাণকে আহ্বান করতে পেরেছে কি না—সেটাই তো দ্রষ্টব্য বিষয়। রূপসী অর্ধকাশীর জীবনে গণিকা-বৃত্তিটাই আসল কথা হবে, আসল হবে না তাঁর ধ্যান, তাঁর তপস্যা, তাঁর ত্রিবিদ্যাপ্রাপ্তির অনন্ত মহিমা? কবিগুরু বাল্মীকির জীবনে তাঁর দস্যুতাটাই বড় করে' দেখব, শুনব না তাঁর কীর্তিসুন্দর মধুর রামায়ণ-গান?

না, সী-কে আমি তপস্বিনী জ্ঞানে পূজা করি; তাঁর জীবনে মন্দ যদি কখন-ও কিছু ঘটে থাকে, সেটা তাঁর তপস্যার অগ্ন্যুত্তাপে কবে দগ্ধ হয়ে গেছে অতীতে। আজ তার চিহ্ন মাত্র নেই। জীবনের অগ্নিপরীক্ষায় আজ তিনি শুচি সুন্দর। তাই তাঁর শিল্প সুন্দর, আদর্শ সুন্দর, কথা সুন্দর, রূপ—

কে বললে সুন্দর নয়? রূপ দেখতে হলে মানুষকে ভক্ত হতে হয়। ভক্তির দৃষ্টি যার নেই রূপের জগত তার কাছে অন্ধকার। সী-কে ভক্তি করি, তাঁর একখানি ছবি টাঙালে তো হয় মায়ের পাশে।

মায়ের পাশে? আশ্চর্য মানুষের সংস্কার! মায়ের পাশে সী-কে বসাতে গিয়ে চমকে উঠলাম দ্বিধাগ্রস্ত চেতনার আঘাতে। মায়ের চেয়ে বড় কে আছে? সত্যিই নেই। কিন্তু মায়ের মত যাকে বলি তাকে তো ঠিক মা-ই মনে করি নে, মায়ের মত বলে, তাঁর গৌরব বাড়াই, শ্রদ্ধা জানাই—এই মাত্র। উপমেয় কবে হয়েছে উপমানের তুল্যমূল্য? চাঁদের মত মুখখানি বলে' মুখখানির রূপ ও ঔজ্জ্বল্য যতই বাড়াবার চেষ্টা করি কেন, কে না জানে কোনো মুখ-ই নয় চাঁদের সমান?

সী-কে বলি মায়ের মত। কিন্তু এ কী! অন্তরাত্মা কেন সায় দেয় না এই উপমার লক্ষণায়? সী-র প্রতি তবে কেমনতর আমার ভক্তি? আসলে ভক্তি-ই তো?

বুদ্ধি ও যুক্তি দিয়ে যাই কিছু বলি না কেন—মানুষের মন অতীতটাকে যে একেবারেই যায় বিস্মৃত হয়ে—এটা বোধ হয় সত্য নয়। অতীতের কৃতকর্ম স্মৃতিতে না থাক, বিস্মৃতির অতলে থাকে প্রচ্ছন্ন। সামাজিক কাজকর্মে সেটা হয়তো প্রকাশ হয় না, কিন্তু আধ্যাত্মিক চেতনাভাবে সেটার প্রভাব নয় অল্প। মুখে সামাজিকভাবে অনেককেই মানুষ মা বলতে পারে, মাসী বলতে পারে, দাদা বলতে পারে, বাবাও পারে বলতে—কিন্তু আধ্যাত্মিকভাবে সেই শব্দের ধ্বনিটুকু গ্রহণ-করার ভক্তিচেতনা যেখানে নেই—সেখানে শব্দটা শূন্য শব্দই মাত্র, মন্ত্রের ওঁঙ্কারধ্বনির মত প্রাণময় নয় কখনও। সী-কে মা বলে' মায়ের পাশে রাখতে গিয়ে হঠাৎ আমার এ-তত্ত্বের উপলব্ধি হল। বুঝতে পারলাম—সী তাঁর অতীত জীবনের বেদনায় কেন গোপনে ব্যথিতা। বুঝতে পারলাম—শিল্পীজীবনে যদি শান্তি চাই—জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করতে হবে এমন নিয়মে, যাতে বিস্মৃতির গোপন আঁধারেও লজ্জা না থাকে, কোনো অভিসন্ধি না জাগে।

তা-ই কী হয়? হয় না বলেই তো শিল্পীর সংগ্রাম। হলে তো সব ফুরিয়েই গেল। হবে না, তবু হওয়াতে চাই—এই প্রাণপণ

প্রচেষ্টার নাম-ই তো শিল্পের সাধনা। শো-র প্রতিভা আমার হবে না, হতেই পারে না—তবু হওয়াতে চাই, তাই তো নিভে যাই নে, চেতনার আগুনে দীপ্যমান থাকি নিত্যকাল!

কুক দিয়ে হেসে উঠল মন। বেচারা ব্! অন্তরঙ্গ মনটাও তার সঙ্গে প্রতারণা করছে গোপনে। নাকি শো-র প্রতিভাতেই ব্ মুগ্ধ, তার রূপে নয়?...যাই বলো বাপু, রূপমোহের সত্যটাকে উপেক্ষা করার স্পর্দ্ধাপৌরুষে তুমি অন্ধ। অন্ধতা থেকে বেরোও! মনের প্রতারণা থেকে নাও মুক্তি।—ইঙ্গিতময় আত্মযন্ত্রনার অন্ধকার ভাষা থেকে স্বচ্ছ হও, দিনের আলোর মত স্বচ্ছ। বলো, কী চাও, বলো, কেন চাও!

শো-কে চাই?...না, মিথ্যা বলব না। আমি চাই। চাই, চাই, চাই।...ভালো কথা, 'নও জোয়ানে'র মত কথা। বোঝা গেল, কেন মন মরে থাকে মৌনের কবরে! কেন তার তেমন সাড়া নেই!...ভালবেসেছ তাহ'লে?...না!

নিজেকে, সত্যি, আমি বুঝতে পারি না। কখনও কখনও অবশ্য মনে হয় ভালো বুঝি কারুকে বেসেছি, কিন্তু আসলে বোধ হয় আমার ভালবাসা বিশেষ কোন ব্যক্তিকে ঘিরে মুক্তি পায় না—নৈর্ব্যক্তির বিলাসেই তার আত্মস্ফূর্তি। বিশ্বের নারীজাতিকেই আমি ভালবাসি, বিশেষ কোনো রূপে যে মুগ্ধ হই না তা-ও নয়, কিন্তু মুগ্ধ হয়েছি যার রূপে—সে-ই যদি আসে ধরা দিতে, হয়তো উদাসীন হব অবিশ্বাস্য আলস্যে; হয়তো স্বপ্ন দেব ভেঙে, ছুটে পালাব ভগ্নদূতের বৈরাগ্যে। এক এক সময় এও বুঝি মনে হয়, আমার প্রেমের যোগ্য নারীই জন্মায় নি পৃথিবীতে। আজ পর্যন্ত, এই কারণেই বুঝি—কোনো নারীর প্রেমেই আত্মবিস্মৃত হই নি কখনও।

কিন্তু শো-কে কাছে পেলে কী হয়? কী হয় তা কী জানি। ছবি দেখে কি মন ভরে? অল্পে মন ভরেছে কোন্ শিল্পীর? শো-কে

একবার দেখতে চাই। দেখতে চাই—আমার যোগ্য নারী জন্মেছে কি না পৃথিবীতে।

হেসে উঠলাম আপন মনে। কী অহংকার দেখো। বোধ করি অর্থ, ঐশ্বর্য, রূপ, স্বাস্থ্য, যৌবন ও যশঃপ্রতিষ্ঠার এই অহংকার! কিংবা হয়তো এ অহংকার আমার একার নয়। নিখিল তরুণ পুরুষেরি এটা আদিম অহংকার, অনাদি যৌবনবিভ্রমের এটা চিরন্তন স্বপ্নবিলাস!

হাসলাম আবার। চুরুটটা হাতে থাকতে থাকতে নিভে গেছল এতক্ষণে। দেশলাই জ্বাললাম।

সকালের ডাকে দুখানি চিঠি পেলাম: একখানি অনেকদিন পরে মার কাছ থেকে, আর একখানি—কল্পনা করুন তো কার থেকে? আমি তো কল্পনাই করতে পারি নি, শো এত শীঘ্রই আমাকে পত্রোত্তর দেবেন, দেবেন এই ভাষায়, এই ছন্দে, এই আনন্দে, এই স্বপ্নভরা যৌবনচেতনার সৌম্যসৌখ্যে! চিঠি এত সুন্দর হয়? প্রভাতের আলোর মত এত সুন্দর?

দিন চার-পাঁচ আগে শো-কে একটা চিঠি অবশ্য লিখেছিলাম। সু-র মারফৎ যে চিঠিখানি শো আমার কাছে পাঠিয়েছিলেন তা আমি পড়তে না পেলে-ও অনুমানে তার মর্মকথা আস্বাদ করে উত্তর-ই যেন লিখেছি—এই ভাবে সে চিঠিখানি লিখেছিলাম। কী সৌভাগ্য শো তো পেয়েছেন! কী আনন্দ শো তা পড়েছেন, চারবার, পাঁচবার, ছয়বার। 'মাণিক্যের মঞ্জুষায়' তুলে রেখেছেন আবার নিভৃতে পাঠ করার জন্যে! নাকি আমি তাঁর 'স্বপ্ন', তাঁর 'শিল্প', তাঁর 'হৃদয় বেদনার আনন্দ'! রাত্রির গভীরে আমি নাকি 'দর্শন' দিই 'নববেশে', 'নূতন উচ্ছ্বাসে'? তখন 'সুরে-গড়া' আমার দেহ? 'ভাবে-ভরা' ভাষা? 'স্বপ্ন-ঝরা' চাহনি?

হঠাৎ সকালটা কী সুন্দর বলে যে মনে হল। মার শরীর খারাপ যাচ্ছিল, এখন ভালো আছেন! ভাই-বোনেরা, হ্যাঁ, ভালোই আছে সব। বাবা ব্যবসার ব্যাপারে গেছলেন কানপুর, ফিরেছেন দিন চার হ'ল। নানাকারণে বড় চিন্তান্বিত ছিলেন, এখন সব সমস্যার নাকি সমাধান হয়েছে গুরুর আশীর্বাদে।...অনেকদিন তো লক্ষ্ণৌ যাই নি, যেতে কি ইচ্ছা করে না? মাকে মনে পড়ে না?

খুব, খুব পড়ে। মা বেটী কেন যে বোঝে না। এই তো বছর দুই আড়াই আগে বলা নেই, হঠাৎ ছুটে গেলাম তাঁর কাছে। গেলেই মনে-পড়ানোটা বোঝানো হ'ল, নইলে নয়? মা, আমার মা, কী মধুর

তোমার অভিমান। বুড়ো খুকী, লজ্জা করে না কচি মেয়ের মত অভিমান করতে!

কিন্তু আমার বুঝি অভিমান হয় না? ছবিতে নেমেছি বলে' বাবা না হয় রাগ করে আছেন, কিন্তু মার তো একবার আসা উচিত ছিল সেগুলি দেখার জন্যে? কত লোকে যে প্রশংসা করছে। কত লোকে আমার 'অটোগ্রাফ্ সমেত' ফটো সংগ্রহ করে 'টেবিলে রাখে সাজিয়ে'। সামনে ভালবাসার আবেগে 'ফুল রাখে বিছিয়ে'। 'সব কথা মুখে গুছিয়ে বলা যায় না বলে ফোনের সাহায্য নেয় না, লেখে চিঠি!'

এই চিঠি—এত সুন্দর চিঠি? কে জানত এত বড় হয়ে গেছি রাতারাতি! সকাল বেলায় উঠে, আজই যেন বলা যায়, বিখ্যাত হয়ে গেছি দেশে দেশান্তরে। এত ভাব, এত ভাবনা, এত আলো, এত আর্তি আমার জন্যে?...কী সুন্দর হাতের অক্ষরগুলি—কালোর অন্তর ভেদ করে প্রভাসিত হচ্ছে হীরের আলো। এই যে, দেখতে পাচ্ছি: সূর্যের আলোর মুখে ঝকমক করছে সপ্তরঙের বৈচিত্র্যে। এক এক রঙে এক এক ভাব! চিঠির ভাষায় এত ছন্দ, এত রঙ, এত আরতি, এত ইঙ্গিত প্রকাশ পেতে পারে—কে জানত?

লিখলাম দীর্ঘ উত্তর। উপসংহারে আত্মবিহ্বল আত্মসমর্পণ: যাব, নিশ্চয় যাব। দেখা দেয়ার জন্যে ততটা নয়, যতটা দেখা পাওয়ার জন্যে। 'বললে হয়তো মনে করবেন বাড়িয়ে বলছি, কিন্তু মনে মনে আমি আপনার ভক্ত। আপনার ছবিই আমার শিল্প, বোধ করি চেতনাও।'

কিন্ত এতটা লেখা কি ঠিক হল? আলবৎ হল। দীর্ঘ চিঠির উত্তরে দীর্ঘ চিঠি দেয়াই তো সৌজন্য। সত্যি, শ্রীমতী শো-র তো এতটুকুও লজ্জা করল না এতবড় চিঠিখানি লিখতে। আলাপ নেই, পরিচয় নেই,—হঠাৎ এত কথা বলা, কী এর অন্তর্গূঢ় তাৎপর্য? অনেকদিন ধরে' কথাগুলি গোপনে জমা হচ্ছিল তবে? অন্তরের গোপনে সঞ্চিত হয়েছিল অকথিত বিপুল বেদনা, যার প্রতিক্রিয়া-ই বুঝি আশ্চর্য এই শিল্পসান্ত্বনার অবারিত

স্বপ্নোচ্ছ্বাস? কিংবা বোধ হয় এই সত্য: পাহাড়ের বন্দী গুহায় বাঁধা পড়েছিল উন্মাদ তরঙ্গধারার বিদ্যুৎ বেদনা, পাষাণ-বাধায় আঘাত করছিল পুঞ্জীভূত, ঘনীভূত শক্তিতে—কখন হঠাৎ বাধা গেছে সরে, বেদনা তাই উথলে উছলে উঠেছে উপচীয়মান চেতনার চাপল্যে!......অন্ততঃ আমার তো দেখছি সেই দশা। নইলে এত বড় চিঠি—এতটা বড় চিঠি, একটানে ধৈর্য ধরে' যে লিখতে পারি, জানাই তো আগে ছিল না।

ফেলে দেব এতটা বড়? কেন দ্বিধা, কেন দ্বন্দ্ব, কেন সংকোচ।

না, সংকোচ এল কেমন যেন: সু আকস্মিক ভাবে ঘরে এল। রক্তে বহে গেল অকারণ অস্বস্তির তরঙ্গ। চিঠিখানি মুড়ে ফেললাম সন্তর্পণে। ড্রয়ারে রাখবার অবসর হল না। কেন হল না?

সু এসে বসল পাশের চেয়ারে। সামনেই টেবিলে তখন-ও পড়েছিল শো-র চিঠিখানি। আড়চোখে একবার দেখল। তারপর অত্যন্ত সহৃদয়তার সঙ্গে জিজ্ঞাসা করল:

—আজ-ই পেলে?

—হ্যাঁ।

—এত শুক্‌নো দেখছি কেন তোমাকে? শরীর খারাপ নাকি?

—নাঃ।

—আর না। শরীরের যত্ন নাও আর্টিষ্ট, নইলে যা পেয়েছ, ক্রমে সবই যাবে।

শো-কে লেখা চিঠিখানি এইবার ড্রয়ারে রাখতে গেলাম। সু বলল:

—দর্শনের কোনো প্রবন্ধ নাকি হে?

—না।

—নিশ্চয়ই দর্শনের প্রবন্ধ। নইলে আমাকে না দেখিয়ে যে লুকিয়ে ফেলছ?...তা ওটি কী বস্তু?

—চিঠি। দেখতে চাও? শো-কে লিখছি।

আড়ষ্ট হৃদয়ভাবটিকে দমন করে একটু জোর দিয়েই বললাম। কিন্তু কোনো বিকার দেখলাম না সু-র মুখমণ্ডলে। শুধু পকেট থেকে

সিগারেট-কেসটা সে বার করল। কেস থেকে সিগারেট একটা বার করে :

—দেশলাইটা একবার দাওতো আর্টিষ্ট্। আনতে ভুলেছি।

ড্রয়ার থেকে বার করে দিলাম দেশলাই। সিগারেট ধরাল সু। টান দিল আনমনে।

—কি, দেখতে চাও ?

—যেখানে যাচ্ছে সেখান থেকে অবশ্য দেখতেই পাবো।

মনের মধ্যে উঠলাম শিউরে। কি জানি কেন, মনে হ'ল অর্থহীন এই পত্র-প্রণয়ের ভাবাতিশয্য। পত্র-রচনা ও পত্র-প্রেরণার সমস্ত গোপন রস মুহূর্তেই শুখিয়ে গেল মরুভূমির মত।

—দ্যাখো,

বললাম নিস্পৃহ ঔদাসীন্যে। চিঠিখানি দিলাম এগিয়ে। সু ফিরিয়ে দিল তৎক্ষণাৎ। বলল আশ্চর্য সৌহার্দ্যের ভঙ্গিতে :

—মুখেই বলো না ছাই কী লিখেছ ?

— × × ×

—পড়ার ধৈর্য আমার যে কত তা তো জানো বৎস।

—ভণ্ডামী রাখো। পড়তে হয়, পড়ো।

—কিছু মনে করবে না তো ?

সু পড়তে সুরু করল চিঠিখানি। বিষাদে বিরক্তিতে বিক্রুষ্ট হ'ল অসহায় মন। মনে হ'ল এমন লজ্জাহীন অভব্যতা ও অভদ্রতা পৃথিবীতে আর কখন-ও কোথাও বোধ হয় ঘটেনি !

অন্ধকার হয়ে বসে রইলাম কারারুদ্ধ বন্দীর মত। চিঠিখানির ওপর চকিতে চোখ বুলিয়ে নিয়ে উজ্জ্বল মুখে সু আমার দিকে তাকাল। ফিরিয়ে দিতে দিতে বলল :

—মারভালাস্। জাষ্ট্ এ থিংগ অব্ বিউটি—এত ভালো তুমি লিখতে পারো ব্ ? লেখো জানি, কিন্তু এত ভালো ?

হাসলাম। হাসি কেন এল, কে জানে! নাকি প্রশংসা শুনে ?

কিন্তু কিসের প্রশংসা? প্রণয়-পত্রের? সু-র প্রণয়িনীকে প্রেরণ করছি প্রায়-এক-প্রকার প্রণয়-পত্র—আর সু-ই সেটা প্রশংসা করছে উচ্ছ্বাসে ডগমগ হয়ে, এটা বিশ্বাসযোগ্য?

সু আমার রচনাশক্তির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করল। চিত্রশিল্পী হিসাবে আমি তো অপ্রতিদ্বন্দ্বী বটে-ই, লেখক হিসাবেও কারুর চেয়ে কোনো অংশে নাকি কম না! যথানিয়মে লিখতে থাকলে লেখক-সমাজে অচিরে হতে পারি অদ্বিতীয়। এই চিঠি, এবং এই ক্লাসের চিঠিগুলিই—সাহিত্যজগতে অমর প্রতিষ্ঠা পারে পেতে। ফ্যানিকে লেখা কীট্‌সের চিঠিগুলিও নয় এমন মধুর। এর কাছে কোথায় লাগে শেলি ব্রাউনিঙের পত্রোচ্ছ্বাস!—মারভালাস, লিখে যাও, প্রত্যহ লিখে যাও নিয়ম করে, উপদেশ দিল সু, সরল ছন্দে।

সু-এর দিকে চেয়ে, হ্যাঁ নির্বোধ বলতে হয় বলুন আমাকে, কেমন যেন স্বস্তি-ই অনুভব করলাম। ক্রমশঃ মনের জড়তা গেল কেটে। সহজসুরে কথাবার্তা সুরু হ'ল। শো-র কথা উঠল।—যাবে নাকি একবার? শো নাকি দেখবার জন্যে ব্যাকুল হয়ে করছে প্রতীক্ষা! যাবে নাকি? চলো না যাই—সু অনুরোধ করল সরল বালকের স্বাচ্ছন্দ্যে।

সু আমার বন্ধু, ভালবাসি তাকে, আজ তো তাকে, আজ তো তাকে গভীরভাবেই ভালবাসি। কিন্তু সেদিন তাকে যতটা সহজ ও সরল বলে জানতাম, ততটা সে যে ছিল না, দিন না গেলে তা বুঝতে পারি নি। আসলে আমি-ই ছিলাম বুদ্ধিহীন একটা সরল বালক, বোধ করি আর্টিষ্ট জাতটাই তা-ই। মনস্তত্ত্বের গহীন বিধিব্যাপারগুলি আর্টিষ্টের কাছে অবিদিত নয়, মানব-হৃদয়ের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভাববেদনাগুলি প্রকাশ তারা করতে পারে সহজেই, কিন্তু সাংসারিক সাধারণ জটিলতা সম্বন্ধে তাদের অজ্ঞতা ও অজ্ঞানতা অনুভব করলে সত্যসত্যই বিস্মিত হতে হয়। আজ আমি লব্ধপ্রতিষ্ঠ অভিনেতা বলে' গণ্য, হৃদয়বান দার্শনিক ও মনস্তত্ত্ববিদ্‌ বলে' পত্রপত্রিকায় সম্মানিত, কিন্তু আমার গৃহের চোদ্দ বছরের অশিক্ষিত

একটা ভৃত্যের মনোভাবও আমি বুঝতে পারি না, ঠকে যাই কারণে অকারণে। বোধ করি অন্তরকে জানি বলেই বাহ্যব্যাপারে আমরা প্রায়শই অপটু। কোন্‌টা থেকে কোন্‌টা হয় আমরা জানি, অন্ততঃ জানি বলে' মনে করি, কিন্তু সব জানা যে জানা নয়, অনেক জানার মধ্যেই ফাঁকি থেকে যায়, প্রচ্ছন্ন যে-ফাঁকি ধরে-ও পারিনে ধরতে।

সু-কে আমি ধরতে পেরেছি বলে' মনে করতাম, কিন্তু আজ তো জানি—কী ভুল-ই না করেছি কতভাবে। প্রেমিক সু, প্রতারক সু, নগণ্য সু, অসীমবুদ্ধিসম্পন্ন অসাধারণ সু, বন্ধু সু, অপ্রতিদ্বন্দ্বী সু—বাইরে যত বড়ই হই না কেন—অন্তরের জগতে ঘোরজটিল এই বিচিত্র সু-এর কাছে ব্যক্তিত্ববিহীন একটা বালক ছাড়া আর কী-ই বা ছিলাম? কত ভাবে সে আমাকে খেলিয়েছে, কতভাবে কত প্রকার অভিনয় সে করেছে আমার সঙ্গে। অথচ আশ্চর্য কথা এই, তার ছলনা বা অভিনয়কে বুঝেও যেন বুঝতে পারি নি। মায়ার ঘোর লেগেছিল যৌবনে, তাই তাকে ভুল বুঝেও তুলতাম বুকে, বুকে তুলে-ও বুঝতাম ভুল। আর সেই সুযোগে সে আমাকে চালিত করত আপনকার ঈপ্সিত পথে, বাধিত করত বন্ধুত্বের বিচিত্র সৌজন্যে!

কিন্তু সু-র চরিত্র অন্যায়ভাবে আমি ব্যাখ্যা করছি? আজ সে আমার অভিন্নহৃদয় বন্ধু, ভালবাসি তাকে অকৃত্রিম আনন্দে। বোম্বে শহরে আজ দশ বছর প্রায় কেটে গেল, কিন্তু বন্ধু বলতে আজ-ও আমি বাঙ্‌লা-দেশের শো-কে শুধু নয়, সু-কেও বুঝি—আমাতে যার অসীম বিশ্বাস, আমার গৌরবে যার অনন্ত আনন্দ।......অতীতে সে আমার অনেক করেছে, আজ-ও সুযোগ খোঁজে করবার। জীবনের অনেক ক্ষেত্রে ঋণী আমি তার কাছে। মাঝে মাঝে আজ তাই আমার মনে হয়, সু যে আমার সঙ্গে ছলনা করেছে, অভিনয় করেছে, তার জন্যে আমি-ই দায়ী, সে নয়। তার প্রণয়িনীকে আমি ছিনিয়ে নেব রূপ যৌবন ও নামপ্রতিষ্ঠার ঔজ্জ্বল্যে, আর সে নির্বাক ঔদাসীন্যে বন্ধুগৌরবের নিষ্কামতা নিয়ে

অহরহ আমাকে তারিফ করবে, পৃথিবীর ইতিহাসে কে কবে এটা সমর্থন করেছে ?

নানা কারণে শো-র ওপরে নানা দাবী ছিল সু-র। নিতান্ত দরিদ্র মধ্যবিত্ত গৃহ থেকেই চিত্রজগতে এসেছিলেন শো, সু-ই তাকে উন্নতির শীর্ষদেশে তুলেছিল প্রাণপণ প্রয়াসে। শুধু তাই নয়, শো তাকে সত্যসত্যই ভালবাসতেন, আজ তো ভালবাসেন সাবিত্রীর সৌহার্দ্যে। এই শো আমাকে চিঠি লিখেছেন আর আমি প্রেমোদ্বেজিত ভাষায় তার উত্তর লিখে দিচ্ছি তার-ই প্রণয়ীকে ! এবং অত্যদ্ভুত, অবিশ্বাস্য সংবাদ এই : সে তা দেখে বলছে, 'মারভালাস' !

সু আমার চিঠিখানি পাঠ করে' উচ্ছ্বাসে বুঝি ফেটে পড়ল। পিঠে চাপড় মেরে বলল :

—তোমার মধ্যে একজন কবি আছে বৃ।

তারপর কাঁধে মাথা রেখে :

—চলো না আজ-ই সন্ধ্যায়। তোমাকে পেয়ে শো কত খুসী হয় দেখবে।

— × × ×

—আচ্ছা, চিঠিটাই আগে যাক। তারপর দুজনে একদিন যাওয়া যাবে।...ইয়েস্, দ্যাট্ ইজ্ অ্যাড্ভাইসেব্ল্ !

বলতে বলতে সু চিঠিখানি আমার হাত থেকে নিল। ড্রয়ার থেকে নীল একখানি খাম বার করল—চিঠিখানি পুরল তার মধ্যে। তারপর :

—বেয়ারা যাবে, না পোষ্টে পাঠাবে ?...আমি বলি কি, বেয়ারাই যাক, তুমি এখান থেকে ফোন করে' দাও যে বেয়ারা যাচ্ছে চিঠি নিয়ে।

—না।

—তবে কি পোষ্টে পাঠাবে ?

—না। চিঠিখানি পাঠিয়ে দরকার নেই সু !

—মানে ?

— × × ×

—তবে কি বুঝবো শো-কে তুমি ভালবাসো না ?

এ কী প্রশ্ন? প্রশ্নটা একটা প্রচণ্ড 'ঘুষি' হয়ে নাকের সামনে দিয়ে যেন সরে গেল। বলে গেল সু :

—এমন চিঠি যদি তাকে না পড়াও, তবে বুঝবো মিথ্যা তোমার প্রেম।

—কী ছাইভস্ম সব বলছ!

—বলতে চাও কবিত্ব মানেই বাজে কথা? দার্শনিকতার মত হয় হেঁয়ালি, নয় বুজরুকি ?

— × × ×

—বেয়ারা!

ডাক দিল সু, আমার নির্দেশের কোনো তোয়াক্কা না করেই। বেয়ারা এল। সু তাকে কোথায় যেতে হবে দিল বুঝিয়ে। আমাকে হুকুম করল :

—খামের ওপর ঠিকানাটা লিখে দাও, আর্টিষ্ট।

আশ্চর্য, খামের উপর স্পষ্ট করে' লিখে দিলাম ঠিকানাটা।

দিন চার-পাঁচ কাটল। সু এল একদিন বৈকালে। চিঠি পাওয়ার পর থেকে শো প্রত্যহ আমার প্রতীক্ষা করছেন—জানাল সু। আজ নাকি সু তাকে বলে' এসেছে, আমি যাব।

—আজ-ই ?

—হ্যাঁ গো বন্ধু, যেতে বুঝি ইচ্ছে নেই ? এই বুঝি প্রেম ?

—সু-র দেখছি প্রেম ছাড়া আর কোনো কথা নেই।

—যা পাইনে বৎস, তা-ই ই তো কথার কথা !

—আহা বাছা রে,

করলাম কৌতুক। সু এ-কৌতুকে কান-ই দিল না। বলল ঃ

—কই, ওঠো। ড্রেস চেঞ্জ্ করে' এসো।

—যেতেই হবে ?

—ছলনা রাখো সখে। ওঠো।

সত্যি উঠলাম। মনে আছে, কী পরিপাটি করেই না সেদিন সাজগোজ করলাম। দর্পণের মুখে নিজের চেহারাটা দেখে 'নার্সিসাসে'র নেশা জাগল মনে। সু স্মিতনয়নে আমার যৌবনরূপের দিকে তাকাল। কোনো কথা বলল না। কী ভয়-ই সেদিন তাকে পাইয়েছিলাম !

কিন্তু সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত সেদিন-ই কি আমাকে করতে হয়নি ?... ভেবেছিলাম, সু-র সঙ্গে আমাকে আসতে দেখে শ্রীমতী শো উল্লাসে উচ্ছ্বাসে উঠবেন নৃত্য করে'। গানে গানে ভরবেন গৃহ—যৌবনের লাস্যচাপল্যে প্রাণে সঞ্চার করবেন নূতন বেদনা, বেদনায় শিল্পচেতনার অভিনব রসোল্লাস !

কিন্তু হায়রে তরুণপুরুষের আশা। কত স্বপ্নসাধের সাধনায় সে আশার সৌধ গড়ে তোলে, কত সহজেই তা ভেঙে পড়ে আচম্বিতে। আমার

স্বপ্নচারিণীকে, আশা ছিল, দেখব স্বপ্নেরই মত মোহনসৌন্দর্যে, স্বপ্নের আবেশেই তার অনুপম দুটি মোহময় চোখে মেলব চোখ, মুখে হয়তো কিছুই বলব না, কিন্তু পলকের চাউনিতেই প্রকাশ করে' দেব অযুত বছরের অসংখ্য অবলা বাণী, যে-বাণীর সুরের নাম শিল্পসম্মোহ, আর ছন্দের, আনন্দপ্রেম!

স্বপ্নের সঙ্গে বস্তুর তফাৎ আছে জানি। কিন্তু এতটা তফাৎ—কে জানত। এটাই সত্য নাকি? তবে তো আশাভঙ্গে দুঃখের আর থাকবে না সীমা! বুক চাপড়ে কেবলই বলতে হবে, মিথ্যা, সব মিথ্যা। সত্য শুধু যা দেখেছি, যা দেখলাম তা-ই।

কী দেখলাম? দেখলাম মৃত্যুর মত মর্মবিহীনা বৈরাগিনী শো-র মূর্তি। চিত্রের মত অনুপম মুখখানি তাঁর দেখলাম, হাঁ সুন্দর মুখই বটে, স্বপ্নচারিণী সুশোভনার এমন মুখ হওয়া-ই সঙ্গত! কিন্তু চোখ কোথা? হল-ই বা বড়-বড়, কালো-কালো টানা-টানা চোখ—তাতে কার কি? যে-চোখে অভ্যর্থনা নেই, সে-চোখে সৌন্দর্য কোথা, প্রাণময় প্রেরণার সূর্যস্বপ্ন কোথা?

শোর চোখদুটি-ই সব থেকে বড় আকর্ষণ—ভক্তরা বলে। আমি-ও যে বলি নে তা নয়। কিন্তু মাটির প্রতিমার চোখে চোখ-ভোলানো আলো, প্রাণদোলানো গান-জাগানো আলো কই?

সু তো উচ্ছ্বসিত আনন্দে শো-র সম্মুখে আমাকে নিয়ে এল।

—এই বৃ, আমার বন্ধু, তোমার প্রিয়তম শিল্পী!

বলল সৌহার্দ্যের সংগীতভরা উৎসাহে। হাত তুলে আমি শো-কে নমস্কার করলাম। হাসতে গেলাম। কিন্তু শো-র চোখে চোখ পড়ামাত্র মুহূর্তেই যেন মনের সমস্ত উত্তেজনা গেল নির্বাপিত হয়ে। শো, মনে হল, তা বুঝলেন। তবু দয়া করলেন না। অসামাজিকের মত অন্যদিকে মুখ ফেরালেন। সেটা অবশ্য মুহূর্তের জন্য। তারপর ফিরলেন আমাদের দিকে। বোধ করি করুণা হল। বললেন, 'আসুন'!

'আসুন' শব্দের অর্থ কি 'ফিরে যান', কিংবা 'কেন এলেন?' মনে হ'ল নিস্পৃহ মৌনের নিগূঢ় ভৎর্সনাই শুনলাম অত্যদ্ভুত এই স্বাগত-ভাষণে। স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম নির্বাক। পিঠে চাপড় মেরে বলল সুঃ

—চলো হে, ওপরে চলো।

— × × ×

নীরবে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠলাম। শো-কে অনুসরণ করে' আমরা তাঁর লাইব্রেরী-ঘরে এসে প্রবেশ করতে শো বললেন—বসুন!

—এই ঘরে?

বলল সু।

—হ্যাঁ,

এল সংক্ষিপ্ত উত্তর।

কয়েক সেকেণ্ডের নীরবতা তারপর। নির্বোধের মত বসে আছি, করুণ নয়নে কি করুণার দৃষ্টিতে জানি না, শো তাকালেন আমার দিকে। সু বলল:

—কই ব'সো!

—একটু আসছি,

বলে' শো বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে। নিতান্ত অসহায় মনে হ'ল নিজেকে। এমন 'নিস্পৃহ অভ্যর্থনা' একজন শিল্পীর কাছে শিল্পী পাবে—এমনটা কখনও আশা করিনি। সু-ও বোধকরি ক্ষুণ্ণ-ই হ'ল। কী কারণে একবার উঠে গেল ঘর থেকে। দু-একবার 'মথুর, মথুর' বলে' বাড়ীর ভৃত্যকে বুঝি ডাকল। কী কারণে তা সে-ই জানে। ফিরে এল কিছুক্ষণ পরেই। পাশের ইজি-চেয়ারটায় দেহ ঢালল আচম্বিতে। হঠাৎ উঠল। গায়ের পাঞ্জাবীটা খুলে একটা. হুকে রাখল টাঙিয়ে। এটা-ও তার নিজের বাড়ী—এ-ভাবটাই যেন প্রকাশ করল কৌশলে। চেয়ারে গিয়ে বসল তারপর। শুয়ে পড়ল পা ছড়িয়ে। —আঃ, বলে' তুলল সুর।

ভারি খারাপ লাগল। আমার মনোভাব সু যে বুঝল না, এমন নয়। কিন্তু কিছু যেন বোঝে নি—এমন ভাব দেখাল চতুর সারল্যে। সু আমার বন্ধু, নিমন্ত্রণ করে' এনেছে ডেকে। শো-র সঙ্গে আমার সামাজিক আত্মীয়তা নেই বটে—কিন্তু তাঁর চিঠি পড়ে তো ভেবেছি, আমি তাঁর আত্মীয়োপম বন্ধু। তা না হ'লে কে আসত এখানে?...

কী বিশ্রী, কী অবমানকর এই অসহায় অবস্থাটা, না পারি অভিমান করে' উঠে যেতে, না পারি সহজভাবে বসে থাকতে। সু কিন্তু বেশ, শুয়ে শুয়ে পা দোলাচ্ছে অন্যমনে।

—কত বই দেখেছ ঘরে?

একটু পরে বলল সু, নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে':

—এ-সব দেখলে কিন্তু চোখ জ্বালা করে আমার। সাধে কি এ-ঘরে ঢুকতে চাই না!

হাসলাম।...চুপ করে' বসে থাকা যায় না। যা হয় একটা সুরু করা দরকার:

—শ্রীমতী শো বুঝি বাড়ীতে কেবল পড়াশুনো নিয়েই থাকেন?

—লাইব্রেরী দেখেই বুঝতে পারছ।...মেমসাহেব আর মেয়ে-পণ্ডিতের কাছে পড়ে নিয়মিত।...কী হবে যে এত পড়ে!

— × × ×

—কি হে, গম্ভীর হয়েই রইলে যে!

—এ-বাড়ীতে কে কে থাকে!

—দারোয়ান, চাকর, ঝি আর শ্রীমতী স্বয়ং। মাঝে মাঝে কে এক দিদিমা বুঝি আসে। আত্মীয়-স্বজন কে বা কারা যেন সব আছে বলে শুনেছি—তেমন কারুকে আসতে অবিশ্যি দেখি নি।

— × × ×

—বাড়ীটা খুব নিস্তব্ধ। নয়?

—তুমি প্রত্যহ-ই আসো বোধ হয়?

—তা আসতে হয়। না এলে, কৈফিয়ৎ দিতে হয় নানাভাবে।

—তুমিই একরকম অভিভাবক বলো!

—একরকম তা-ই বলতে পারো,

হেসে বলল সু। তারপর একটু ক্ষুণ্ণ স্বরে-ই:

—শো তো বড় দেরী করছে! হ'ল কি!

— × × ×

—প্রায় দশ মিনিট হয়ে গেল।

—ড্রেস চেঞ্জ করছেন বোধ হয়।

—তা বটে। তুমি এসেছ—

কথাটার গূঢ়ার্থ বোধহয় আমার বোধে সহসা পৌঁছুল না। নইলে এ-কথায় হাসব কেন?

—শো-র মত সুন্দরী আর কোথাও দেখেছ, বৃ?

—হঠাৎ এ-প্রশ্ন কেন?

—এই প্রশ্নটাই তো পুরুষের প্রশ্ন।

—ধন্য।

—অবশ্য তোমার মত সুন্দর পুরুষ-ও শো বোধ হয় দেখে নি জীবনে!...আজ যা, বৃ, তোমাকে মানিয়েছে—

এমন সময় এলেন শো। হাতে দুকাপ চা, কিছু টোষ্ট।

—এতক্ষণ ধরে এই করছিলে? আমরা ভাবছি—না জানি কত কি কালিয়া-পোলাও করছিলে আমাদের জন্যে।...তা ড্রেস-ও তো চেঞ্জ করো নি। আজ তোমার কি হ'ল শো?

চায়ের কাপদুটো টেবিলে রাখতে রাখতে আমার দিকে চেয়েই শো বললেন:

—আজ আমার শরীরটা খুব ভালো নেই।

—তবে তো আমরা এসে আপনাকে বড় কষ্ট দিয়েছি, বললাম অপ্রতিভ হয়ে:

—আজ তবে আমরা উঠি।...অবশ্য আপনার দান আমরা অবহেলা করে' যাবো না,

বলে চায়ের কাপটা টেনে নিলাম।

করুণ নয়নে চাইলেন শো। কী তার ভাষা—আমি তা' বুঝলাম না। মনে করলাম এটা লজ্জারই প্রতিচ্ছায়া বুঝি। বললাম :

—লজ্জিত হবেন না। শরীরের ওপর তো হাত নেই। সুস্থ হ'ন—আর একদিন আমরা আসবো।...চলো সু...কই তোমার চা এখন-ও খাওয়া হ'ল না!

—আমিও উঠি তবে?

বলল সু, শো-র দিকে চেয়ে!

—আমার শরীরটা সত্যি আজ ভালো নেই।

—কী হয়েছে? জ্বর নাকি?

বলে' সু অবলীলাক্রমে শো-র কপালে হাত রাখল। তারপর :

—আচ্ছা ব্ব, তুমি যাও। আমি পরে যাচ্ছি।

বুঝি জ্বর-ই হয়েছে শো-র। সেবার জন্যে রয়ে গেল সু।...শো-র সঙ্গাসক্তি এত প্রবল যে সাময়িকভাবে তা' ত্যাগ করে' বন্ধুর কাছে এতটুকু ভদ্র হতে-ও সে পারল না। সে রয়ে গেল। আমি উঠলাম। দু-হাত তুলে শো-কে সামাজিকভাবে নমস্কার জানিয়ে ঘর থেকে এলাম বেরিয়ে। সিঁড়ি দিয়ে নামছি, দেখি শো-ও নামছেন পশ্চাতে। বললাম সৌজন্যের সুরে :

—আপনি আর কষ্ট করে' আসবেন কেন?

— × × ×

—ওপরে যান। আমি পথ চিনে ঠিক বেরিয়ে পড়তে পারবো।

শো থমকে দাঁড়িয়ে গেলেন সিঁড়িতে।

—আচ্ছা, নমস্কার,

বলে' নেমে এলাম সিঁড়ির বাঁকে। শো-র দৃষ্টির বাইরে আসতে মনে হ'ল মুক্তির বাতাস লাগল গায়ে। কিন্তু না, বাইরে এসে মোটরে ষ্টার্ট দিচ্ছি—দেখি তিনি দাঁড়িয়ে আছেন দ্বারদেশে। বোধ হয় একটু

হাসলেন, কিংবা হাসবার চেষ্টা করলেন। তাঁর পাত্‌লা ঠোঁটদুটি কি নড়ে উঠল? কিছু বলল?

মুক্তির বৈরাগ্যে তখন অন্ধ। কিছু দেখি নি। বোধ হয় বধির-ও। কিছু শুনি নি। কিন্তু মুক্তিই কি পেতে গেছলাম?

সত্যি, মুক্তি কি আমি চেয়েছি কোনদিন?...শিল্পীর জীবনে মুক্তিই কাম্য—এটার মত মিথ্যাকথা আর আছে নাকি?...কবিরা মুক্তির কথা বলে, ছবিতে মুক্তির রেখা আঁকি, গানে মুক্তির সুর দোলাই, নৃত্যে মুক্তির রূপ দেখাই—কিন্তু এ-মুক্তি কী মুক্তি, কিসের মুক্তি, কী থেকে কিসে মুক্তি? জীবনকে পূর্ণভাবে ভোগ-করার অত্যুগ্র বাসনা ছাড়া এটা আর কী?...বিরোধ ভালবাসি না, কলহে যায় না মন, ছলনায় কাঁদে প্রাণ, সাংসারিকতায় শুষ্ক হয় হৃদয়, তাই হাঁফিয়ে উঠে বলি, মুক্তি চাই—অর্থাৎ বিরোধ চাই নে, কলহ চাই নে, ছলনা চাই নে, চাই নে সাংসারিকতার তুচ্ছ হিসাবনিকাশের বস্তুবুদ্ধি, দাও মুক্তি, দাও মহত্তর জীবনভোগের আনন্দময় ছন্দায়োজন।

এ-ছাড়া আর কী মুক্তি আছে বলো? যদিই বা আছে, তা কি সত্যই চেয়েছি কোনদিন? মুক্তি ভোগ থেকে, মুক্তি রূপমোহ থেকে, মুক্তি নারী থেকে, মুক্তি যশোলিপ্সা থেকে, মুক্তি কর্ম থেকে, মুক্তি সর্বপ্রকার ধর্ম থেকে-ও—চেয়েছি কোনদিন? চায় কোনো শিল্পী?

সুন্দরী নারীকে কেউ-বা চায় বুঝি পশুর মত,—আমি শিল্পী, সুন্দরীকে কামনা করেছি মানুষের মত: বলেছি, মুক্তি দাও পশুত্ব থেকে, নারীর মহিমায় জীবন যেন জেগে ওঠে মানবত্বের পূর্ণতায়, নবানুরাগের উদ্দীপনায় গহন হৃদয়ের সুপ্ত সম্ভাবনাগুলি শিল্প চেতনায় যেন প্রকাশ পায়। ...আলো, আরো আলো চেয়েছি আমি, সূর্য থেকে, পৃথিবী থেকে, রূপ থেকে, রমনী থেকে, যেতে চেয়েছি আরো আলোয়, এই আরো-আলোর আস্বাদনে আমি শিল্পী। আমার মুক্তি এই আরো আলোয়।

এই আলো বুঝি চেয়েছিলাম শো-র মুখে! মহত্তর এই বাসনার

আনন্দাস্বাদেই আমার আসক্তি, সেই আসক্তিই যখন স্ফূর্তি পেল না, আর কেন থাকব? কেন বলব না: মুক্তি চাই?

কিন্তু শো-র মুখখানি এখনো কেন মনে পড়ছে? এত বড নিদারুণ অপমান সহ্য করেও কেন তার প্রতি বিরূপ হতে চাইছে না মন? মনে হচ্ছে, কেন মনে হচ্ছে: এমন মর্মহীন অভদ্র ব্যবহার শো-র মত শিল্পীর হয়তো ইচ্ছাকৃত নয়। নিশ্চয়ই এর মধ্যে কোনো কারণ আছে, কোনো জটিল কারণ। আর সেই কারণের মূল হচ্ছে সু, আমার বন্ধু!...

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। আনমনে নানাপথে ঘুরতে ঘুরতে লেকের ধারে এসে হঠাৎ গাড়ীটা থামালাম। গাড়ীটায় চাবি দিয়ে একটা নির্জন জায়গায় এসে বসলাম অন্যমনস্ক।

সু-র কথা মনে এল। সু বন্ধু! সু-ও বন্ধু!! সংসারে কতজনকে কতভাবেই না বন্ধু ভেবে আমরা প্রতারিত হই, অপমানিত হই।...কী বিচিত্র, সু-কে এখন-ও আমি বন্ধু ভাবি,—নিমন্ত্রণ করে' ডেকে নিয়ে গেল, হীনভাবে করল অপমান, তাড়িয়ে দিল অত্যদ্ভুত কৌশলে, তবু লজ্জা নেই, সরম নেই, মুখে একটা লৌকিক সমবেদনার কথা নেই। এমন অভব্য ব্যবহার, এমন নির্লজ্জ পশুত্বের উলঙ্গ অপপ্রকাশ জীবনে সংঘটিত হতে কেউ কি দেখেছে কখন-ও?...তবু এমনি সাধু তুমি, অর্থাৎ ভীরু ও কাপুরুষ তুমি, যে, এখনি সু যদি এসে' হেসে কথা কয়, ভদ্রভাবে তুমিও হাসবে, হাতে রাখবে হাত, ভব্য ব্যবহার করবে ভেতর থেকে না হ'ক, বাইরে থেকে অন্ততঃ!

না, তাই-ই যেন হয়! সু-র সঙ্গে সু হতে আমি চাই নে। সু, সু। বু, বু। বু-র স্বভাব সু-কে অনুসরণ করে' জাতি হারাবে—এটা সইতে পারব না। তার চেয়ে এটাই আমাকে ভাবতে দাও, সু এমন হীনভাবে যে আমাকে অপমান করল, আমার জীবনে এটার বোধ হয় প্রয়োজন ছিল। জীবনে যা

ঘটে, মূল্য তার কিছু-না-কিছু আছে-ই। শো-র জন্যে এতটা পাগল হয়েছিলাম, শিল্পীর সংযম মর্যাদা হারাচ্ছিল বালকের চাপল্যে, তারি সুযোগ নিল বুদ্ধিমান সু।

কিন্তু সুন্দর সম্বন্ধে তুমি কি বালকের মতই নও চপল, নও কৌতূহলী? মনে যাই ভাবো, মুখে যাই বলো, সুন্দরী নারী সম্বন্ধে তুমি কি দুর্বল নও সাধারণের মত-ই?...এইভাবে অপমানিত হওযার পরও কেন মনে হচ্ছে—শো নিরাপরাধা, শো বন্দিনী, শো-র কোনো হাত নেই এই ষড়যন্ত্রে?

মাথাটা নিচু করে' আচ্ছন্নের মত বসে শুনলাম অবচেতনের প্রশ্নগুলি। রাত এগোল। আকাশে চাঁদ উঠল! লেকের চারপাশ স্বপ্নের মত মোহন হল আচম্বিতে।...এত সুন্দব পৃথিবী, এত সুন্দর আকাশ, আর আমি এমনি, এমনি কুৎসিত, এমনি অবগুণ্ঠিত?

এমন আকাশ দেখে-ও পাপ ঝরে যায় না, তাপ গরে যায় না? অর্থহীন এই আত্মাবমাননাই যদি সত্য, তবে এত বড় আকাশ কেন? এমন চাঁদ কেন? মায়ের মত স্নেহমধুর এমন বাতাস কেন?

—কে গো তুমি? বু না?

চমকে উঠলাম পরিচিত কণ্ঠস্বরে। এ কী? সা! সসম্ভ্রমে দাঁড়িয়ে উঠলাম। জোড় হাত করলাম শ্রদ্ধাবেগে। বললাম:

—আপনি! কী সৌভাগ্য!...বেড়াতে এসেছেন?

—হ্যাঁ বাবা। তা' এখানে একলাটি' বসে করছ কী!...অনেকক্ষণ থেকে দেখছিলাম তোমাকে। কী হয়েছে বু?

—কিছু হয় নি তো!

—চাঁদপানা মুখখানি গাম্ভীর্যে কালো হয়ে রয়েছে! আবার বলা কিছু হয় নি?

— × × ×

—যা ভেবেছি তা-ই?

—কী?

—ভালবেসে ঠকেছ?

— × × ×

—কতদিন তোমাকে বলেছি বাবা, বাজে মেয়ের ভিড় এই সিনেমার রাজ্যে। এখানে এসো না। হ'ল তো! ভুগ্‌ছ তো!

—যা ভাবছেন তা নয় মা!

—মা বলছ, তবু মিথ্যা বলছ!

—মিথ্যা বলছি না বলেই মা নাম নিতে ভরসা করছি!

—আশ্বস্ত হলাম শুনে। তা' কতক্ষণ বসবে? দশটা বোধ হয় বাজল। আশ্চর্য, এতক্ষণ এখানে বসে আছ, অথচ ছেলেমেয়েরা এখন-ও যে তোমার সন্ধান পায় নি! কিন্তু পেলে কি আর বাঁচবে? ভালবাসার চাপে মারা পড়বে না!

হাসলাম। বললেন সী:

—শিল্পীকে সর্বদাই আত্মগোপন করে থাকতে হয় বু। জনগণের কাজে ছাড়া বাইরে এমন করে' তাদের আসতে নেই, থাকতে নেই। তাতে ব্যক্তিত্বের মহিমা ক্ষুণ্ণ হয়।

— × × ×

—লোকে যখন আমাকে শিল্পী বলে' মানত, জনগণ থেকে সর্বদাই আমি দূরে থাকতাম। রঙ মেখে বেহায়াপনা করতে কখন-ও আসতাম না বাইরে।...দূরে থাকলেই তো সুর বাজে, বাজানো সম্ভব হয়।

একটু থেমে, আত্মগতভাবে:

—শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবন ছেড়ে দূরে রইলেন বলেই সুর তাঁর তো ব্যর্থ হ'ল না! বৃন্দাবন বেজে রইল শয়নে, স্বপনে, ভাবে, ভাবনায়!

— × × ×

—আচ্ছা, এখন চলি বাবা। আর তো যাও না আমার কাছে—

—একদিন যাবো!

—যেয়ো।

বলে' সী একটু দূরে এগিয়ে গিয়ে তাঁর গাড়ীতে উঠলেন। আমিও আর বসলাম না। ক্ষিদে পেয়েছে। বাড়ী ফেরা যাক।

মনটা বেশ হাল্কা মনে হ'ল। সী এসে আমার সমস্ত মনের ভার চকিতে বহন করে নিয়েই বুঝি চলে গেলেন! আকাশের শুভ্র দিব্যতার মত আনন্দময় কৃতজ্ঞতার আস্বাদে সুরময় হল মন! গুণ গুণ করে' গান গাইতে গাইতে আমার গাড়ীর কাছে এলাম এগিয়ে।

কিন্তু ও কে? ওরা কারা? কারা গাড়ী থেকে নামল খানিক তফাতে? চিনতে পারা মাত্র কেমন-যেন দ্রুততার বিদ্যুৎ খেলে গেল অন্তরে। মোটরের চাবি খুলে দ্রুত ষ্টার্ট দেয়ার জন্যে প্রস্তুত হয়ে বসলাম।

শো-র তাহ'লে অসুখবিসুখ কিছু করে নি! সু-র সঙ্গে ওই তো এসেছে বেড়াতে। সু-র হাতের মধ্যে হাত রেখে ওই তো চলে গেল ওদিকে। আশ্চর্য! ঘরে দেখে এলাম ম্লান মূর্তি, কিন্তু বাইরে একী নববেশে নূতন মূর্তি তার! রূপ যেন চাঁদের স্বপ্নালোকে বিলাসবতী এই শোভনা প্রকৃতির সঙ্গে পাল্লা দিতে হয়েছে প্রকাশিত!

'চলো মন ঘরে ফিরে যাই'—অবশ্য বললাম না, কাজেও করলাম না। অর্থাৎ ঘরে ফিরতে চাইল না মন। গাড়ী চালাতেই উধাও হ'ল অতর্কিতে। কোথায় যাব ঠিক নেই, তবু গাড়ী চালালাম এদিকে সেদিকে, এ-পথে সে-পথে। বুঝি ক্যানিং-এর পথে যেতে চাইল মন; বোধ হয় ডায়মণ্ডহারবারের নদী দেখতে জাগল ব্যগ্রতা; কিংবা হয়তো বজ্‌বজের পল্লীঅঞ্চলে আছে কাজ? কিংবা বোধ হয় দক্ষিণেশ্বরে একবার ভবতারিণীকে দর্শন করার জাগল বাসনা?

নাঃ, ভিক্‌টোরিয়ার স্মৃতিমন্দিরটা বার ছয়সাত পাক দিয়ে ঘরের ছেলে ঘরেই এলাম ফিরে। রাত বুঝি এগারটা হবে।—'এত রাত করে দাদাবাবু'? বললে ইন্দ্রাসন, বাড়ীর বয়োজ্যেষ্ঠ পুরাতন ভৃত্য, একপ্রকার তিরস্কারের ভঙ্গীতে।

—বেশ করেছি, বললাম বালকের মত। ইন্দ্রাসন আসতে লাগল সঙ্গে সঙ্গে। তার কাছে শুনলাম, একটু আগে এই মিনিট দুই-তিন আগে, সু এসেছিল দেখা করতে। সঙ্গে ছিল একজন 'আওরাত'।

—সেম্‌লেস্‌ ক্রীচার, বললাম আত্মগত।

শ্রীমতী শো-র যেখানে যত রঙিন ছবি প্রকাশিত হতে দেখেছি, গত কয়েকমাস ধরে পরম যত্নভরে তা সব সংগ্রহ করেছিলাম। ইচ্ছা ছিল সমস্তগুলি একত্র করে মূল্যবান একখানি ‘এলবাম’ করব রচনা। মলাটের ওপর সোনার জলে লিখে রাখব ঃ ‘স্বপ্নচারিণী’!

কিন্তু গতকাল রাত্রিটা কী নিদারুণ দুঃস্বপ্নেই না কাটল। এতদিন যাকে স্বপ্নচারিণী ভেবে মধুর এক প্রকার চেতনার আনন্দ আস্বাদ করেছি, যৌবনের সহজ সরল প্রত্যাশাকে সে যে এমনি দুঃসহ আত্মযন্ত্রণার ক্ষমাহীন দুর্গতিতে অবসন্ন করার জন্যই ছিল নির্দিষ্ট, কে জানত।

সকালবেলা ঘুম থেকে উঠেই তার ছবিগুলি আলমারী থেকে বার করলাম। স্নানাদি সেরে এসে প্রাতরাশের আগেই সেগুলি নিযে ছাদে গেলাম। টুকরো টুকরো করে ছিঁড়লাম সবগুলি। স্বপ্নসঞ্চয়গুলি হ'ল আবর্জনার স্তূপ। স্তূপে দেশলাই দিলাম জ্বালিয়ে। বাতাসে উড়ে কোলের কাছে এসে পড়ল একটা টুক্‌রো। শো-র মুখ আর চোখ তাতে। আগুনে তা ফেলতে গিয়ে, কী মনে হ'ল, ফুঁ দিযে বাতাসে দিলাম উড়িয়ে। উড়তে উড়তে সেটা শূন্যেও নয়, মাটিতে-ও নয়, ছাদের কার্নিসের একেবারে ধারে গিয়ে আল্‌তোভাবে বুঝি আটকে রইল। উঁকি মেরে কৌতূহলী বালকের মত দেখতে ইচ্ছা হ'ল—কী ভাবে আছে, কেমন আছে!

এদিকে দাউ-দাউ করে জ্বলল আগুন। আগুন ছড়িয়ে পড়ল ছাদের চারিপাশে। আগুন নিয়ে খেলা চলল অধীর বাতাসের। যতক্ষণ না তা নিভল—বাতাসের নৃত্য করলাম প্রত্যক্ষ।

তারপর ছাদ থেকে এলাম নেমে।

—ফিনিষ্ট্।

বললাম স্বস্তির নিঃশ্বাস ত্যাগ করে'। ঘরে এসে ‘টাইম টেব্‌ল্’টা বার করলাম অকারণে। লখ্‌নৌ যাবার ট্রেনটা হাওড়া থেকে কখন ছাড়ে?...

যোগীন্দ্র, রাঁধুন-মার এসিস্টেন্ট খাবার ও চা দিয়ে গেল। একহাতে কাপটা তুলে নিয়ে পাতা উল্টালাম টাইম টেব্লটার।

—যাবো,

বললাম চেঁচিয়েই।

—শো-র কাছে?

বলে' নাটকীয়ভাবে ঘরে প্রবেশ করল সু। পা থেকে মাথা পর্যন্ত জ্বলে উঠল বিক্ষুব্ধ ঘৃণার অগ্ন্যুদ্দীপনায়। কিন্তু তা' মুহূর্তের জন্যই বটে। সংযত ধীরতায় সহজ হলাম সু-কে বিস্মিত করেই। হেসে বললাম:

—কে সু? এসো।

সু বোধহয় এটা প্রত্যাশা করে নি। এমন সহৃদয় অভ্যর্থনা ও হাসি দেখে থমকে চমকে গেল প্রথমটা। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই কিন্তু সহজের ছদ্মবেশে সজ্জিত করে' নিল নিজেকে:

—বাঃ, ব্রেক্‌ফাষ্ট রেডি! যথাসময়ে এসেছি বলো?

হাসলাম।...সু এসেছে দেখে যোগীন্দ্র তারো জন্যে চা ও খাবার এল নিয়ে। চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে বলল সু:

—কাল রাত্রে এসেছিলাম, শুনেছ?

—শুনেছি।

—শো-ও এসেছিল।

— × × ×

কিছুক্ষণ নীরবতায় কাটল। তারপর সু:

—কেন এসেছিল জিজ্ঞাসা করছ না যে!

—করার তো কোনো প্রয়োজন বোধ করছি না।

—যা ভেবেছি তা-ই!

সু-র মুখের দিকে চোখ ফেরালাম। বলল সু, একটু হেসে:

—খুবই ক্ষুব্ধ হয়েছ তাহলে!

× × ×

—শো এজন্য খুবই লজ্জিত হয়েছে।

—ধন্যবাদ তাকে, কিন্তু তোমার বুঝি লজ্জার কোনো বালাই নেই ? বললাম ক্রোধমিশ্রিত কৌতুকের ছন্দে।

—আমার কথা ছেড়ে দাও বন্ধু। আমি অমানুষ।

— × × ×

—এই নাও চিঠি।

—চিঠি ? কার চিঠি ?

—তোমার। শো লিখেছে।

—ও-চিঠি তোমার কাছেই রেখে দাও।

—যা ভেবেছি তা-ই।

—দেখ সু, বুদ্ধিতে আমি তোমার কাছে ছেলেমানুষই বটে, কিন্তু ক্ষমা করো, আমাকে নিয়ে আর খেলা করার চেষ্টা করো না।

—কি বলছ বু ?

—যা বলছি, কেউ না বুঝুক তুমি অবশ্যই বুঝেছ। আর অভিনয় ক'রো না, ক'রো না আত্মপ্রতারণা। হয় সহজ হও, সু, নয় আমাকে মুক্তি দাও।

—× × ×

—বন্ধু, আমি জানি কোথায় তোমার ভয়। তোমার মোমের পুতুলটিকে পাছে গলিয়ে দিই আমার রূপের আগুনে, এই তোমার শয়নে স্বপনে চিন্তা। তবু তার কথা বহন করে' কেন আসো আমার কাছে, কেন তার কাছে নিয়ে যাওয়ার জন্যে করো জেদ ?

—× × ×

—ভালবাসো অথচ বিশ্বাস করো না। বিশ্বাস করো না, অথচ প্রশ্রয় দাও, প্রশ্রয় দাও, কিন্তু তা' নিলে, পারো না সহ্য করতে! এ কী অদ্ভুত তোমার আচরণ। কী সুখ তুমি পাও এতে ?

—সুখ ?

আত্মগতভাবে বলল সু! জানালার দিকে রইল চেয়ে। কাটল কিছুক্ষণ। হঠাৎ নাটকীয়ভাবে আমার হাতদুটো চেপে ধরল সে। বলল আবেগভরে :

—আমাকে ক্ষমা করো, বৃ!

—আচ্ছা ক্ষমা করলাম!

চমকে উঠল সু। সরল বালকের মত চাইল। তারপর ঃ

—অর্থাৎ করতে পারবে না?

বলল অসহায়ের ভঙ্গীতে।

—আমাকে মুক্তি দাও সু!

—আমাকে চলে-ও যেতে বলছ?

— × × ×

—দ্যাট্‌স্‌ অল রাইট্‌। যাচ্ছি। বিদায়! আর আসবো না।... তা চিঠি সম্বন্ধে শো-কে কী বলবো?—উঠে দাঁড়াল সু।

—কী ভয়ানক মানুষ তুমি সু?

—সত্যি ভাই, আমি ভয়ানক মানুষ। শো বলে, তুমিও বললে।

— × × ×

—শো-কে ভালবেসে যন্ত্রণা পাই, তোমাকে ভালবেসে ঘৃণা পাচ্ছি। আমি কোথায় যাবো?

এ আবার কী নূতন অভিনয় সুরু করল সু। উঠে দাঁড়িয়েছিল, বসল আবার। চেয়ারটা টেনে এগিয়ে এল আমার কাছে। বলল ঃ

—তোমাকে ভালবাসি বৃ! কত ভালবাসি তা তুমি ধারণাও করতে পারো না। বোধ হয় এক শো ছাড়া তোমার জন্যে ত্যাগ করতে পারি সব। আমাকে বাঁচাও তুমি!

গম্ভীর মুখে বসে রইলাম নির্বাক। বলে' চলল সু ঃ

—এ-কথা সত্য, তোমার রূপে আমার ভয়, শো-র প্রেমে আমার সংশয়। শো আমাকে ভালবাসে জানি, হ্যাঁ, সত্য সত্যই ভালবাসে, কিন্তু বন্ধু, এ ধারণা কি আমার মিথ্যে, যে তোমার সান্নিধ্যে যে-মেয়ে একবার আসবে, সে তোমাকে ছাড়া আর কাউকে পেয়ে তৃপ্ত হবে না!

—শো-র ওপর তোমার তো দেখছি অদ্ভুত শ্রদ্ধা, অটল বিশ্বাস!

—তামাসা করছ! দিনরাত শো-কে নিয়ে আমি যে কী জ্বালায় জ্বলছি—তা যদি জানতে, তামাসা করতে না। তোমাকে না দেখেই, তোমার ছবি দেখে আর চিঠি পড়েই, শো এমন হয়ে আছে যে, পাগলের মত তোমার কথাই সে বলে, তোমার ধ্যান-ই করে, তোমার ছবিখানিই সাজায় ফুল দিয়ে, তোমার কথা-ই শুনতে চায় আগ্রহে।

—এমনি যদি তার শ্রদ্ধা ও আগ্রহ, আর এই কারণেই যদি তোমার ভয় ও সংশয়, তবে কেন আমাকে 'সম্বর্ধিত' করার জন্যে জোর করে' কাল নিয়ে গেলে ?

সু আমার শ্লেষের সুরে কান দিল, কিন্তু লজ্জিত হ'ল না।

—যত পারো আমাকে লজ্জা দিয়ো ব্ব, কিন্তু তোমার কাছে আর আমি ছলনা করবো না। আমি পরাজিত।...শো থেকে তোমাকে তফাতে রাখার চেষ্টা নানাভাবে করেছি। শো কেবলি তোমার স্তুতি গায়, তোমাকে কাছে পাওয়ার জন্যে ব্যাগ্রতা প্রকাশ করে, ঈর্ষায়, বেদনায়—মার্জনা করো ব্ব, আমি সহ্য করতে তা পারি নি। নিজে আমি কতই না উচ্ছ্বাস প্রকাশ করি তোমার কৃতিত্বে, প্রশংসা করি অকৃত্রিম সৌহার্দ্যের আনন্দে, ঈশ্বর জানেন, কত আমার অহংকার তোমার বন্ধুত্বের গৌরবে, কিন্তু শো তোমার নামে গলে যাক, তোমার সমর্থনে তর্ক করুক আমার সঙ্গে, প্রশংসা করুক ভক্তি-গদগদ কবিতার ভাষায়, সত্যসত্যই আমি সহ্য করতে পারি না। শো-র সঙ্গে আমার বিরোধ বুঝি এইজন্যই!

কী যেন বলার জন্যে সু-র মুখের দিকে তাকালাম। সু কিছু বলতে দিল না। বলে চলল:

—গতকাল এই বিরোধ চরমে উঠলো। কত কথা কাটাকাটি হলো। ক্রুদ্ধ হয়ে বললাম: এত তোমার করেছি কি এইজন্যে?

—অস্বীকার করি না সু, অনেক তুমি করেছ, করে' থাকো আমার জন্যে, কিন্তু তার প্রতিদানে কী তোমাকে দিতে বাকি রেখেছি বলতে পারো ?

—আমাকে বালক ভেবো না শো!

বললাম বিক্রুষ্ট আর্ততায় :

—দিনরাত তুমি আমারই কানের কাছে আমার প্রতিদ্বন্দ্বীর জয় গাইবে, আর তা শুনে আমি ভাববো, তুমি আমার!

—নয়?...তবে নয়!

বলে' শো বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। কাপুরুষ আমি ক্রোধভরে তাকে অনুসরণ করলাম। বারান্দা দিয়ে যেতে যেতে শো বলল :

—আমাকে এখন একলা থাকতে দাও সু!

—একলা কেন? ডেকে দিই তাকে!

ভিন্ন একটা ঘরে এসে শো চুপ করে' বসে রইলো কিছুক্ষণ। তারপর হঠাৎ উঠলো। আমার বুকের কাছে এলো এগিয়ে। দুখানি হাত আমার কাঁধের ওপর স্থাপন করে' রাজেন্দ্রানীর মত দাঁড়ালো, বিষণ্ণ। বললো অভিমানাহত বন্ধুর বিনীত ভঙ্গিতে :

—কেন একজন নিষ্পাপ মানুষের ওপর অর্থহীনভাবে এমন ঈর্ষা পোষণ করে' কষ্ট পাচ্ছ। আমাকে সন্দেহ করে' বন্ধুকে প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবছ কেন?...তিনি একজন যশস্বী শিল্পী, সকলেই তো তাঁর প্রতিভাকে পূজা করে।

—বুঝেছি।

—কী বুঝেছ?

—ও-সব কথা সেই 'প্রতিভা'কে শুনিয়ো। প্রেম হবে।

—কী সব বলছ!..তুমি এখন সুস্থ মনে নেই সু, এখন বাড়ী যাও।

—আগে তোমার 'প্রতিভাটিকে' 'ইনট্রোডিউস্' করে দিই—তবে তো যাওয়াবে!...এখনি গেলে কে 'তাঁকে' এনে দেবে তোমার কুঞ্জে!

—এমনি নীচ তুমি?...ছি!

—এখনি নীচ বলে' দূরে সরিয়ো না দেবী। আগে আসুন সেই 'রূপসুন্দর'। লীলা হ'ক সুরু। তবে তো—

—তুমি যাও! এখনি যাও!

—যাবো দেবী, যাবো। এনে দেবো। বুকে রেখো যত্ন করে'৭

—তাই রাখবো,

বললো শো জেদের সুরে, জ্বলে' ওঠে। মুহূর্তে রক্ত উঠে গেলো মস্তিষ্কে। হাত উঠলো। পড়লো শো-র গায়ে।

—মারলে ?

—× × ×

—ছি !...

—× × ×

সু থামল। শো-র গায়ে সে হাত তুলেছে, পশুর মত অত্যাচার-ই করেছে, অথচ এমনি নির্লজ্জ, যে তা' সহজভাবে বলে যেতে এতটুকু সংকোচ বোধ করছে না। ঘৃণায়, ক্ষোভে, লজ্জায় স্তব্ধ হয়ে তার মুখের দিকে চেয়ে রইলাম। মুখে কোনো কথা এল না।

—তোমাকে নিয়ে গেলাম তারপর,

বলে' চললেন বন্ধুপ্রবর :

—কী ভাবে সে তোমাকে 'রিসিভ্' করলো তা তো তুমি জানই। আমি তোমার বন্ধু নই ব্র, নইলে শো-র সেই নিষ্প্রাণ ব্যবহারে মনে মনে আমি তুষ্ট-ই হলাম কেন! আমাকে শাস্তি দিতে হয় দাও, কিন্তু সত্যকথা বলছি বলে' আজ না হয় ভবিষ্যতে আমাকে তুমি ক্ষমা ক'রো ব্র।

—× × ×

—আমি জানি তোমার আত্মসম্মানবোধ কত প্রখর। শো-র কাছে এইভাবে অভ্যর্থনা পেয়ে তুমি যে তার নাম পর্যন্ত আর মুখে আনবে না—এটা ধারণা করে' স্বস্তিই করলাম অনুভব। উপরন্তু শো যে আমার তিরস্কারের মর্যাদা রেখেছে, আমি ছাড়া আর কাউকে—এমন কি তোমাকেও, সহজে উপেক্ষা সে যে করতে পারে, এটা লক্ষ্য করে' বিস্মিত শুধু নয়, নিশ্চিন্ত-ই হলাম গোপনে।...বলছ কি, আমি বুদ্ধিমান ? আমার মত নির্বোধ কি পৃথিবীতে আছে কেউ ?

—তুমি তো চলে এলে অপমানিত হয়ে। শো তোমাকে 'শুষ্ক ভদ্রতা' দেখিয়ে দ্বার পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে গেল। ফিরে এসেই, হঠাৎ একী, আমাকে জড়িয়ে ধরল পরম আদরে, বুকের ওপর মুখ রাখল আবেগে,

—যাক, বাঁচলাম শুষ্ক ভদ্রতা থেকে,

বলল সংগীতের সুরে। তারপর মিষ্ট ভৎর্সনার ভঙ্গীতেঃ

—তুমি কী বলো তো, হঠাৎ সত্যি সত্যিই ভদ্রলোককে নিয়ে এলে? এমনি খোকার মতন তোমার ব্যবহার!

—× × ×

—ভদ্রলোক কি রকম সেজে' এসেছিলেন দেখেছ?

খিল খিল করে' বালিকার মত হেসে উঠল শোঃ

—যেন বিয়ে করতে এসেছে নবকার্তিক!

—গল্পটা বানিয়েছ ভালো।

—গল্প? বানিয়ে বলছি?...শো তোমার সম্বন্ধে এমন কথা বুঝি উচ্চারণই করতে পারে না? বন্ধু, বাধা ও ব্যবধান সরানোর জন্যে নারী পারে না এমন কিছু নেই পৃথিবীতে। যাকে প্রয়োজন—তাকে পাওয়ার জন্যে নারী হত্যা পর্যন্ত করতে পারে, এমন ভদ্রগোছের ছলনা তো তুচ্ছ কথা।

—নারীজাতির ওপর কী গভীর শ্রদ্ধা!

—তুমি একেবারে ছেলেমানুষ বৃ, আমার চেয়ে বয়সে সত্যিই তুমি অনেক ছোট। তোমার মধ্যে এখনও রোমান্স আছে, আমার নেই। যার নেই—সে-ই কেবল চিনতে পারে ছলনাময়ী নারীদের, অন্যে নয়।...আর একটু চা আনতে বলো বৃ!

বলতে বলতে নিজেই সে উঠে গেল ঘরের বাইরে। চা-এর কথা বলে' এল যথাস্থানে।

—তাড়াতাড়ি পাঠাবে,

বলল চেঁচিয়ে। ফিরে এসে চেয়ারে বসল গম্ভীরমুখে।

—মনে হচ্ছে ব্ব,

সুরু করল গল্প ঃ

—জুয়া খেলায় যেন সর্বস্ব হারিয়ে বসেছি।...শো-র সেই অপ্রত্যাশিত লাস্যরূপের ছলনা দেখে বিস্ময়ে নয় ভাই, আতঙ্কে আমি হতবাক হয়ে রইলাম। বেশ বুঝলাম, তোমাকে তার চাই-ই চাই। এই চাওয়ার পথে আমি হচ্ছি একমাত্র অন্তরায়, আমাকে সে নিশ্চিন্ত করতে চায় প্রেমে নয়, প্রেমের ছলনায়।

—কী সব বলছ তুমি।

—ঠিক-ই বলছি ভাই ব্ব! এইবার তোমার প্রতিভাময়ী অমর শিল্পীটি, আমারই নির্বুদ্ধিতার অনাচারে মরীয়া হয়ে তার শ্রেষ্ঠ শাণিত অস্ত্র নিয়ে নেমেছে রণাঙ্গনে। আর জয়ের কোনো আশা নেই।...

চুপ করে' শুয়ে পড়ে ছিলাম তখন। নিজেকে সত্যসত্যই বড় অসহায় মনে হলো। মনে পড়লো তোমার স্বর্গীয়তায় সুন্দর সরল মুখ। একটু একটু করে' সম্বিত ফিরলো ঃ বুঝলাম, ডেকে' এনে কী অপমানটাই না আমি করেছি, একলা তোমাকে যেতে দিয়ে কী অন্যায়টাই না আবার করলাম।...

শো-র কিন্তু এসব ভাবনাই যেন নেই!...যার কথা সে অহরহ বলে, ভাবে, যাকে কাছে পাওয়ার জন্যে করে তপস্যা, তাকে হাতের কাছে পেয়েও দিল সরিয়ে, ব্যথা তো পেলোই না, লজ্জাও করলো না অনুভব, এ কি বিশ্বাসযোগ্য? কিন্তু তাই তো দেখলাম। দেখলাম, কিছুই যেন হয় নি তার। ব্যবহারে বরং এমন ভাবই প্রকাশ করলো, যা অনুধাবন করলে ধারণা হবে, নিদারুণ ঝামেলা ও ঝঞ্ঝাট থেকে মুক্তি পেয়ে সে বাঁচলো।...শো-কে খারাপ লাগে না কখনও, বলতে কি শো-র সান্নিধ্যের আমি কাঙাল। কিন্তু কেন যেন তাকে আর সহ্য হ'লো না। উঠে পড়লাম।

—কোথা যাচ্ছ?

বলল শো।

—বৃ-র কাছে!

—এখন কোথায় তাকে পাবে?

—কেন বাড়ীতে?

শো যেন কী বলতে গেল। মুহূর্তে কী যেন ভেবে নিয়ে—গেল থেমে। হঠাৎ কঠিন আদেশের ভঙ্গীতে তারপর:

—তোমার যাওয়া হবে না।

—× × ×

—চলো বেড়াই যাই।

—× × ×

—যাবে?

—আজ ভালো লাগছে না শো।

—বেরুলেই লাগবে।

কিছুক্ষণ কাটলো নীরবে। শো হঠাৎ উঠে গেল ঘর থেকে। অন্যমনস্কতার মৌন ভেদ করে' গান গেয়ে খানিক পরে এলো ফিরে। অন্ধকার মনটা, কি বিচিত্র, আলোয় আলোময় হয়ে উঠলো চকিতে। বেশ বদল করে' উর্বশীরূপে আবির্ভূত হয়েছে শো!!

মুগ্ধ আমি, হতবাক আমি, পড়ে রইলাম নিস্তব্ধ। শো এসে আমার বুকের ওপর হাত রাখলো। বললো:

—চলো।

— × × ×

—ওঠো।

উঠতে হলো। বেরুতে হ'লো শো-র সঙ্গে। ঘুরতে হ'লো পথে, মাঠে, গঙ্গার তীরে, লেকের ধারে! বাজপাখী যেমন পায়রা ধরে, শো তেমনি আমাকে ধরে নিয়ে যেদিকে খুসী চললো উড়ে। মৃত্যুর রোমাঞ্চ জাগালো দেহে, মনে।

জানো, কাল সারা রাত এতটুকু আমার ঘুম হয় নি?

সু আবার থামল। চা এসে গেছল অনেকক্ষণ। ঠাণ্ডা চা-টাই সরবতের মত ঢক-ঢক করে' গিলে নিল পিপাসার্তের মত। তারপর সুরু করল আবার ঃ

—মনে হচ্ছে বৃ, শো যখন তোমার স্তব করত, পূজা করত, তখন সেটা সহজভাবে যদি মেনে নিতাম, তাহ'লে লাভ হতো আমার-ই। সহ্য ও ধৈর্যের মধ্যে যে-বৃত্তিটা চরিত্রে প্রকাশ পেতো, শো সেটাকে মহত্ত্ব বলে' মেনে নিতো, ফলে আমার ওপর তাঁর শ্রদ্ধা বাড়তো। এখন শ্রদ্ধার বদলে পাচ্ছি ঘৃণা, প্রেমের ছদ্মবেশে আসছে ছলনা।

একটু থেমে ঃ

—তুমিই ভাগ্যবান বৃ, না-চেয়েও তুমি পাও, আর কাঙালের মতো চেয়ে চেয়েও আমি পাই নে।...ভাবছ, তার ওপর আমার দাবী ষোলো আনা—তবু কেন পাই-না পাই-না করে' হাহাকার করি? বন্ধু, বাইরে থেকে পাঁচজনে যেটাকে পাওয়া মনে করে, সেটা যে কত তুচ্ছ—যারা পাওয়ার মতো পায় তারাই তা' কেবল জানে।

যতদূর সম্ভব গম্ভীর মুখ' করে' সু-র মুখের দিকে আমি চেয়ে রইলাম। ইচ্ছা করলে এখনি তাকে থামিয়ে দিয়ে উঠে যেতে পারি অন্যত্র। কিন্তু আজ তার মুখ দেখে আর কথার ভঙ্গী অনুসরণ করে' কেমন--যেন করুণাই হ'ল। মনে হ'ল আজ তার মানুষটাই কথা বলছে, চতুর অভিনেতাটা নয়। কিংবা অভিনেতাটাই বলছে, কিন্তু এমন নিপুণভাবে বলছে, যে, ধরার উপায় নেই, সেটা সত্য, না চাতুর্য!

—গত রাত্রে, বোধ হয় এগারোটা হবে, তোমার কাছে একবার আসার জন্যে—মার্জনা চাওয়ার জন্যে মনটা হঠাৎ অশান্ত হয়ে উঠলো। শো-কে তার বাড়ীতে পৌঁছে দেওয়ার পথে—এ-ইচ্ছাটা প্রকাশ করলাম। শো বললো, সে-ও আসতে চায় সঙ্গে।

—তুমি যাবে? এই রাত্রে?

—তাতে কি?

—তার দাদু শুনেছি খুব পিউরিট্যান্।

—তাতে কি ?

কী বলতে চাচ্ছি, শো সব-ই বুঝলো। কিন্তু না-বোঝার ভাণ করলো মাত্র। এলো সঙ্গে। তুমি তখনও বাড়ী ফেরো নি। কোনদিন, কখন-ও তা, এত রাত্রি করো না, তাই না-ফেরার কারণটা অনুমান করে' কী কষ্ট যে অনুভব করলাম। কিন্তু কী আশ্চর্য, শো এতে পুলকিত-ই হলো যেন। বাড়ী ফিরে এসে, সেই রাত্রেই, তোমার নামে একখানি চিঠি লিখলো। আমাকে পড়ে শোনালো। বললো সরলা বালিকার মত ঃ

—পাঠাই ?...তুমিই এটা নিয়ে যাও, কাল সকালে পেঁছে দিয়ো তাঁর কাছে।...বলো দেবে ?

মাকড়শার জালে পড়া মাছির মতো আর্তনাদ করলাম অন্তরে। মুখে চোখে বুঝি ব্যর্থতার বেদনা উঠলো ফুটে। শো তা দেখলো। এগিয়ে এলো কাছে। বুকে এসে রাখলো মুখ। দুহাতে জড়িয়ে ধরলো দেহ। বললো আশ্চর্য স্বপ্নের সোহাগসুরে ঃ

—কেন সন্দেহ করো সু ?...কেন বোঝো না আমি তোমারই ?

— × × ×

—তোমার কাছে অদেয় নেই আমার কিছুই, তবু কেন তোমার সংশয় যায় না ?...বলো, আর যা তা ভাববে না ? বলো, ব্-কে সহজ-ভাবে নেবে কাছে !

—তোমার চিঠি কি ব্ নেবে ?

—নেবেন না ?...আচ্ছা তুমি দিয়ো তো...

•

চিঠিখানি পকেটে পুরে বিদায় নিলাম শো-র কাছ থেকে। বাড়ী এসে ক্ষমা করো ভাই, বার বার সেখানি পড়লাম।...কবিত্বময় ভাষার সব ইঙ্গিত আমি যে বুঝি, তা বলি না, কিন্তু চিঠি পড়ে স্পষ্ট ধারণা হ'লো শো-কে তিরস্কার করে, শাস্তি দিয়ে বা সন্দেহ করে' আর ফল

নেই। এখন তুমিই বু, আমার ভরসা। তুমি যদি বাঁচাও, তবেই বাঁচি।

—কী করতে বলো?

—চিঠিখানি নাও।

—নিলেই চুক্‌বে সমস্যা?

—তা অবশ্য বলি না। তবে চিঠি যদি নাও, শো বুঝবে তুমি তাকে মার্জনা করেছ। মার্জনা করে' তার বন্ধু হও, আমি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচি। কিন্তু দোহাই তোমার, অভিমান করে' নিজেরি অজ্ঞাতসারে গোপন কোনো আশা তাকে দিয়ে ব'সো না।...বন্ধু, করুণা করো স্বর্গের উচ্চতা থেকে, নির্মূল হ'ক তার বাসনা। উপেক্ষা যদি করো মর্ত্যের ধূলির ওপর দাঁড়িয়ে—দ্বন্দ্বে, আতঙ্কে আমাকে যাপন করতে হবে বিনিদ্র রজনী।

—শো কে ছেড়ে এইবার আমাকে নিয়ে পড়লে! এইটুকুর জন্যে এতবড় ভূমিকা!

—ভুল বুঝো না বন্ধু!

—না বুঝি নি,

বলে' কলম নিয়ে বসলাম:

—বলো, কী লিখতে হবে তোমার শো-কে?

—চিঠিটা পড়ে যা' বোঝো, লিখে দাও।

—না পড়ে-ও তো লেখা যায়!

বলতে বলতে সু-র হাত থেকে চিঠিখানি নিলাম। হঠাৎ কী যে মনে হ'ল, ছিঁড়ে ফেললাম টুক্‌রো-টুক্‌রো করে'। বললাম কঠিন মুখ করে:

—তোমাদের দুজনের মধ্যে যা' হয়, হ'ক, আমাকে টানার আর চেষ্টা ক'রো না। আর যদি করো, কারুর পক্ষেই সেটা ভালো হবে না, সু।

—বন্ধু, তুমি জানো না, তুমিও ছলনা করলে।...ভয় রয়ে গেল!...

—ভয় থাকবে না সু,

নির্বোধের মত বললাম:

—কলকাতা ছেড়ে খুব শীঘ্রই যাবো চলে'।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল সু। অসহায়তার কালো নামল তার চোখে। বলল ক্ষুণ্ণ স্বরে ঃ

—আমাকে তাহ'লে বাঁচতে দিলে না ব্র !

—সু, অনেক খেলা হ'লো।...আমি বন্ধু হতে-ই চাই, কারুর ইচ্ছার ভারবাহী পশু চাই নে হতে।

—এতকথার পর-ও আমাকে বুঝতে পারলে না ব্র ?

দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে' উঠে দাঁড়াল সু ঃ

—অল রাইট,

বলল্ল আপন মনে।

১১

সু ফিরে গেল ক্ষুণ্ণ হয়ে। মনে হ'ল চিরদিনের মত বিচ্ছেদ ঘটল তার সঙ্গে। তার সুযোগেই শো-র সঙ্গে আমার সামাজিক সখ্য, সে গেল, শো-ও তবে গেল চলে। তা যাক। সংসারে সরে' যাওয়াটাই সত্য। সহজভাবে এটা যদি মানি, তবে এটা সুন্দর-ও বটে।

আরাম কেদারাটায় হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে রইলাম অনেকক্ষণ।...লখ্নৌ যাবো? কলকাতা আর ভালো লাগছে না। কথা আছে বটে, দুখানি নূতন ছবির 'কনট্র্যাকট্' হবে দিনকয়েক পরে-ই। কিন্তু এখন-ও তো হয় নি, চলে গেলে কেমন হয়?...অনেকদিন মাকে দেখি নি। ভাই-বোনগুলোকে তো ভুলেই গেছি। বাবার কথা তো মনে-ও আসে না একবার! যাবো লখ্নৌ? খাবার সময় দাদুর কাছে কথাটা পাড়লে কেমন হয়?

দাদু তো ঘরেই রয়েছেন। এখন-ই যাবো। তাই যাই...

ক্রিং ক্রিং ক্রিং

কে আবার পেছু ডাকল বুঝি...

—ইয়েস্...

—বু?

—হ্যাঁ।

—নমস্কার। আমি শো, কথা বলছি।

—বলুন।

হৃৎপিণ্ডটা দ্রুত তালে হঠাৎ স্পন্দিত হ'ল অকারণে। বালকোচিত অভিমানের একপ্রকার বিশ্রী ভাবাবেগ বিদ্যুতের মত নেচে গেল অন্তরে। ধীরে ধীরে বসলাম চেয়ারে। শান্ত গম্ভীর স্বরে উত্তর করলাম:

—হ্যাঁ বলুন।

—আপনি নাকি কলকাতা ছেড়ে চলে যাচ্ছেন?

শো-র কাছে এরি মধ্যে তাহ'লে রিপোর্টটা চলে গেছে!...

—যাবো ভাবছি !

—× × ×

—যাওয়ার এখনও কিছু ঠিক করি নি।

—আপনি যাবেন না।

—× × ×

—যদি যান-ই, অন্য সময় যাবেন।...এখন গেলে...

বলতে বলতে হঠাৎ থেমে গেলেন শ্রীমতী শো। কিছুক্ষণ নীরবতা। তারপর আমি-ই কথা বললাম ঃ

—সু এখন কোথায় ?

—বাড়ী চলে' গেলেন।...তাঁর মুখে সব শুনলাম। আমার চিঠিখানি আপনি একবার পড়ে-ও দেখলেন না !

—× × ×

—সব তো শুনেছেন।...আমার মনের কষ্টটা যদি বুঝতেন তাহ'লে নিশ্চয়ই আমাকে ক্ষমা করতেন। গতকাল যে-অপমান নিয়ে আপনি ফিরে গেছেন, লোকচক্ষুর অন্তরালে তার কোটি গুণ অপমান আমাকে সইতে হয়েছে—এটা যদি জানেন...

করুণার্দ্র হ'ল মন। উত্তর দিলাম ঃ

—আমি জানি, শ্রীমতী শো...

—জানেন ? তবু দয়া হয় না ?

—× × ×

—কাল পাগলের মত আপনি এদিকে সেদিকে ঘুরলেন। লেকে যখন আপনাকে মুহূর্তের জন্যে দেখলাম, কান্নায় বুকটা ভরে গেল। কী রাজবেশে এলেন, কী দীনবেশে আপনাকে ফিরতে হ'ল !

শো তাহ'লে লেকে আমাকে দেখতে পেয়েছিলেন ? দেখতে পেয়ে-ও মুখ ফিরিয়ে সু-কে নিয়ে গেলেন চলে ? এটা আমার প্রতি উপেক্ষা, না সু-র প্রতি প্রতারণা ? কী যে কী, তা সব সময় বিশ্লেষণ করে লাভ-ই বা কি ? মানুষের মন অনেক সময় কিছু না-পেয়েও কি পাওয়ার পুলক করে না অনুভব ?

—লেকে আমাকে তাহ'লে দেখেছিলেন,

জিজ্ঞাসা করলাম বালকোচিত উচ্ছ্বাসে :

—সু দেখতে পায় নি ?

—সু তো তখন স্বপ্নজগতে ! কোনো দিকে তার তার কী তখন দৃষ্টি ছিল ?

— × × ×

—কী করছেন এখন ?

—আবোল-তাবোল যা' তা' সব ভাবছি ।

—আমি-ও আবোল-তাবোল কত কী ছাই ভাবছি ।...কেন যে কাল আপনি এলেন ! সমস্ত সুরের আনন্দ যেন তারা-র 'নি' থেকে উদারার 'সা'-এ গেল নেমে ।—একটু থেমে আত্মবিস্মৃত বিহ্বলতায় :

—তোমাকে স্মরণ করে' কত রোমাঞ্চ করতাম অনুভব...কেন মানুষের বেশে এলে, মানুষের স্পর্শে মলিন হয়ে কালো মুখ করে' ফিরেও গেলে ! ...ধ্যানের ধন-কে কি এমনি আচম্বিতে মাটির পৃথিবীতে নামতে আছে ?

চমকে জেগে উঠলাম অপ্রত্যাশিত সুরের ঝংকারে । স্পন্দিত অভিস্পন্দিত হ'ল অন্তরাত্মা । পা থেকে মাথা পর্যন্ত রোমাঞ্চিত হ'ল নৃত্যের আনন্দে । মুখে আর কথা এল না । কান-ই শুধু সজাগ রইল সুরসম্মোহের মানে মূর্ছনায় :

—সাধনা না করে' যে-ধন পাই তাকে তো এমনি করেই আমরা অপমান করি ।...তুচ্ছ দুর্বল মন মহাজনের দান কি গ্রহণ করে সহজে ?

— × × ×

—এই দেখুন আবোল-তাবোল কত কী বকে চলেছি...কাল থেকে কী যে আমার হয়েছে...কই, আপনি তো কথা বলছেন না...কে ?...দেখুন, বাইরে থেকে একদল ভদ্রলোক এসেছেন—কাজের ব্যাপারে...নিচে যাচ্ছি...আচ্ছা, একটা কাজ করলে হয় না ?...বলবো ?...

—বলুন ।

—রোজ রাত দশটার পর আপনাকে ডাকবো...সাড়া দেবেন ?

—আমি কি স্বপ্ন শুনছি ?

—× × ×

—শ্রীমতী শো—

—যাই এখন।...যাই ?...

স্বর্গের সংগীত-ই বুঝি ঝরল। সুরমুগ্ধ, আমি নিস্তব্ধ

রিসিভারটা যথাস্থানে নামিয়ে রাখলাম। শ্রীমতী শো চলে গেলেন। বিদ্যুতের মত জ্বলে' ওঠে চকিতেই গেলেন মিলিয়ে। তাঁর আসা ও যাওয়া আমার কাছে খুবই ইঙ্গিতময় বলে' মনে হ'লো। এলেন যেন চলে-যাওয়ার জন্যে, গেলেন বুঝি ফিরে-আসার জন্যেই। বলে' গেলেন: আসবো রাত দশটায়।

অভিনব এক প্রাপ্তির পুলকে স্বপ্নাচ্ছন্ন হ'ল যৌবনাত্মা। না-পাওয়ার বিষাদে যে-বৈরাগ্য, মৃত্যু তার অন্তরে। পাওয়ার আস্বাদে যে-প্রেম, অমৃত তো তারই নাম। কাছে গিয়ে শত-যোজন দূর-রচনার বৈরাগ্য কেন চাইব, দূরে থেকে নৈকট্যের সুর-রচনার প্রেম যদি জোটে ভাগ্যে!...আমি ভাগ্যবান্, দায়হীন বন্ধনবিহীন আশ্চর্য প্রেমের সন্ধান মিলল শো-র করুণায়।

কিন্তু এ-প্রেমে কতদিন তৃপ্ত থাকে পুরুষপ্রাণ? মানুষ কি শুধু মন, দেহ নয়?—মধ্যাহ্নের আহার শেষ করে' উদাসীনভাবে শো-র কবিত্বসুন্দর মোহন কথাগুলি রোমন্থন করছি, হঠাৎ কে যেন প্রশ্ন ক'রল ভেতর থেকে।...সু-র কথা মনে পড়ল! মনে পড়ল তার সকালবেলাকার কথাকাহিনী।

সু তার প্রেমজীবনের গোপনকথাগুলি কেন এমন সরল সখ্যের আবেগেই ব্যক্ত করে' গেল, বাইরের পাঁচজনের পক্ষে তা বুঝতে পারা হয়তো খুবই কঠিন, কিন্তু আমার কাছে তা দিনের আলোর মত স্বচ্ছ ও সহজ বলেই আবার মনে হ'ল। সু আমার বন্ধু, সত্যকারের বন্ধু, কিন্তু তবু সে কেন আমাকে প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করে' গোপনে শিউরে উঠে' অশান্তি পায়—তা

অনুমান করা আর কঠিন হ'ল না। মনে মনে সু অবশ্য জানে—শো
একান্তভাবে তার-ই। শো-ও তাকে সত্যসত্যই ভালবাসে। শো-র
ভালবাসাকে ছলনা বলে' সু মাঝে মাঝে যে ব্যাখ্যা করে, সেটা তার হৃদয়ের
বিশ্বাস নয়। সেটা আরো পাওয়ার, নিবিড় করে' আরো নিজস্ব করে
পাওয়ার ভাবাবেগ বলেই আমি জানি। বোধ করি সু-ও এটা জানে বলেই
অভিনয়টা করতে পারে নিপুণভাবে। আমার প্রতি শো-র যে আকর্ষণ—তা
শিল্পগুণের এবং সম্ভবত রূপমোহের সাময়িক আকর্ষণ। এ-জন্যে যে সু-র
ভয়, তা আমি বিশ্বাস করি না। সু-র যত ভয় আমাকে। শিল্পী শো-কে
আমি শ্রদ্ধা করি—এটা সু-ও চায়, সত্যসত্যই চায়। কিন্তু প্রেম নেমে আসুক
শ্রদ্ধার ছদ্মবেশে—এটা সে সহ্য করবে কেমন করে? আর শিল্পের শ্রদ্ধা
যে রূপের মোহে নামবে না—এমন আশ্বাস কবে আমি তাকে দিয়েছি?
আপন হৃদয়গহনে প্রবেশ করে' যতই সে আমার প্রেমাতিশয্য অনুমান করে,
ততই মনে মনে আজকাল শিউরে ওঠে। এমন এক মানসিক মুহূর্তে শো
যদি আমার জয়গান করে, চিত্ত স্থির রাখবে কেমন করে'? কেন ক্ষেপে
উঠবে না সিংহের আক্রোশে? প্রণয়িনীর মুখে কোন্ প্রেমিক পুরুষ অন্য
কোনো পরপুরুষের প্রশংসা চায় শুনতে—তা হ'ক না কেন সেটা শিল্পগুণের
প্রশংসা কিংবা আত্মসংযমের যশোগান?...বন্ধুকে সে যে কেন প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবে
তার কারণটা তাহ'লে তো বোঝা গেল। আবার মনটা শান্ত হলে পর
সেই প্রতিদ্বন্দ্বীর কাছে-ই বা সে আসে কেন মার্জনা ভিক্ষায়, ভরসা চায় তার-ই
কাছে—এটা-ই বা কী এমন দুর্জ্ঞেয় রহস্য?

কিন্তু কী বলে' তাকে ভরসা দেব? শো-কে চাই না, এই বলে'?
শো-কে সত্যসত্যই নাকি চাই না?

কেন তাঁর ছবিগুলি দিলাম পুড়িয়ে? তাকে পেতে গেলাম, পেলাম
না, তাই না ক্ষোভ, ক্রোধ, অভিমান? ছবিগুলি পোড়াবার সময়
একবারো কি মনে হ'ল, যে, শো শিল্পী, যাঁর কলানৈপুণ্যে আমি মুগ্ধ,
যাঁর ভাবপ্রেরণায় আমি প্রাণচঞ্চল? মানুষ হিসাবে শো যাই হ'ক না,
শিল্পী হিসাবে তো রূপরম্যা তিলোত্তমা। তবু কেন তাঁর চিন্তা

মধুরের তখন পাই নি স্বাদ, আকাশের দেখি নি স্বপ্ন? তবে কি মানুষটাকেই চাই বলে' আদর করি তার শিল্পের? মানুষটার প্রতি বিরূপ হ'লে শিল্পের মোহ যায় কেটে, তখন, পুড়িয়ে দিই তার রূপচিত্র?...প্রিয় বলে' যাকে মনেপ্রাণে স্বীকার করি, সামান্যতম কলাকীর্তি-ও তার প্রশংসনীয়? শত্রু বলি যাকে, তার নৃত্যকে বলি বাঁকা-চলন, গানকে বলি চীৎকার?

শিল্পবোধের ব্যাপারে—ভালবাসাটা তবে আগে, পরে ভাললাগা? বলি, ভালবাসাটা আসে কোথা থেকে? বলব কি, রূপ থেকে? সৌজন্য থেকে? মাধুর্য থেকে? এ-সব থেকে ভালবাসা জাগে, আর সেই ভালবাসার মোহে যা দেখি, তা-ই লাগে ভালো? শিল্পীর তাই রূপ চাই, চাই রূপের গুণ, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে চাই মানবতার মাধুর্য, প্রিয়ভাবের সৌজন্য?

শো-র শিল্পীটিকে যদি ভালবাসি, তবে তার মানুষটির প্রেমে-ও তো পড়ে থাকি গোপনে! তা' বন্ধুর প্রেম কি প্রেম নয়? শো-র বন্ধু হই, এতে আপত্তি কি? না, আপত্তি নেই—তবে বন্ধুই যেন হতে পারি, আর কিছু যেন হতে না চাই! তাই বুঝি অসহায় সু-র এতবড় ভূমিকার অবতারণা? কৌশলে বলে' যাওয়াঃ শো আর কারুর নয়, শো-সুরই? এই শো-র সান্নিধ্য যদি পেতে চাও, এসো, আপত্তি নেই। কিন্তু অভিন্নহৃদয় বন্ধু বলে' যাকে জানি, বিশ্বাস তার ওপর যেন হারাতে না হয়।

মনটা হঠাৎ এতটুকু হয়ে গেল কুঁকড়ে কুণ্ডলী পাকিয়ে। শত্রু আক্রান্ত সর্প যেন। কালো মুখটা বুঝি লুকিয়ে গেল পেটের মধ্যে। অননুভূত একটা তিক্ততার আস্বাদে সর্বশরীর হ'ল বিষাক্ত। সু-র কথাগুলির গহনব্যঞ্জনা গোপনে যত অনুমান করলাম, ততই যেন কুৎসিত একপ্রকার বেদনভাবের বিষাদে আচ্ছন্ন হ'ল অন্তরাত্মা। শব্দহীন এক পৌরুষ ভর্ৎসনায় চেতনাবোধ হ'ল ধিক্কৃত।

শো-র ছবিগুলি পুড়িয়ে-ফেলার মধ্যে যে-বালকত্ব প্রকাশ করেছি, অনুতাপ হ'ল তার জন্যে। শো-র চিঠিখানি সহজে গ্রহণ করে' সরল একটা উত্তর লিখে দেয়া-ই ছিল মানুষের কাজ। খুব-ই ছোট হয়ে গেলাম নিজের কাছে। বড় ভুল হয়ে গেল। শিল্পের চেতনার ওপর হৃদয়ের বেদনাটাকে অত্যধিক প্রাধান্য দিয়ে সকল শিল্পী-ই বুঝি এইভাবে ভুল করে। ভুল করে' ছোট হয়, ছোট-হওয়াটাকেই বাস্তব বলে, ব্যাখ্যা করার দম্ভে আরো ছোট হয় অন্তরে।

বন্ধু সু বোধ হয় এই ছোট-হওয়ার দায় থেকে আমাকে বাঁচাতে এসেছিল। অন্তত এই 'ভাব'-ই আমাকে আজ ভাবতে দাও! সু-র প্রণয়িনীর ওপর মানববাসনার কোনো দাবী যদি আমার না থাকে, তবে এই 'ভাবেই' আমি শান্তি পাব। শান্তি চাই। শান্তি, শান্তি।...এই শান্তিই চাইব দূরের সুর থেকে। রাত দশটায়।

সু-কে বড় ভালো লাগল।—বন্ধু সু, আমি তোমাকে কষ্ট দেব না, তুমিও কষ্ট দিয়ো না শো-কে। আমাদের দুই বন্ধুর মধ্যে শো এসে নয়, তোমাদের দুজনার মধ্যে আমি এসেই যত জটিলতার দিয়েছি জন্ম। তার চেয়ে এই ভালো, আমি থাকি তার 'ধ্যানের ধন' সে থাক আমার স্বপ্নচারিণী। জৈবতার মোহ আমাদের ধ্যানে যেন না আসে, আমাদের প্রেমে প্রকাশ না পায় অধৈর্যের হাহাকার। যদি দেখা হয় কোনদিন, যেন বাঁধ না ভাঙে, হৃদয়গুহার বন্দী তরঙ্গ প্লাবিত না করে সংযমের সীমাতট।

কিন্তু এ তো সন্ন্যাসীর জীবনেই সম্ভব, সম্ভব কি দুর্বল মানুষের জীবনে? এ কী অদ্ভুত পরীক্ষা হ'ল সুরু? যাকে চাই, তাকে দেখব না, তাকে স্পর্শ করব না, ঘ্রাণ নেব না অঙ্গগন্ধের, শুনতে চাইব না প্রেমের নিবেদন?

না, শুনতে তো পাবে! রাত দশটায়!...এতেই তুষ্ট? কি জানি তুষ্ট কি না। কিন্তু সকল তুষ্টি পুঞ্জীভূত হয়ে গেছে রাত দশটার অনন্তে: সুর ভেসে আসবে সেই বৈকুণ্ঠ থেকে। আনন্দসম্মোহে মূর্ছিত হবে

শ্রবণেন্দ্রিয়, মূর্ছান্তে বুঝি নয়ন হয়ে দর্শন করবে সুরের রূপ: অদর্শনা হবে সুদর্শনা—এর চেয়ে মধুর প্রাপ্তি কী আর আছে শিল্পীজীবনে?... গুরুমন্ত্রের মত গোপন রাখতে হয় স্বপনচারিণীর প্রেমরম্যতা—'ধ্যানের ধনকে কি নামাতে আছে মাটির পৃথিবীতে'?

চেঁচিয়েই আবৃত্তি করলাম গভীর ভাবাতিশয্যে! এতদিন কত নাটকের কত বাণী আবৃত্তি করেছি—এমন কি গুরুদেবের একাধিক নাটকের বহু বাণী আপন মনে কতবারই তো করেছি উচ্চারণ, কিন্তু বাণী-উচ্চারণে যে এত আনন্দ, এমন স্বর্গসুন্দর ভাবচেতনার অমৃতাস্বাদ—তা পূর্বে এমন করে কখনও অনুভব করি নি। শ্রীমতী শোর এই বাণীটি ঈষৎ পরিবর্তিত করে' উচ্চারণ করার সঙ্গে সঙ্গে সর্বশরীর ও মন যেন সুরে সুরময় হয়ে গেল! মনে হ'ল, শো যেন তাঁর ভাষায় আমারি মনের কথাটি দূর থেকে সুরে দুলিয়ে দিয়েছেন যৌবনের স্পন্দনে। শো শিল্পী, মহতী সৃষ্টি তাঁর। একটি সুরের মুহূর্তে তিনি রচনা করেন অনন্ত। যদি দেখা হয়, হাত-দুখানি ধরে' একবার তাঁকে বলব: যাঁর কথা-ই গান, তাঁরই নাম শ্রীমতী শো।...'তোমাকে স্মরণ করে' কত রোমাঞ্চ করি অনুভব...এই রোমাঞ্চই যেন পাথেয় হয় আমার জীবনে...মানুষের বেশে মানুষের স্পর্শে মলিন হতে তুমি এসো না...'

আবার আবৃত্তি করলাম আনমনে, বেশ চেঁচিয়েই করলাম।

হঠাৎ—

পিছন থেকে বালিকার মত খিল খিল করে কে হেসে উঠল। চমকে, ধড়মড়িয়ে উঠে, একী, দুপুরবেলা তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে দিবা-স্বপ্ন দেখছি নাকি—শ্রীমতী শো এসেছেন ঘরের মধ্যে, হাসছেন স্বপ্নসুন্দরীর দিব্যতার দ্যুতি বিস্তার করে।

দূরে দ্বারপ্রান্তে তখনও দাঁড়িয়ে আছে দারোয়ান রামস্বরূপ, জিজ্ঞাসা করছে এবার সে যেতে পারে কি না!

শো-ই তাকে যেতে বললেন। সে চলে গেল।

—খুব অবাক করে' দিয়েছি তো?

—× × ×

—অমন করে' চেয়ে কী দেখছেন?

—স্বপ্ন দেখছি না তো!

—চোখ দেখে তো মনে হচ্ছে স্বপ্ন-ই দেখছেন...

—না এটা স্বপ্ন নয়। স্বপ্নাতীত।...এই দেখুন আপনাকে এখনও বসতে বলি নি।...বসুন।

—আপনি যে দাঁড়িয়েই রইলেন।

তাই তো, কোন সময়ে নিজেরই অজ্ঞাতে দাঁড়িয়ে উঠেছি বোধ ছিল না। পাশের একটি চেয়ারে বসলাম।

—কী সৌভাগ্য,

বললাম আত্মবিহ্বল উচ্ছ্বাসে:

—আপনি আসবেন, এ আমি কখনও ভাবি নি!

—মনে মনে কতবার যে আসি,

বলতে বলতে, শ্রীমতী শোঁ, বাক্যটি শেষ করলেন না, থেমে গেলেন। ঘরের চারিদিকে চাইতে লাগলেন অকারণে। একটু পরে সম্পূর্ণ আত্মগতভাবে:

—এ বাড়ীতে যেন কতবার এসেছি! এই ঘরখানি যেন কতকালের চেনা।...

—× × ×

—ফোনে কথা কওয়ার পর সাহস বাড়ল, আর থাকতে পারলাম না, সোজা চলে' এলাম চোখকান বুজে'!

বলে' শো হাসতে লাগলেন দিব্যোজ্জ্বল সারল্যে। কী তিনি বললেন বুঝি কানেই এল না আমার। স্থিরদৃষ্টিতে তাঁর মুখখানির দিকে বালকের মত কেবল চেয়েই রইলাম। এমনও হয় নাকি জীবনে। অভাবনীয় কোনো ঘটনার মুখোমুখী দাঁড়িয়ে আত্মবিহ্বল মানুষ বুঝি এমনতর বাক-রহিত বিস্ময়ে থাকে অভিভূত।

—কথা বলছেন না যে!

অনুযোগ করলেন শ্রীমতী শো। চমক ভাঙল। অপ্রতিভ হয়ে হাসলাম তাঁর চোখের ওপর চোখ রেখে:

—× × ×

—কই কথা বলুন!

—মৌনের বিস্ময়ে যে-কথা, তার মত মধুর কথা গুরুদেবের কাব্যে-ও কি প্রকাশ পেয়েছে।

—ও তো আপনার মত মানুষের কথা হ'ল। আমাদের মত কথা বলুন, যা শোনার কান পেতে আছি। মন মেলে আছি।

—× × ×

—আবার চুপ।

—যে পায় সে-ই জানে মুখের কথা কত তুচ্ছ!

—ও-ও তো আপনার কথা হ'ল। তার কী কথা, যে পায় না—পাওয়ার প্রত্যাশায় আকাশের মত অহরহ থাকে চেয়ে, গ্রীষ্মে বুক ফাটায়, বর্ষায় কাঁদে, শরতের সুনীল আশ্বাসে চাইতে চায় কিন্তু পায় না যে তার প্রমাণ পায় হেমন্তের কুহেলিকায় আর শীতের বিরহে।

—বসন্তের আবির্ভাবের কথা কি ইঙ্গিত করছেন না?

—ক্ষণবসন্তে কী হবে, অনন্তে যখন প্রত্যাশা! নিশ্চল আকাশের জীবনে শুধু চরাচরের চলমানতা। স্থির প্রাপ্তির সুখ কোথায় এখানে বলুন!

—কিন্তু শিল্পীর জীবনই যে এই! সুখ কি চাই? স্থিতিতেও. কি ভরে মন? নিত্যনূতনের স্বাদেই তো জীবনের মূল্য!

—অস্বীকার করি না। কিন্তু মনে কি হয় না, একটা কোনো ধ্রুব প্রাপ্তিকে কেন্দ্র করেই নিত্যনূতনের আস্বাদ সম্ভব? বিচিত্র পুষ্পপ্রকাশের নিত্যনূতন আনন্দ কোথায় পাবে প্রিয়বন্ধু, যদি কোলের কাছে না থাকে পৃথিবী, ধ্রুবা পৃথিবী?

— × × ×

—চুপ করে রইলেন যে!

—কথাটা সত্য বলেই মানি।...কিছু বিশ্বাস, কিছু আশ্বাস, আর সেই বিশ্বাস ও আশ্বাসকে ঘিরে' স্বপ্নরচনার রসোল্লাস—এ-ছাড়া আর কা-ই বা আছে শিল্পীর জীবনে?...পেয়ে জুড়িয়ে-যাওয়া তো গান নয়, না পেয়ে জ্বলতে-যাওয়াই তো শিল্পের প্রাণ!...

—পাবো না জানি, বোধ করি পেলে-ও না-পাওয়ার নবতর কোনো বেদনা-ই করবো রচনা, কিন্তু কী পেতে হবে তা তো জানতে হবে!

—তা বোধ হয় জানি!

— × × ×

—চুপ করে' রইলেন যে!

—মন বড় দুর্বল, প্রিয়বন্ধু। অপ্রত্যাশিত প্রাপ্তির আনন্দোচ্ছ্বাস সহ্য করতে পারে না দুর্বল মন।

বলতে বলতে উঠে দাঁড়ালেন শ্রীমতী শো। ঘরের এদিকে-সেদিকে ঘুরে বেড়ালেন অন্যমনস্কার মত। আলমারীর বইগুলি দেখলেন উদাসীন দৃষ্টিতে। ফিরে এলেন কাছে:

—এই ঘরেই পড়াশুনো করেন?

—হ্যাঁ!

—আপনার বই-এর কালেক্‌সন দেখে লোভ হয়।...আপনি তো ফিলসফির?...কত বিচিত্র বিষয়ের বই পড়েন আপনি!...

— × × ×

—এম্‌-এ টা পারেন তো কোনো এক সময় দিয়ে দেবেন।...আপনার দেয়া উচিত।...আমার দিতে যে কত ইচ্ছা।

—ইচ্ছা থাকলে নিশ্চয়ই দিতে পারবেন।

—সকলের ক্ষেত্রে ও-কথাটা হয়তো সত্য নয়!...বাধা পার হওয়া শক্ত।

—বাধা কিসের?

—বাধা নিজের মন।

—তবে তো মন-ই নেই। আর মন যদি নেই তবে ইচ্ছা-ই নেই।

বলে' হাসলাম।

—না ভাই,

বললেন শো বিষণ্ণ গাম্ভীর্যে :

—ইচ্ছা-ও আছে, এটা-সেটা নানা চিন্তাও আছে মনে। মনটা বড় জটিল।...পরস্পরবিরোধী কত ইচ্ছার মরীচিকায় মানুষকে টেনে নিয়ে যায় এই মন।... মন জয় না করলে কি ইচ্ছার জোর বাড়ে ?

— × × ×

—ওটি কার ছবি ?

—আমার মার।

—আন্দাজে ধরেছি। আপনার মা তো সুন্দরী হবেন-ই।...উনি ?

—মায়ের গুরুদেব। আমাদের সকলের গুরুদেব। হিমালয়ে ওঁর আশ্রম।...মাঝে মাঝে আসেন আমাদের কাছে।

—দেখে ভক্তি হয়। সত্যকারের গুরু পাওয়া ভাগ্যের কথা।...ওঁকে দেখেছেন ?

—একবার। বার দুই এ-বাড়াতে এসেছিলেন। একবার, তখন আমি শান্তিনিকেতনে, দেখা হয় নি। আর একবার, আমার ম্যাট্রিকুলেসন পরীক্ষার সময়। দেখা হয়েছিল।...শুনছি আবার আসবেন খুব শীগ্‌গীরই। চিঠি লিখেছেন।

শো উঠে গেলেন গুরুদেবের ছবিখানির কাছে। অবস্থিতচিত্ত হয়ে নিরীক্ষণ করলেন ছবিখানি। মার দিকে তাকালেন প্রসন্নদৃষ্টি।

—বড় আদর্শ থাকলেই মানুষ বড় হয়,

বললেন আপন মনে :

—বড় হয়েছেন। কিন্তু আরো বড় হবেন আপনি।

শো এসে বসলেন পাশের চেয়ারে !

—বেশ নিরিবিলি ঘর।...মা-বাবা তো থাকেন লখ্‌নৌ ?...সেখানেই আপনাদের আদিবাড়ী ?

—হ্যাঁ।

—দাদুর কাছে আছেন ?

—সু দেখছি আমার বিষয় জানাতে কিছুই বাকি রাখে নি।

—কেন জানি না আপনার কথা জানতে অহরহ আমার ইচ্ছা হয়। সু তো আপনার কথা খুব বলে। পরম বন্ধু সে আপনার। তবু মাঝে মাঝে কী যে হয়, উন্মাদের মত ব্যবহার করে' বসে।...

বলে' শো একটা সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন।

—দেখুন,

শান্তসুরে আমি বললাম ঃ

—একটা কথা বলবো, রাখবেন ?

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে শো আমার মুখের দিকে মুখ তুললেন। বললাম ঃ

—সু আমার অনেককালের বন্ধু, পরম বন্ধু, আমি জানি। তবু তার কাছে আমার কোনো কথা উত্থাপন বোধ হয় না করাই ভালো। প্রশংসার কথা তো নয়-ই। কী হবে আপনাদের মধ্যে আমার কথা টেনে এনে। এতে তো অশান্তি-ই বাড়ছে।

শো-র চিত্রসুন্দর উদ্দীপ্ত মুখখানিতে হঠাৎ যেন অন্ধকার নামল। ত্রস্ত হলাম।

—ব্যথা পেলেন ?

বললাম লজ্জিত হয়ে ঃ

—ব্যথা দেয়ার কথা তো বলি নি।

—মানুষ কিসে ব্যথা পায়, কিসে পায় না, স্বয়ং বিধাতাপুরুষও কি জানেন ?—বললেন শো ম্লানমুখে একটু হাসি জাগিয়ে।

—ব্যথা দিয়ে থাকি, অজান্তে দিয়েছি।...কারুকে, বিশেষ করে' আপনাদের, ব্যথা দেয়ার কথা আমি কল্পনাও করতে পারি না।...

—তা' আমি জানি।

বলে আবার হাসলেন শ্রীমতী শো। বড় অসহায় হাসি। বললেন ঃ

—মানুষ যতই দুঃখী হ'ক, প্রিয়বন্ধু, বিধাতার রাজ্যে একটা-না একটা সান্ত্বনার আশ্রয় তার আছে-ই।...নির্মম দুঃখে-ও মানুষ যে মরতে

চায় না, কিংবা নয় হতে চায় না উদ্দাম সুখে-ও, তার কারণ বোধ হয় হৃদয়গত এই গোপন সান্ত্বনা। এটা যদি না থাকতো, কী যে হ'ত অসহায় মানুষজাতটার!

টেবিল থেকে একখানি বই টেনে' নিয়ে আনমনে দেখতে দেখতে কথাগুলি বলে' গেলেন শ্রীমতী শো। মুখ তুললেন স্বপ্নময় আবেশে। তাঁর সুন্দর চোখদুটির স্নিগ্ধ সৌহার্দ্য আমার বিহ্বলদৃষ্টিতে এসে মিলল। এ-মেলা নূতনতর একপ্রকার আলিঙ্গনে যেন মেলা। দেহ জানে না, বুদ্ধি জানে না বোধ করি মন-ও জানে না, অস্পর্শ এ আলিঙ্গনের সুরটি কী, কত যুগের কত জীবনের কত আশ্বাস আছে এই সুরমোহে।

শো বললেন:

—আমার ভাগ্য ভালো, আপনার মত বন্ধু পেলাম। আর আমি মরবো না।...জানেন, মানুষ সুখের মোহে ঘর বাঁধতে চায়, কিন্তু ঘরের মানুষে বন্ধুর আনন্দটি যদি ভুলে বসে, তবে সুখও যায়, স্বস্তি-ও যায়।...সুরের জীবনটি যদি না বাঁচান, 'সুখ সুখ' করে' চেঁচিয়ে কী হবে বলুন? সুরহীন জীবনে কি শান্তি আসে, না ক্ষান্তি মেলে? তখন তুচ্ছ মানাভিমানের জৈবতায় প্রিয়মানুষকে-ও পশু হতে হয়, কিংবা প্রেমের পরিবর্তে প্রকাশ করতে হয় প্রতারণা।...

সমবেদনার যৌবনময় কারুণ্যে রসায়িত হল মন। শো-র কথায় কী যে আছে, 'পেয়েছি' বলা-র অনন্ত আশ্বাসে সম্মোহিত হ'ল অবচেতনসত্তা।... টেবিলের ওপর তাঁর শুভ্রনিটোল হাতদুখানি তখন পাতা ছিল। অকারণে একখানির ওপর হাত রাখতে গেলাম ভাবাতিশয্যে। শো তাঁর দুখানি হাত দিয়েই আমার হাতটাকে জড়িয়ে ধরলেন আকুল আগ্রহে। উত্তেজনার তড়িৎবেগ সঞ্চারিত হ'ল সর্বাঙ্গে।......

মনে মনে কতটা এগিয়ে এলে তবে অনাহূতভাবে বাড়ী পর্যন্ত আসা যায়, পরমাত্মীয়ের মধুরতা নিয়ে সঙ্গ দেয়া যায় সহজ পুলকে?—মনের নির্জনে যতবার প্রশ্নটা করলাম ততবারই শিউরে উঠলাম অভিনব ভাবাবেশের সম্মোহে।......শরতের একখণ্ড রূপালি স্বপ্নের মত আচমকা ঝকমকিয়ে উঠল শো, বসন্তের এক ঝলক সুগন্ধ আশ্বাসের মত সারা দেহে সাড়া তুলে মনটাকে চনমনিয়ে গেল শো। নাকি এটার প্রয়োজন ছিল আমার শিল্পপ্রেমের উদ্‌যাপনে? অন্ধকারে হাতড়াচ্ছিলাম, পথ পেয়ে গেলাম প্রশান্ত পুলকে।

পথ বোধ হয় পেলাম তবে। বন্ধুপ্রেমের আনন্দপথ। দুর্গম এ-পথ, তবু বিশ্বাস হ'ল, শিল্পীকে চলতে হবে এই পথেই। গৃহীর মত গতানুগতিক কিছু পাওয়ার পথ এ নয়, যোগীর মত গতানুগতিকভাবে সব কিছু ছাড়ার পথও এ নয়, এ-পথ বন্ধুর পথ, গৃহ নেই তবু মানসিক আশ্রয় আছে, শাস্ত্র নেই তবু আন্তরিক সংযম আছে এই পথে। আলোছায়ায় ঘেরা, ভালো-মন্দয় ভরা, আঁকাবাঁকা বন্ধুর এই পথ—বড় দায় এই পথে চলা, টাল রেখে আর তাল বাঁচিয়ে ঠিক মত চলা বড় দায়, বড় কঠিন। এই বুঝি মনে হয় ঘর বাঁধি, এই আবার: পালিয়ে বাঁচি মঠে, মন্দিরে, কিংবা অরণ্যে, পর্বতে। সাধারণ মানুষের জীবনে এ-পথের কল্পনা অবাস্তব অসহ্য এবং অসত্য কল্পকথাই বুঝি মনে হবে! কিন্তু শিল্পীর জীবনে অন্য পথ যে সত্যই নেই!......শো আর আমি, আমি আর শো—আমরা দুজনে পথ চলার পরম বন্ধু—বন্ধু, হ্যাঁ বন্ধু আমরা আনন্দঘন শিল্প-জীবনে, সুখেদুঃখে উত্থানেপতনে বন্ধুই যেন হতে পারি আমরা! বারংবার নারীর রূপমোহে পুরুষপ্রাণ হবে প্রমত্ত, পুরুষের প্রেম-স্বপ্নে নারীহৃদয়ও হবে বৈরাগিনী—গতানুগতিক কামনার পথে নামতে চাইবে অস্থির যৌবন, তবু বন্ধু নাম

জপ করব নির্জনে, মনকে বাঁধব সংযমের বেদনায়, বুদ্ধি দিয়ে বাঁধব, কিন্তু স্বভাবটা কাঁদবে গোপনে। যত কাঁদবে, তত বাঁধব—যত বাঁধব ততই উথলে উঠবে কান্না। আর কান্নাটাই তো নিত্যনূতনের প্রাণরহস্য।—বলে' গেলেন শো ভাবের আবেগে, যেন স্বপ্নস্বর্গের শিখরদেশ থেকে।... কিন্তু অবাস্তব এ কি কল্প কথা মাত্র নয়? সম্ভব এ কি মানুষের জীবনে?

—সম্ভব নয়, এটাই লোকে বলে। দেখে-ও।

বললেন শো দ্বিধাহীন দৃঢ়তায়!

—পথ চলতে চলতে আমরাও যদি তা' দেখি—বুঝব বন্ধুপ্রেম হয়েছে ব্যাহত, সাধারণ নারী ও পুরুষের স্বভাবধর্মে অজ্ঞাতে নেমেছে আমাদের প্রেম!

—অন্য কিছু মনে করবেন না, জিজ্ঞাস্য এই: তাতে ক্ষতি কি?

—ক্ষতি কি?

আত্মগতভাবে প্রশ্ন করলেন শো। নীরব রইলেন কিছুক্ষণ। তার পর বয়স্থা দিদির মত স্নেহশান্ত গাম্ভীর্যের সুরে সুরু করলেন:

—অনেক ক্ষতি প্রিয়বন্ধু। সুরপ্রেমের আনন্দে মৃত্যুহীন হ'তে যার সাধনা, ঘরের প্রেমের বন্ধনে তার মৃত্যু।······পুরুষ যদি নারীর প্রেমে ঘর বাঁধতে চায়, সেটা স্বাভাবিক, দোষের বলি না সেটাকে। কিন্তু সন্ন্যাসীর পক্ষে সেটা দোষের। সন্ন্যাসী যদি নারীমোহে পাগল হয়, বলব সেটা বাস্তব বটে—কিন্তু সন্ন্যাসজীবনের বাস্তব নয়। তেমনি বন্ধু যদি স্বামিত্ব চায় কিংবা চায় পত্নীত্ব, বলব, বেশ হয়েছে, সুখে ঘর করো গিয়ে—কেননা এটাই এ-পর্যন্ত ঘটে এসেছে সর্বকালে, সর্বদেশে, কিন্তু দোহাই তোমার বন্ধু প্রেমের গর্ব করো না কখনও।

—স্বামী কি বন্ধু নয়, পত্নী হতে পারেন না বন্ধু?

—কে বললে পারেন না, কিন্তু কতটুকু কালের জন্যে? ক-টা বাড়ীতে তরুণ স্বামি-স্ত্রী বন্ধুর স্বপ্নময় শিল্পানন্দ করে উপাসনা? যদি করে, তারা ধন্য। স্বর্গমর্ত্য—দুই-ই তাদের অধিকারে। কিন্তু এটা কি সত্য নয় প্রিয়বন্ধু, যে, তুচ্ছ মানাভিমান, তুচ্ছ গার্হস্থ্য-ভোগ, তুচ্ছ খুঁটি-নাটি বিষয়বস্তুর

বাসনা—সংসারের অধিকাংশ স্বামী ও স্ত্রীর জীবনের ট্র্যাজেডী ?...প্রেমের প্রথম অবস্থায় রোমান্সের দৃষ্টিতে স্বামী-স্ত্রী হয় পরম বন্ধু, অযুত বসন্তের রোমাঞ্চ অনুভব করে তখন, তারপর তুচ্ছ জৈববিলাসের অমিতব্যয়িতায় কোথায় ভেসে যায় সেই রোমাঞ্চ, কোথায় লুপ্ত হয় সেই শিল্পসাধনার আশ্চর্য সুরবাহার !...সংসারে বাহ্যতঃ সুখী স্বামী ও স্ত্রীদের মনের কথা এই কি না কে জানে। কে জানে তাদের আপাতঃসুখের অন্তরালে প্রচ্ছন্ন কোনো দুঃখের সান্ত্বনা তাদের আশ্রয় দেয় কি না।......জানো আমরা এই শিল্পীরা নিখিল গৃহীজনের মর্মমূলে দুঃখের সান্ত্বনায় বেঁচে থাকার কত নবীন উদ্যম দিই সঞ্চার করে'? আর তা করি বলেই তারা আছে, তারা বাঁচে ? তাদের থেকে আমরা কত দূরে, তবু সুর হয়ে এই যে তাদের স্বপ্নসম্মোহের আনন্দে জীবনমৃত্যুর স্বাদ আমরা জাগিয়ে দিই, এতেই না আমরা তাদের বন্ধু ?

ভাবলাম। নির্জনে শো-র কথাগুলি গভীরভাবে ভাবলাম। মনে হ'ল তাঁর সঙ্গে আমার সূক্ষ্ম সম্বন্ধের স্বরূপটি বেশ স্পষ্ট হ'ল—স্পষ্টতর হ'ল !

উর্বসীর মত নন্দনবাসিনী শ্রীমতী শো, স্বপ্নচারিণী বললে আমার জীবনে তাঁর পরিচয় বুঝি তেমন স্পষ্ট হয় না। স্বপ্নচারিণী যেন জৈবকামনার বন্ধনে নামতে-ও পারে, অন্ততঃ মর্মে রচনা করতে পারে বস্তুবাসনার বসন্তোৎসব, নন্দনবাসিনী যিনি, ধরা-ছোঁয়ার ঊর্ধ্বে তাঁর স্থান। তিনি মাতা নন, দুহিতা নন, ভগ্নী নন, জায়া নন, বোধ করি তিনি নারী হয়েও নন নারী, তিনি—শো-র ভাষায় সবার বড়, তিনি বন্ধু। তাঁর মধ্যে আছে সব-ই, শিল্পসম্ভূতির প্রয়োজনে নব নব রূপে সে-সবের প্রকাশ-ও ঘটে : প্রকাশ ঘটে মায়ের মমতা, কন্যার সোহাগ, ভগ্নীর প্রীতি, জায়ার প্রেম। নিত্য-নূতন স্বাদের আনন্দ আয়োজনেই বন্ধু-দেবতার আবির্ভাব : বিশেষ একটি সামাজিক সংজ্ঞায় সংকীর্ণ হওয়ার বাসনা নেই তাঁর চরিত্রে। এমন যে বন্ধু, সামাজিক হয়ে-ও তিনি সন্ন্যাসী—ধরেও তাঁকে পারি নে ধরতে ; আবার বৈরাগী হয়েও তিনি প্রেমিকসুন্দর, রাগ করেও পারি নে ভুল বুঝতে। শিল্পের রহস্যকথা এই বন্ধু-ই বোঝেন, অন্যে নয়। বন্ধুসাধনায়

সিদ্ধ আত্মাই শিল্পী, অন্য যারা, শিল্পীর ছদ্মবেশে তারা অন্য কিছু করে, শিল্প করে না, করতে পারে না—পারে না যে, তা জানে-ও না।

বুকটা গুর গুর করে' উঠল অতর্কিত আতঙ্কে।—শিল্পপথে নেমে ভালো কি করেছি? বন্ধুমানসের মহিমাটি অক্ষুণ্ণ রাখা কি সম্ভব?

যুক্তির প্রাখর্যে তীক্ষ্ণ হ'ল মন। শিল্পের প্রয়োজনে অন্তর্জীবনে সন্ন্যাসী হতে হবে (শো-কল্পিত 'বন্ধু'র সঙ্গে প্রাচীন সন্ন্যাসীদের তফাৎ যে কী—তা তো মাথায় এখনও ঢুকছে না।)—এ আবার কেমনতর কথা, এমন কথা, এমন অবাস্তব, অনাধুনিক কল্পকথা মানবে কে?

—যদি না-ই মানি ক্ষতি কি?

জিজ্ঞাসা করেছিলাম শো-কে।

—ক্ষতি কি?

বলেছিলেন শো ধীর গাম্ভীর্যে:

—ক্ষতি এই: বন্ধু-চেতনা প্রেমজীবনের যে সুপ্ত সম্ভাবনাগুলি শিল্পের ঔজ্জ্বল্যে প্রকাশ করতে পারতো, সেগুলি চেতনার অভাবে অপ্রকাশের অন্তরালেই থেকে যাবে চিরকাল। পুরুষ পুরুষের বন্ধু, নারী, নারীর—এটা আমরা বুঝতে পারি; কিন্তু নারী-পুরুষের স্বাভাবিক বন্ধুত্ব আজ পর্যন্ত যে সম্ভব হ'ল না, তার কারণ আমাদের শিক্ষা ও সংস্কৃতি দেহের বন্ধন থেকে মনটাকে মুক্তি দিতে পারে নি এখন-ও। এই মুক্তির পথে সন্ন্যাসীরা মানুষের মনকে টেনে নিতে যে চেষ্টা করেননি, তা নয়; কিন্তু মনকে মুক্ত করতে গিয়ে দেহটাকে তাঁরা বিড়ম্বিত করলেন নানাভাবে, ফলে ভারসাম্যের অভাব ঘটল, উল্টো ফল ফললো সমাজে। আজ আর সন্ন্যাসী নয়, প্রিয়বন্ধু, আজ সত্যকারের বন্ধু হতে চাই জীবনের সাধনায়। এই সাধনায় শিল্পের মুক্তি—সমাজের-ও। আধুনিক সমাজে নারী ও পুরুষ একসঙ্গে মিলছে, মিশছে, খেলছে, পড়ছে, কাজ করছে। যতদিন যাবে, আরো করবে। এমন-ও হবে, আজ-ই হচ্ছে, আরো হবে—কাজের খাতিরে বিবাহিত পুরুষ আসবে বিবাহিতা কোনো নারীর সহকর্মী

হয়ে, কখনও বা সহমমী হয়ে। বলতে কি চাও—তারা বন্ধুপ্রেমের মর্যাদা জানবে না,—একটু ভাব, একটু ইঙ্গিত, একটু আসক্তি একটু মোহ যেই হবে—অমনি তারা নেমে আসবে স্ত্রী-পুরুষের গতানুগতিক 'তুচ্ছতায়'—আর সেই নেমে আসাটাই হবে বাস্তব? লজ্জাহীন এই বাস্তবের কঠিন বন্ধন থেকে যদি পরিত্রাণ নেই—তবে মানবসমাজের মুক্তি-ও নেই, নবতর কোনো শিল্পপ্রত্যয়ের সম্ভাবনা-ও নেই মানুষের চেতনায়!

মনে মনে শো-র কথাগুলি বারংবার আবৃত্তি করলাম। আশ্চর্য, তাঁর কথাগুলি এমনি সমাহিত হয়ে শুনে গেছি, যে একবার শোনামাত্র সেগুলি মুখস্থ-ই হয়ে গেছে যেন। মনে হ'ল কতদিন, কতরাত একসঙ্গে এমন কথা আমরা দুজনে বলেছি, বিনাপ্রতিবাদে নিয়েছি মেনে, বিনা-দ্বিধায় চলেছি কত দূরে—কত দূরতম পথে, হাতে হাত রেখে। আজ আবার বিধাতার আশীর্বাদে একত্র এসে মিলেছি, পুনরাবৃত্তি করছি প্রাচীন তত্ত্বের, আকুপাকু করে' বলতে চাইছি: তুমি হও আমার শিল্পের বন্ধু, দাও প্রেরণা, দাও স্বপ্ন, দাও ভাবঘন হৃদয়গহনের অনির্বচনীয় রসচেতনা—যার প্রকাশমাত্র অমর হবো ইহজীবনে। মানুষ মরতে চায় চাক, আমি চাই না মরতে। মৃত্যুর যন্ত্রণা পেয়ে অস্তিত্বের অবসান ঘটানোতেই যার শান্তি—মানুষ তার নাম। সে যুদ্ধ চায়, জয় চায়, পাপ চায়, প্রভুত্ব চায়। চায় চাক, আমাকে দাও মুক্তি। মানুষের জীবনগোপনে প্রসন্ন যে সুন্দর সত্তা মৃত্যুর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে অহরহ, তোমাকে দেখে আমি যেন তার সন্ধান পাই। শুধু মানুষ নয়, শিল্পী হতে চাই জীবনে। হাত ধরে আমাকে তুলে নাও। নেমে-থাকার পথে রোমান্স নয় অন্তহীন। মৃত্যুহীন রোমান্স আছে উঠে-আসার আনন্দে।

ভাগ্য ভালো, পথ শুধু নয়, পথের সঙ্গিনী-ও মিলল। কথাটি ভাবাতিশয্যে প্রকাশ না করে' পারিনি। শুনে হেসেছিলেন শো। তারপর চেয়ার ছেড়ে উঠতে উঠতে:

—আপনার কাছ থেকে যা পেয়েছি তা-ই তো নিবেদন করে' গেলাম, প্রিয়বন্ধু?

—আমার কাছ থেকে ? কী আমি দিয়েছি আপনাকে ?

—নিজেরি অজ্ঞাতসারে কখন কাকে কী দিয়েছেন, দিয়ে থাকেন, শিল্পী কি তার হিসাব পারেন রাখতে ? আকাশের চাঁদ কি জানে কত ফুল তার আলো পেয়ে ফোটে ?

—এ-সব কী বলছেন !

—না কিছুই বলছি না,

বলে' হাসলেন শো :

—কবে আসছেন বলুন,

ঘরের পার হতে গিয়ে হঠাৎ ফিরে দাঁড়িয়ে দরজায় পিঠ রেখে বললেন শো :

—কবে আসছেন ?

—সু-র সঙ্গে যাবো একদিন !

শো অকারণে হেসে উঠলেন বালিকার চাপল্যে :

—সু এর সঙ্গে না হলে পারেন না যেতে—সু আপনার 'বডিগার্ড' নাকি ?

—বডিগার্ড-ই বটে !

বলতে গেলাম পরিহাসচ্ছলে।

—ছি !

শো বললেন চোখে বয়স্থা দিদির গাম্ভীর্য জ্বালিয়ে :

—পুরুষমানুষকে কোনো গার্ডের অধীনে থাকতে নেই !

শো-কে তাঁর গাড়ী পর্যন্ত পেঁৗছে দিয়ে ঘরে এসে বসলাম নিস্তব্ধ। ...তারপর কেটে গেল কতক্ষণ, কখন সন্ধ্যা এল, গেল, বাড়ীর সমস্ত ঘরেই আলো জ্বলে উঠল একে একে, কিন্তু আমার এই ঘরে আলো জ্বালতে, কেন কী জানি, ইচ্ছা হ'ল না—নাকি আলো যে জ্বালতে হবে সে-খেয়াল-ও আমার তখন ছিল না ? কী এক অপরূপ ভাবাবেশের আনন্দে অন্ধকারের সঙ্গে একাত্ম হয়ে বসে থাকতেই আমার ভালো লাগল।...কবিরা গান লেখার পূর্ব মুহূর্তে আনন্দময় যে-ভাবচেতনায়

আত্মমগ্ন হয়—তা কি এই? এই ভাবপুলকের ধারাজলেই কি 'প্রেমের অভিষেক'? এই আনন্দবিলাসের চেতনকমলে চরণ ফেলে হেসে ওঠে 'মানসসুন্দরী'?

—কি করছিস্ রে, অন্ধকারে বসে?

দাদু ঘরে এসে আলো দিলেন জ্বালিয়ে। আলোয় বুঝি স্বপ্ন পালায়? কিংবা চমকে আঁতকে ওঠে সমাহিত মন?

—আলো জ্বালিস্ নি কেন রে?

—এইমাত্র জ্বালবো ভাবছিলাম দাদু!

—তা অন্ধকারেই ধ্যান ভালো জমে।...মেয়েটি কে এসেছিল দাদু!...

এতক্ষণে স্বপ্নের ঘোরটা বুঝি কাটল। বললাম:

—ওঁকে তুমি দেখেছ দাদু। ছবিতে। খুব নামজাদা আর্টিষ্ট।

—খুব ভাব বুঝি?

—আজ-ই মাত্র আলাপ হ'ল।

—একদিনেই এত কথা!...বেশ!

—আমার ছবির একজন এ্যাড্‌মায়রার।

—হয়েছে!

– কী হয়েছে দাদু?

—না, কিছু হয় নি!

— × × ×

—তোর বাপের অনেক টাকা আছে জেনেছে তো?

—দাদু, তুমি নাস্তিক!

—হয়েছে! একদিনের আলাপেই মুগ্ধ, স্তব্ধ! নিশ্চয়ই মেয়েটিকে দেবী বলে' মনে হচ্ছে?

— × × ×

কিছু না বলে' শুধু হাসলাম। দাদু হঠাৎ গম্ভীর হলেন! তারপর উদাসীন ভঙ্গীতে:

—তোমাকে কোনো কাজেই বাধা দিই না বু, বড় হয়েছ, একটু সাবধানে চোলো!

মাথা নিচু করে' বসে রইলাম কথার জবাব না দিয়ে।...দুপুর থেকে প্রায় সন্ধ্যা পর্য্যন্ত একজন নারীর সঙ্গে গল্পগুজব আর হাসাহাসি করে' কাটালাম, দাদু এটা ভালো চোখে দেখেন নি—তা বোঝা এমন কঠিন হ'ল না। কিন্তু দাদুকে কেমন করে' বোঝাই—অনিন্দ্যসুন্দরী এই রমনীর সম্মুখে বসে, তাঁর সঙ্গে মন খুলে কথাবার্তা বলে', এমন কি কখন-ও বা তাঁকে স্পর্শ করেও মুহূর্তের জন্য-ও আমি তুচ্ছ কোনো মন্দ মনোভাবে আচ্ছন্ন হয়ে-পড়ার চাপল্যই অনুভব করি নি। এমন কি (এ-কথা দাদু বুঝবেন না, বোধকরি কেউ-ই চাইবেন না বুঝতে) শো যে নারী এবং আমি পুরুষ, এ-ভাবটা এখনই যেমন যৌবনবোধের চেতনায় এসে স্পর্শ করছে, তখন তেমন করে-ই নি। বোধ করি বন্ধুপ্রেমের স্বরূপটাই এই।...বন্ধু, যথার্থ বন্ধু—আত্মার মত অশেষ, অনন্ত। বিশেষ কোনো জাতির স্বাতন্ত্র্যে সে নয় বিশেষিত: নয় সে নারী, নয় পুরুষ। সে প্রেম। সে কল্যাণ। সে অননুভূত ভাবদিব্যতার মহতী প্রেরণা। সে সুন্দর।

—মেয়েটি খুবই সুন্দর। নয়?...বেশ!

দাদু বললেন শান্তছন্দে। খুব খারাপ লাগল। মনে হ'ল—এর চেয়ে কঠিন ভৎ‍র্সনা আর বুঝি হতে পারে না কিছু। মরীয়া হয়ে উঠল মন। কিন্তু না, কার সঙ্গে আমি কথা বলতে যাচ্ছি আমি জানি। নির্বাপিত অগ্নির প্রচ্ছন্ন উত্তাপের মত সমাহিত আমি দাদুর মুখের দিকে মুখ তুললাম। একটু থেমে থেকে হঠাৎ কী যেন বলতে চেয়ে অসহায়ের মত কী একটা বলে বসলাম। বললাম দাদুর কোলের কাছে এগিয়ে এসে:

—আমাকে শাস্তি দাও দাদু!

—শাস্তি পাওয়ার মত কিছু তো করো নি ভাই!

মুহূর্তে আমার সমস্ত ক্রোধাভিমানকে স্তব্ধশীতল করে' দিয়ে তেমনি শান্তগাম্ভীর্যে দাদু বলে গেলেন:

—মেয়েদের সঙ্গে মিশলেই ছেলেরা মন্দ হয়ে যায়—এ-ভাব আমি ভাবি না দাদুয়া।...বরং এই ভাব-ই সত্য বলে' জানি—ভালো মেয়েরা ছেলেদের ভালোই করে, যেমন ভালো ছেলেরা মেয়েদের ভালো না করে' পারে না।

— × × ×

—ছবিতে যখন নেমেছ, মেয়েদের সঙ্গে তো মিলতেই হবে, মিশতেই হবে। তবে ভালো-মন্দর জ্ঞানটা তো থাকা চাই?

বলতে বলতে দাদু এগিয়ে গিয়ে দক্ষিণদিকের জানালাটা হঠাৎ বন্ধ করে' এলেন। তারপর:

—এ-ঘরটায় কি করে' থাকিস্ শান্ত হয়ে? ধ্যান হয় এই ঘরে? দিনরাত রেডিও-র চিৎকার। মেয়েমানুষের গান তো নয়, যেন চিলের চিৎকার!...তা মেয়েটি অভিনয় করে ভালো।...থাকে কোথায়?

—বালিগঞ্জে।

—বেশ!... তা ছবির মেয়েদের, জানিস দাদু, আমার বিশ্বাস হয় না। বাইরে যত সুন্দর, ভেতরে তত কুৎসিত!...ওই তোদের লড়নেওয়ালা ডাকাত মেয়ে নি কালরাতে কী কাণ্ড যে করলে!...পড়েছিস!

পড়েছি! কাগজে বেরিয়েছে ব্যাপারটা। ফলাও করে লিখেছে কাঁচাবয়সী কোনো স্মার্ট সাংবাদিক। নাকি মদ খেয়ে নি কোথায় মুখ গুঁজে পড়েছিল। লোকজন জড় হয়ে গেছল তার চারপাশে। ডাকাত মেয়ে বলে' চিনতে-ও পেরেছিল কেউ কেউ। কেউ-বা তাই:

—বক্সিং লড়বে ডাকাত মেয়ে?

বলেছিল এগিয়ে এসে। কেউ-বা আবার:

—মারো না মাইরী দুটো আল্‌তো ঘুষি, মার খেয়ে আনন্দে মরে যাই!

—ভাগো! হিঁয়াসে উল্লু সব!

নি নাকি বলেছিল খেঁকিয়ে, খিঁচিয়ে। সঙ্গে সঙ্গে বেজে উঠেছিল পঁচিশ-ত্রিশ জোড়া হাততালি। দূর থেকে টুপটাপ করে' ঢিল পড়তে-ও সুরু হয়েছিল একটি দুটি। একটা বুঝি নি-র গায়েও লেগেছিল। তারপর পুলিশ আসতে—

দাদু বললেন :

—ভাগ্যে সেইসময় জরুরী একটা কাজে সে পথ দিয়ে যাচ্ছিলাম। নইলে মেয়েটার হাজতবাস হ'ত। এই তো তোদের ছবির সুন্দরীরা—

—সবাই এ-রকম নয় দাদু।

—হয়তো নয়। একটাকে দেখে সকলকে বিচার করতে চাই নে। ভালো থাক সবাই, ভালো হক—তাহলেই ভালো।

—তুমি যেন একটু রাগ করেছ দাদু!

—রাগ কেন রে?

—ভাবছ, আমি ক্রমশঃ মন্দ হয়ে যাচ্ছি!

—তাই যদি ভাবি?

—আর যাতে তা না ভাবো, সেইভাবে চলবো!

— × × ×

—আমি কিন্তু কোনো অন্যায় কাজ করি নি দাদু। মেয়েটি বিনা নিমন্ত্রণে হঠাৎ এসেছিল!...

—এলেই বা দাদা। এতে সংকোচের কী আছে। মানুষ মানুষের কাছে আসবে, এটা তো দোষের বলি নে।

—হ্যাঁ দোষের,

সাহস পেয়ে দাদুর কাছে অভিনয় সুরু করলাম এইবার :

—বিশেষ দোষের। মেয়েটি বিদুষী। গ্র্যাজুয়েট। দেশ-বিখ্যাত আর্টিষ্ট। আমি জানি তিনি অত্যন্ত উচ্চস্তরের মহিলা। তবু তো তাঁকে সহজভাবে তোমার কাছে নিয়ে যেতে তো পারলাম না! বলতে পারলাম না : এই দ্যাখো দাদু, আমার বন্ধু, নূতন বন্ধু।

—জিত্,

কৌতুকভরে দাদু একবার চোখ বোজালেন। দাড়িটায় হাত দিয়ে :

—চতুর বটে। আচ্ছা জিত্!

তারপর সুর বদলে হঠাৎ গম্ভীর হয়ে :

—বড় হয়েছ, কষ্ট না পাও ভুল করে'—এইটাই আমি চাই দাদুমা!...

ঢঙ ঢঙ্ করে দশটা বেজে গেল দেওয়াল ঘড়িতে। রাত দশটা। ফোটোগ্রাফীর ওপর একটা প্রবন্ধের খসড়া প্রস্তুত করছিলাম—আচমকা মনে হ'ল টেলিফোনে কার বুঝি ডাক এল।

টেলিফোনে ডাক অবশ্য কয়েকটা এল। একটা 'ন্যাশন্যাল ফিল্ম্স্'এর বড় কর্তার চেম্বার থেকে, একটা 'ফিল্ম্ বেঙ্গল'এর এডিটরের ডেস্ক থেকে, আর একটা কোন্ এক অনামিকা অনুরাগিনী 'ফ্যানের' অলস মুহূর্তের দীর্ঘ নিঃশ্বাস থেকে।—স্বাক্ষরযুক্ত একখানি ছবি চাই। আর যদি দয়া হয়, একখানি চিঠি!

হোপ্‌লেস! শো এখন বোধ হয় গানে মত্তা কিংবা গল্পে বিভোরা। কিংবা হয়তো ভ্রমণরতা সু-এর সঙ্গে, গৃহে প্রত্যাগতা নন এখনও!

—ক্রিং, ক্রিং, ক্রিং

বুকের ভেতরটা আচম্বিতে নেচে উঠল ক্রিং-এর ছন্দে তালে। তাড়াতাড়ি রিসিভারটা তুললাম।

—ইয়েস্।

—মিঃ শিবশংকরের বাড়ী?

প্রত্যাশার নৃত্যচাপল্য থেমে গেল অপরিচিত কণ্ঠস্বরে। জিজ্ঞাসু নারী বটেন, কিন্তু শো নন।...শিবশংকর আমার দাদুর নাম। বললাম:

—আজ্ঞে হ্যাঁ। তাঁরই বাড়ী।

—তাঁর সঙ্গে দুটো কথা বলতে পারি?

—দুঃখিত। তিনি এখন শুয়েছেন।

—ও!

—আপত্তি না থাকে বলার কথা আমাকে বলতে পারেন।

—আপনি?

—তাঁর নাতি।

—আপনি ব্ব ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ,......হ্যালো...

অদ্ভুত। কথা বন্ধ করে ফোন ছেড়ে দিলেন আহ্বায়িকা! দাদুর সঙ্গে কী এমন গোপন কথা বলতে এলেন যা আমাকে জানানো যায় না? আমার নাম শোনামাত্র কানেকসন ছিন্ন করলেন,—তবে বঙ্গদেশে এমন মহিলাও আছেন আমার সঙ্গে যিনি বাক্যালাপ পর্যন্ত করতে চান না?......যাই, খিদে পেয়েছে।

—ক্রিং ক্রিং ক্রিং

ভালো আপদ তো।

—ব্ বাবু?—সেই মহিলাটিই এসেছেন আবার।

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—খবরের কাগজে আজ আমার সম্বন্ধে যা তা কী সব লিখেছে দেখেছেন বোধ হয়?···আমাকে তো আপনি আমলই দেন না, যেখানে সেখানে নিন্দা করেন বলে শুনি। এখন বোধ হয় ঘৃণাও করছেন?

—নিন্দা করি? ঘৃণা করছি?

কে এই ভদ্রমহিলা? নি?

—আপনি কে?

—ছেলেবেলাকার ল!...মনে আছে?

— × × ×

—মনে অবশ্যই আছে, শুধু ভুলবার ভান করছেন। অবশ্য ভোলাই ভালো। এখন জগতটা চলছে কেমন?

—ভালো!

—সুখী হলাম।...এখন তো আপনি শো-তে?

—কী বলছেন?

—বি-র সঙ্গে কি ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল?...শুনতাম তো বি-তেই আপনি এনগেজড!

—এইসব সস্তা গুজবে আপনি-ও কান দেন?

—যাক।...আপনাদের গোপন ব্যাপারে অনধিকার প্রবেশ কেন করবো। তবে কি না—যাক।...কী করছেন এখন ?

কথা কইতে আর ভালো লাগল না। অনিচ্ছাসত্ত্বেই উত্তর করলাম :

—লিখ্‌ছিলাম। এইবার উঠবো ভাবছি।

—আপনার দাদু গতকাল আমার কী উপকার যে করেছেন। ভাবলাম নিজে গিয়ে তাঁকে একবার ধন্যবাদ জানিয়ে আসি। তা' সারাদিনের মধ্যে একটু ফুরসৎ হ'ল না।...ভক্তদের ভালবাসার চাপে, মশায়, মরে গেলাম।

—আপনি একজন পপুলার আর্টিষ্ট্‌!

—থাক। হয়েছে। আপনার মুখে ওটা শোনায় না ভালো। আপনি আড়ালে আমার নামে কি সব বলেন আমি কি শুনি না ভাবেন ?

— × × ×

—মিঃ শিবশংকরকে আমার কথা বলবেন তো ?

—বলবো। নমস্কার।

—ও কি ! ফোন ছেড়ে দিচ্ছেন ? শো-কে এত শীগ্‌গীর ছাড়তেন ?

বড় খারাপ লাগল। কিন্তু শো-র সঙ্গে আমার সাম্প্রতিক বন্ধুত্বের কথাটা এরি মধ্যে বাজাররাষ্ট্র হয়ে গেছে তাহ'লে ?

—চুপ করে' আছেন যে ?...সু-বাবু কি বলেন জানেন, আপনার সঙ্গেই শো-র সম্বন্ধটা নাকি পাকাপাকি হয়ে গেছে ?...কথাটা সত্যি ? অবশ্য আপনাদের পাকাদ্যাখার ব্যাপারে আমার কোনো বিশ্বাস নেই।

অসভ্যতারও একটা সীমা আছে। নি দেখছি একেবারেই লজ্জাবিহীনা। সামাজিক কথা বলতে-ও ভুলেছে। বললাম বিরক্ত হয়ে :

—এ-সব কী বলছেন ?

—কিছুই বুঝতে পারছেন না, না ?...সু-বাবু আপনাকে যত-ই মন্দ বলুক, মিঃ ব্, শো-কে গ্রহণ করলে আমি আপনার প্রশংসা-ই করবো।... উইস্‌ ইট গুড্‌ লাক...সু-কে আমি কি প্রত্যাশা করতে পারি ?...বেচারা সু, জলের মত টাকা খরচ করছে শো-র জন্যে...

ফোন ছেড়ে দিলাম। ঘৃণায় তিক্ত হয়ে গেল মনটা।...খাবারের ঘর থেকে ডাক এল। না, মনের শান্তির সঙ্গে পেটের ক্ষিদেটাও বুঝি উধাও হ'ল।......

সারাটা রাত আবোল-তাবোল কত কী যে ভাবনা এল মাথায়। পরদিন সকালবেলা স্নানাদি সেরেও মনটা তেমন প্রসন্ন যেন হ'ল না। দুশ্চিন্তা জাগল, এই বুঝি নি এসে বাড়ীতে হানা দেয়। ঈশ্বরের কাছে কামনা করলাম ঃ ভক্তদের ভালবাসায় স্পর্শে পুলকিত তিনি জন্ম-জন্ম থাকুন আত্মবিস্মৃত ঃ এ-দীনকে আর যেন কখন-ও তাঁর মনে না পড়ে।... মিঃ শিবরাজকে, তাঁর হয়ে একবার কেন, দশবার ধন্যবাদ জানিয়ে দেব, স্বশরীর একবার আসা উচিত—এ-সৌজন্যে কখন-ও যেন তাঁর নারীহৃদয়কে তাড়িত না করে!

ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, আমার কাতর কামনা তাঁর কানে গেল, নি এলেন না, সাত সাতটা দিন কাটল, কী বিচিত্র, যেন দুঃস্বপ্নে কাটল, সকাল-দুপুর-বিকাল-সন্ধ্যা—সকল সময়েই বাড়ীর কাছে কোনো গাড়ী এসে দাঁড়ানো মাত্র প্রায়ই আঁত্‌কে উঠে ভাবতে হল ঃ এই বুঝি এলেন, যাক, এলেন না।

কিন্তু সু-ও তো এল না একদিনের জন্যে। শো-রই বা হ'ল কি—সাতদিনের মধ্যে একবার মাত্র ফোন করেছিলেন গতকাল সন্ধ্যায়, তা-ও আবার ব্যক্তিগত দু' একটা ঘরোয়া কথা বলার জন্যে বা জানার জন্যে।—সু তাঁর কাছে আর যায় না, মদ খেয়ে যেখানে-সেখানে নাকি পড়ে থাকে! বাড়ীতে ফোন করে' কোনো সাড়া-ই মেলে না, পত্র দিয়েছিলেন শো, সু নাকি রেগে দিয়েছে ফিরিয়ে।

—কী হবে বলুন তো?

উদ্বিগ্ন হয়ে প্রশ্ন করেছিলেন শো। একটু থেমে আত্মগতভাবে আবার ঃ

—কেন যে সেদিন আপনার কাছে হঠাৎ যেতে গেছলাম!

—সেই নিয়ে আবার গোলমাল হয়েছি বুঝি ?

—হওয়ার কথা-ই। আপনার সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব সে যখন পছন্দ করে না, তখন তো আমাকে...

বলতে বলতে শো থেমে গেলেন অকারণে। হৃদয়ের মধ্যে অহেতুক একটা বেদনাঘাতের মৃদু স্পর্শ বুঝি অনুভব করলাম। সংযত সুরেই অবশ্য বললাম:

—আমার জন্যেই যখন আপনাদের মধ্যে এমনতর অশান্তি ঘটেছে—তখন আমার সম্পর্ক অবশ্য না-রাখাই সঙ্গত।

—একটু খোঁজ নেবেন—কোথায় সে যায় ? শুনেছি নাকি নি-র বাড়ীতে তার আড্ডা হয়েছে ?

ভেসে এল উদ্বিগ্ন জিজ্ঞাসা। পা থেকে পৃথিবীটা অবশ্য সরে গেল না, কিন্তু মূর্খ সু কাকে ছেড়ে কাকে নিয়ে মাত্‌তে যাচ্ছে—যতবার এটা ভাবলাম, ধিক্কার জাগল মনে। কী একটা রহস্যময় অভিমানের সূক্ষ্মতায় গহনহৃদয় হ'ল গম্ভীর, উদাসীন।...

সু-কে ফোনে ডাকলাম। রাসকেলটার সঙ্গে বোঝাপড়া করা দরকার।... বেলা আটটা তখন।

—সু আছ ?

—কে র !...আরে, এইমাত্র ঘুম থেকে উঠ্‌ছি। ব্যাপার কী ?

—বলি, কী হয়েছে তোমার ? আসো না কেন ?

—এসে কী হবে ?

—মানে ?

—মানেটা আর জেনে কাজ নেই বন্ধু। মানে মানে সরে যেতে চাই—গেলেই বাঁচি।

—তোমার কথা বুঝতে পারছি না সু !

—এত ভণ্ডামীও করতে পারো বৎস !...ভালো !

— × × ×

—তা কী কারণে অধমকে আহ্বান করেছ, বলে' ফ্যালো!

কানেক্‌সন্‌ কেটে দিলাম। মনটা ভারি হয়ে উঠল। অন্যমনস্ক বসে রইলাম অনেকক্ষণ।...অকারণেই বুঝি রিসিভারটা হাতে নিলাম আবার। শো-কে ডাকলাম। পেলাম না। কোথায় বেরিয়েছেন—বলতে পারল না কেউ।

হঠাৎ কি জানি, কেন, টেলিফোন গাইডটা দেখতে আর টাইম টেব্‌লটা পড়তে কেমন যেন ভালো লাগল।

ঘণ্টাখানেক কাটল অন্যমনস্কতায়।—আত্মরচিত অন্ধকূপে বসে বসে কী ভাবে যে সময় খরচ করছি প্রত্যহ। জগতে সবাই কর্মব্যস্ত—আমি-ই শুধু নিস্তব্ধ বসে আছি ভাবোন্মত্ত—ও-বাড়ীর ছাদে রোদে পুড়ে মিস্ত্রীগুলো কাজ করছে; রাস্তায়, ওই তো দেখতে পাচ্ছি পিচ ঢালছে মজুরদল, রিক্‌সাওয়ালা ওই তো চলে গেল ঘণ্টা বাজিয়ে।

জানালার ধারে এসে একবার দাঁড়ালাম। বাইরের জগতটাকে কী আশ্চর্য একবারো যেন চেয়ে দেখি না। দেখি না বলেই বুঝি মন এমনি কর্মহীন ভাবে ভারাক্রান্ত? শিল্পী নাকি শুধু মন? দেহ নয়?—হাত নেই, পা নেই? শুধু মস্তিষ্ক আর হৃদয়ের নাম শিল্পী?—হাত নেই, বাটালি ধরতে পারো, কুঁদে বার করতে পারো মানসপ্রতিমা? পা নেই, পার হতে পারো দুর্গম অরণ্য—আবিষ্কার করতে পারো ঐতিহাসিক স্বপ্নরাজ্য?

'বোম্বাই চাদর' বলে হেঁকে গেল ফিরিওয়ালা। 'চিঠি আছে' হাঁক দিল ডাকপিওন। 'বাঁধ্‌কে' বলে বাসে উঠল তরুণছাত্র। 'চাকুরী চাই' বলে গর্জে গেল বেকার মিছিল।—সবাই চলল, চলল আর চলল। আর আমি চিত্রাকাশের উজ্জ্বল সূর্যতারকা, "আপনারে শুধু ঘেরিয়া ঘেরিয়া" অহরহ মরলাম ঘুরে।

নাঃ! নূতন ছবির কাজ সুরু হলে যেন বাঁচি। চিত্র-শিল্পীর জীবনটা যেন বাঙলাদেশের চাষীর জীবন। কাজ আছে তো চলো মাঠে,

বীজ ফেলো ধান কাটো। না থাকে দেহ ঢালো আলস্যে, জাবর কাটো, ভ্যারাণ্ডা ভাজো।

অন্য কোনো কাজ নেয়া চলে না? যাই দাদুর কাছে। উঠলাম।

—ক্রিং ক্রিং ক্রিং।

আবার কে?—মরুক গে। ডাকুক যত পারে। ঘরের বার হয়ে এলাম একগুঁয়ের জেদে। বারাণ্ডায় এসে দাঁড়িয়ে রইলাম বেশ খানিকক্ষণ। ডেকে ডেকে, কেঁদে কেঁদে, সেধে সেধে ক্লান্ত হয়ে থামল হৃদয়হীন নির্লজ্জ যন্ত্রটা। কানের সঙ্গে প্রাণটাও আশ্বস্ত হ'ল যেন। কিন্তু না, একটু থেমে, ওই যে আবার, আবার চেঁচিয়ে উঠল, বুঝি ককিয়ে উঠল :

—ক্রিং ক্রিং ক্রিং।

—কে ডাকে?

এসে প্রশ্ন করলাম, বিরক্ত।

—বৃ? আমি সু। এতক্ষণে কোথায় ছিলে ভাই?

সু-র কণ্ঠস্বরে যেন মধু ঝরল :

—কোথায় ছিলে ভাই?

—এখানেই ছিলাম।

— × × ×

—সু বলছেন, আপনি তার ওপর খুব রাগ করেছেন।

এ কী শো-র গলার স্বর যে।

—আপনি ওখানে কখন এলেন?

—বোধ হয় ঘণ্টাখানেক হ'ল।

—সকলেই এসেছে, ভাই বৃ, এসেছে আমাকে বেঁধে নিয়ে যেতে!—বলছি বৈকালে যাবো, শুনছে না।

—তা বলছেন যখন, যাও না।

—কাজকর্ম কিছু নেই, ওখানে গিয়ে পড়ে থাকলেই হবে?

—তোমার-ও কাজকর্ম আছে?

—তুমি-ও বলছ! তবে তুমি-ও এসো!

—আমার যাওয়া নিষেধ।

—নিষেধ? দাদুর?

—না। শো-র।

— × × ×

—শো বলেন, তাঁর ও আমার সম্বন্ধে যেখানে-সেখানে যা-তা তুমি রটিয়ে বেড়াচ্ছ।—এখন আমাদের মধ্যে পরস্পরের দেখা-সাক্ষাৎ একেবারে বন্ধ হওয়াই সঙ্গত।

—তাহ'লে আমি নিশ্চিন্ত বলো!

কৌতুক করতে গেল নির্লজ্জ সু। বুঝল না শো এবং আমাকে পরোক্ষভাবে এতে কী অপমানটাই করা হ'ল। নীরব হয়ে রইলাম।

—তাহ'লে শো-র পথে আর এ-জীবনে নয়, কেমন?

— × × ×

—সে কি? সত্যি আর আর আসবেন না কোনদিন?

শোনা গেল শো-র কণ্ঠস্বর।

—মনে মনে বারংবার আসবো জানবেন।

—বাইরের লোকে কে কি বলল সেটাকেই প্রাধান্য দেবেন?

—না দেওয়াটাই নির্বুদ্ধিতা। তাতে 'বাইরে'-টা তো যায়-ই, উগ্র বাইরে-টার আক্রমণে 'ভেতর'-টাও উদ্বিগ্ন হয়ে যাই-যাই করে!

— × × ×

—আপনি সুখী হ'ন—এই আমার শুভেচ্ছা।

— × × ×

—কী এমন বললে হে, শ্রীমতীর আঁখিকমল যে জলে টলমল করল।—সত্যি তাহ'লে আসবে না আর?

—আসা-যাওয়ার কথা বাদ দাও সু, একটা কথা বলি, শোনো। পারো তো মেনো, তোমারই ভালো হবে: আমার ওপর রাগ করে' বা ঈর্ষা করে' শো-র সামাজিক মর্যাদাটা ক্ষুণ্ণ করো না।

—ক্ষুণ্ণ করেছি ?

—ক'রো নি কি ?

—হ্যাঁ, করেছি। কিন্তু করেছি বলেই তো ফিরে পেয়েছি !

—সুখী হও, সু, এই আমার শুভেচ্ছা। কিন্তু জোর করে কিংবা কৌশল করে' ফিরে পেতে চাও বলেই কষ্ট পাও, কষ্ট দাও—এটা মনে রেখো।

—রু, বন্ধু !

আর কথা বাড়াতে ইচ্ছা হ'ল না। রিসিভারটা তুলে দিলাম যথাস্থানে। মাথাটা কেমন ধরা-ধরা মনে হ'ল। চেয়ারে বসে থাকতে ভালো লাগল না। বিছানায় এসে পড়ে রইলাম চোখ বুজিয়ে। খানিকক্ষণ পড়ে' আছি নিস্তব্ধ হয়ে, চমক ভাঙল দাদুর স্পর্শে।

ঘরে তিনি কখন এসেছেন, জানতে পারি নি। বলছেন :

—অসময়ে শুয়ে আছিস্ কেন রু ? শরীর খারাপ হয়নি তো ?

—তেমন কিছু হয় নি দাদু। মাথাটা একটু ধরেছে।

দাদু চিন্তিত হয়ে কাছে এলেন এগিয়ে। গায়ে হাত রাখলেন মায়ের স্নেহে। কোলের কাছে বসলেন এসে। উঠতে যাচ্ছিলাম শুয়ে থাকতে বললেন ইঙ্গিতে। তারপর :

—সকালের ডাকে তোর মায়ের একটা চিঠি পেলাম রু। বেটী আগামী রবিবারে আসবে লিখেছে।

—মা আসছে ?

উল্লাসে উচ্ছ্বাসে আমি ধড়মড়িয়ে উঠে বসলাম :

—কই দেখি মা-র চিঠি !

—বেটী দুষ্টুর একশেষ। চিঠি দেখাতে মানা করেছে।

—কেন ?

—অনেক লুকোনো কথা আছে তাতে।

—লুকোনো কথা ? নিশ্চয়ই আমার সম্বন্ধে ?

—ঠিক।

—তুমি সেই লুকোনো কথা আমার কাছে ফাঁস করতে এসেছ ?

—বিলকুল ঠিক।

—চিঠিতে কী আছে বলতে পারো তাঁর চিঠিখানি দেখাতে পারো না।

—বেটী বলেছে চিঠি দেখিয়ো না। বলে নি তো—বু-কে কথাগুলো ব'লো না।

হাসতে লাগলাম।

—বেটী জানিয়েছে, গুরুদেব কলকাতায় নামছেন আসছে মঙ্গল কি বুধবার।...তাঁর যত্নআদর এবং হোমযাগযজ্ঞের তো উচিত মতো ব্যবস্থা করতে হবে ?

দাদুর মুখের দিকে হাঁ করে আমি নির্বোধের মত তাকালাম। আমাকে নাকি সেই ব্যবস্থাসভার কর্তা করা হবে কৌশলে ?

—তোর মা তোকে নাস্তিক বলে' জানে। ইংরেজী শিখে আর ছবির রাজ্যে ঢুকে তুই একেবারে নয় হয়ে গেছিস্। তার ভয় এইঃ গুরুদেবকে অপমান না করিস্, হয়তো সম্মান দেখাতে চাইবি না তেমন করে'।

— × × ×

—তোর মার কী যে সব ধারণা! লিখছে ঃ গুরুদেব যেদিন আসবেন, যে-কদিন থাকবেন, বু-কে কোনো কাজ দিয়ে ক'লকতার বাইরে রাখলে কেমন হয় ?

মা লিখেছে এই কথা ? বিদ্যুৎবেগে আমি দাঁড়িয়ে উঠলাম কিছু চিন্তা না করে। অভিমানে অন্ধকার হ'ল মন।

—আমি আজ-ই বাইরে কোথাও চলে যেতে চাই।

একটু থেমে ঃ

—কিছুক্ষণ আগে একটা কাজ পাওয়ার উদ্দেশ্যে আমি নিজেই তোমার কাছে যাচ্ছিলাম দাদু।...কাজ দাও। আজ-ই চলে যাই।

—মা আসছে। দেখা করবি না ?

—না।

দাদু গম্ভীর হলেন।

—বোস,

বললেন কঠিনস্বরে। মন্ত্রচালিতের মত আমি বসে পড়লাম। দাদু আমার কাঁধে এসে হাত রাখলেন। বললেন স্নেহকোমল সুরে ঃ

—মায়ের মন বুঝিস্ না পাগল!...এই তোরা বুদ্ধিমান, হৃদয়বান? এতদিন বাদে সে কলকাতায় আসছে, তোকে তো কোলে-কোলে কাছে-কাছে রাখারই কথা। তা' মা হয়ে সে-ই যখন তোকে দূরে সরিয়ে রাখতে চায়, তখন বুঝতে পারিস্ না কী বেদনা লুকোনো আছে সেই চাওয়ায়?

নির্বোধের মত তাকিয়ে রইলাম দাদুর মুখের দিকে। বলে' চললেন তিনি ঃ

—তোর মা জানে, তুই কেবল সিনেমার ছেলেমেয়েগুলোর সঙ্গে ঘুরিস। বদসঙ্গে মিশেই তোর আনন্দ।

—আমাকে যা হয় একটা কাজ দাও দাদু, চলে যাই।

—দূর থেকে সে বেটী কত কী শোনে তোর নামে, তা কি তুই অনুমান করতে পারিস্ না র?...তুই দেশজোড়া নাম করেছিস্, জ্ঞাতি-শত্রুরা তা সহ্য করতে পারে না বলেই তোর মা-র কাছে যা তা বলে' তারা শান্তি পায়। এটা না পেলে তারা বাঁচে কি করে' বল্? ঈর্ষার অগ্নিদাহনে জ্বলেপুড়ে' যে খাক হতে হয় তাহ'লে!

—লোকে যা তা' কেন বলে তা বুঝি, কিন্তু মা-ও বলবে? তবে মা হয়েছে কেন?

—ওরে পাগ্‌লা! বলে কি সে বেটী? তার অভিমানে বলায়।... যেখানে স্নেহ, সেখানেই অভিমান। অভিমান-ই ভুল করে। আর তুই মূখ্যু অভিমানী, এ-ভুল ভেঙে দিতে চাস্ না! ভুলের ওপর ভুল চাস চাপাতে?

—× × ×

—তোর দোষেই, বু, মা তোকে ভুল বোঝার অবসর পেয়েছে। কোথায় মাঝে মাঝে তার কাছে যাবি, থাকবি কাছে-কাছে, আনবি তাকে ক'লকাতার বাড়ীতে জোর করে—তা নয়, শুধু ঘরে বসে থাকা, ছাই-ভস্ম লেখা, এখানে সেখানে ঘোরা আর ফোনের সামনে বসে হ্যালো, হ্যালো করা।

—আমাকে একটা কাজ দাও দাদু!

—তাই দেব। আপাততঃ যেটা দিচ্ছি—কর দেখি। গুরুদেবের যত্ন-আদরের সব ব্যবস্থা তোর ঘাড়ে চাপাতে চাই। পারবি নিতে?

—ও-সব আমি পারবো না।...তার চেয়ে মা যা লিখেছে তাই করো: আমাকে পাঠিয়ে দাও কোথাও!

—বেশ!

চমকে উঠলাম দাদুর অভিমানাহত কণ্ঠস্বরে। ধৈর্যহীন মন কিন্তু মূল্য দিল না দাদুর অভিমানে। বললাম:

—আমি আজ-ই চলে যেতে চাই দাদু!

—তাই যাও!

বলতে বলতে দাদু ঘর থেকে বার হয়ে গেলেন ধীর পাদবিক্ষেপে। প্রায় মিনিট পাঁচেক কাটল নিবিড় নিস্তব্ধতায়। দাদু আবার কী মনে করে এলেন ঘরে। দেখলেন—যেমনভাবে বসেছিলাম, তেমনি আছি বসে।

দাদুকে দেখে আমি উঠে দাঁড়ালাম।

—সত্যি যেতে চাও?

— × × ×

—শরীর তোমার সুস্থ নয়। মন-ও নয় শান্ত।...এখন শুয়ে পড়ো!... সত্যি যেতে চাও যেয়ো, বড় হয়েছ, তোমাকে আটকাবো না!

সুবোধ বালকটির মত শুয়ে পড়লাম বিছানায়।

খাবারের ঘর থেকে ডাক এল।—কর্তাবাবু, আমার দাদু, বসে আছেন, দেরী যেন না করি, বলে' গেল ইন্দ্রাসন। বাড়ীর ভৃত্য সে তো নয় দাদুর পারসোনাল এসিস্টেণ্ট বললেই হয়। খেতে ইচ্ছে নেই, তবু যেতেই হবে, যাবো না বললে অমনি কাছে আসবে ছুটে, নানা প্রশ্নে করবে জর্জরিত। তারপর দাদু আসবেন ধীর পাদ-বিক্ষেপে—এবং বিচিত্র কিছু নয়, ঘর ভরে যাবে ডাক্তারে কবিরাজে! তার চেয়ে কিছু খেয়ে এসে নিশ্চিন্ত হয়ে একটু ঘুম দেয়া ভালো।...উঠলাম।

দাদু খুসি হলেন বিনা বাক্যব্যয়ে আমি খেতে এলাম দেখে। কুশল প্রশ্ন করে' নিশ্চিন্ত হয়ে খেতে সুরু করলেন।...আহার শেষ করলাম নীরবে।...

দুপুরে কোনদিন শুই না—বাইরের কাজ না থাকলে পড়াশুনো বা এটা-সেটা লেখার কাজ করি দুপুরে। আজ এ-সব কিছুই করতে ভালো লাগল না। দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে বিছানায় এসে শুয়ে পড়লাম।...

কী মনে হওয়ায় উঠলাম হঠাৎ। দাদুর ঘরের দ্বারপ্রান্তে এসে দাঁড়ালাম নিঃশব্দে। দুপুরের আহারের পর দাদু প্রায় ঘণ্টাখানেক বিশ্রাম করেন, ও-পাশ ফিরে শুয়ে বোধ করি ঘুমুবার চেষ্টা করছেন। পা টিপে টিপে পার হলাম বারান্দা, ফিরে এলাম নিজের ঘরে। টেবিলের সামনে বসলাম।—নাঃ, অসম্ভব আজ পড়াশুনো করা কিংবা নূতন কোনো লেখার চিন্তা করা।...নিচের তলায় বাড়ীর ঝি-চাকরগুলো আজ যেন ভূতপেত্নীর নৃত্য করেছে আরম্ভ।

গলা শুনতে পাচ্ছি মহামহিম ইন্দ্রাসনের। চিৎকার করে' বকে উঠল বাড়ীর ঝি লালঝরি-কে। লালঝরি কী উত্তর করল শোনা গেল না, কিন্তু রাঁধুনী-মার মিহি কণ্ঠস্বর হঠাৎ দু-চিড় খেয়ে হঠাৎ ভেসে এল :

—এখন-ও নিয়ে গেল না ? এবং সঙ্গে সঙ্গে দুম্‌দাম করে' বাসন পত্র পড়তে লাগল চৌবাচ্ছার ধারে।...বাড়ীর কুকুরদুটো, টম আর টেবী, হঠাৎ তারস্বরে লাগাল চিৎকার। ইন্দ্রাসনের কণ্ঠস্বর শোনা গেল :

—এখন-ও খাওয়ানো হয়নি ?

—হয়েছে দুবার। না খেয়ে সব আছে !...আবার হচ্ছে,

উত্তর দিল টম্বু, টম-টেবীর তত্ত্বাবধায়ক।

—এক টাকা ফাইন তোর,

গর্জে উঠল ইন্দ্রাসন।

ইন্দ্রাসন অবশ্য আমাকে-ও মাঝে মাঝে ফাইন করে—যখন দেরী করে খেতে যাই, কিংবা রাত ন-টার পর সামান্য কিছু বিলম্ব হয় বাড়ী ফিরতে। কৌতুক করে' ফাইন দিতে গেলে, লজ্জায় অবশ্য জিভ্ বার করে একহাত। তারপর হঠাৎ গম্ভীর হয়ে :

—আজ নিলুম না বলে' মনে ক'রো না দাদাবাবু, অন্যদিন মকুব করবো। কর্তাবাবুর কড়া হুকুম—দুপুরের আগে খাওয়া চাই, রাত ন-টার আগে বাড়ী ফেরা চাই।

—যা, আর জেঠামি করিস না !

বলে' যদি হাসি,

—হাসির কথা নয়, দাদাবাবু, কর্তাবাবু বড্ড রাগ করেন। তিনি বকেন না, কিন্তু মুখ দেখলে মনে হয় এর চেয়ে বকা ভালো।

—সে আমি বুঝবো'খন।...তুই যা তো !

—আর যেন কখন-ও দেরী ক'রো না,

বলে' চলে যায় ইন্দ্রাসন। বড় ভালো মানুষ। সহজ, সরল, সচ্চরিত্র। একটি বিড়ি পর্যন্ত খায় না। একটি পয়সার করে না এদিক-ওদিক। বাড়ীর সমস্ত দায়-দায়িত্ব মাথায় করে' করছে বহন। কিন্তু দোষ ওই, বড় চেঁচায় মাঝে মাঝে। বললে শোনে না। আড়ালে এসে বলে—লেখাপড়া করছ করো দাদাবাবু, ওদের সামনে আমাকে কিছু ব'লো না। আস্কারা পাবে। চাকর-বাকরদের সঙ্গে একটু চেঁচামেচি করতে হয়।

তা আজ-ই নূতন করে ওর চেঁচামেচিতে পেল ? নাঃ, লেখা আজ অসম্ভব। এমন হাটের মাঝখানে বসে' ধ্যান করা, সুর ধরা অসম্ভব, অসম্ভব।... বিছানায় এসে শুয়ে পড়লাম পুনর্বার।

খবরের কাগজখানি পড়তে পড়তে কখন ঘুমিয়েই পড়েছিলাম, জেগে উঠে দেখি সু বসে আছে সামনের ইজিচেয়ারে। জেগেছি দেখে ঃ

—ইন্দ্রাসনের মুখে শুনলাম শরীর অসুস্থ, তাই ডাকি নি।

তারপর কাছে এসে ঃ

—কী হয়েছে বু ?

—কিছুই হয় নি।...এই আসছ ?

—এসেছি মিনিট কুড়ি।

—কটা বাজলো ?

—সাড়ে চারটে।

—ঘুমিয়েছি তো অনেকক্ষণ !

—দুপুরে কখনও তো তোমাকে ঘুমুতে দেখিনি।

—আজ বড় ক্লান্তি অনুভব করছিলাম সু।

—এখন ঠিক হয়ে গেছ ?

—শরীরটা কেমন ভারি-ভারি ঠেকছে।...এটা কিছু না।

—বু, উঠেছিস্ ?

দাদুর কণ্ঠস্বর শোনা গেল বারান্দার প্রান্ত থেকে।

—হ্যাঁ দাদু।

উঠে বসলাম। দাদু এসে পড়লেন। সু সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়াল। তাকে দেখে দাদু ঃ

—সু-ভাই যে, এতদিন তোমাকে দেখি নি কেন ?

তারপর আমাকে ঃ

—ঘুমুচ্ছিলি। শরীর তাহ'লে নিশ্চয়ই খারাপ হয়েছে !

—না দাদু !

—বু বলছিল...

সু-কে ইশারা করে চুপ করতে বললাম। সু গ্রাহ্য করল না। বলল...

—শরীরটা ভারি-ভারি ঠেকছে।

—ও বোধ হয় দুপুরে ঘুমিয়েছিস্ বলে'। দেখি...

দাদু এগিয়ে এসে আমার কপালে হাত দিলেন। তারপর :

—কিচ্ছু না। যা হাত-মুখ ধুয়ে নে। আজ সন্ধ্যায় একটা জরুরী কাজে আমি বেরুব। কাজ চাইছিলি, কাজ পাবি। যাবি আমার সঙ্গে ?

— × × ×

—বুঝেছি। যেতে এখন আর ভালো লাগছে না। কেমন ?

বলে' সু-র দিকে চেয়ে দাদু হাসলেন। কী মিষ্টি সেই স্নেহপ্রসন্ন স্বর্গীয় হাসি। মনের সমস্ত জড়তা যেন ধুয়ে গেল সেই হাসির ধারায়। বললাম :

—যাবো দাদু, তোমার সঙ্গে।

দাদু সু-র দিকে তাকালেন প্রসন্নদৃষ্টি। তারপর :

—না, আজ সু-বাবুর সঙ্গেই না হয় ঘুরে এসো একটু। নইলে এ-দাদাটি আমাকে আড়ালে—কি বলো না সু-বাবু, কী ভাবায় তোমরা বাহাত্তুরে বুড়োদের গালাগাল দাও !...তা কাল যেয়ো আমার সঙ্গে, কেমন ?

সু মুগ্ধদৃষ্টিতে চেয়ে রইল দাদুর দিকে। দাদু ঘর থেকে বেরিয়ে গেলে পর আত্মবিস্মৃত সুরে সে বলল :

—ভাগ্য দেখে ঈর্ষা হয় বৃ।

—দাদুকে দেখে বলছ ?...আমার মা-বাবার ধারণা কি জানো ? দাদুর জন্যেই নষ্ট হয়ে যাচ্ছি। বাবা তো আমাকে প্রায় ত্যাজ্যপুত্র করেছেন, মা-ও আজকাল যা-তা ভাবছেন আমার সম্বন্ধে।...যাক গে।

—পৃথিবীতে কেউ-ই সুখী নয় !

—যাক গে।...তা তোমার খবর কি ?...এ-কয়দিন কোন্ ভূত চেপেছিল তোমার মাথায় ?...দিন দিন তুমি কী হচ্ছ সু ! শো-কে এ-কয়দিন কী যন্ত্রণা দিয়েছ জানো ? বেচারা কাল আমাকে ফোনে তোমার কথা জিজ্ঞাসা করতে গিয়ে কাঁদতেই শুধু বাকি রেখেছে।

—ও-সব কথা থাক বৃ।...সব ঠিকঠাক হয়ে গেছে আমার অন্যায় আমি স্বীকার করেছি।

—করেছ ভালো কথা। কিন্তু যেটা অন্যায় বলে' এখন স্বীকার করেছ, কাল-ই সেটা আবার করবে তো?

বললাম দুঃখের হাসি হেসে। সু বলল:

—সত্যি ভাই, আমি একটা অমানুষ। মাতালেরা কি কখনও মানুষ হয়? পশু হয়। নইলে তোমার মত বন্ধুর নিন্দা করি?

—আমার আবার প্রশংসার হঠাৎ কী পেলে?...বড় ভয় হয় সু তোমার কথা শুনে।

—এবার আর ভয় করো না বৃ। লজ্জা দিয়ো না।

—সুখী হলাম। বুঝলাম শো-র ওপর এখন তোমার আর রাগ নেই।

জিজ্ঞাসু দৃষ্টি সু তাকাল আমার মুখের দিকে।

—একাধিকবার লক্ষ্য করেছি সু, শো-র প্রতি তুষ্ট থাকলেই বৃ-কে তোমার বন্ধু মনে হয়। আবার কোনো কারণে যদি বৃ-কে তোমার সন্দেহ হয়, অমনি শো-ও মন্দ হয়ে ওঠে তোমার বিচারে। তাই না?

—আর লজ্জা দিয়ো না বৃ। আমাকে ক্ষমা করো।

—নি-র কাছে আমাদের সম্বন্ধে কি বলে' অমন সব নির্লজ্জ কথা তুমি বলতে পারলে সু?

—বন্ধু, আমি ক্ষমা চাইতে এসেছি।...আমার খুব শিক্ষা হয়ে গেছে।

ব্যাপার কী? না, ব্যাপারটা এমন কিছুই না। নি-র পাল্লায় পড়ে বেশ কিছু টাকা তার নষ্ট হয়েছে। আজ রাত্রেই, আবার আদেশ আছে, কস্‌বায় একটা বাগানবাড়ীতে যেতে হবে যথাসময়ে। অনেক বিদেশী ও বিদেশিনী বন্ধুরও নাকি আবির্ভাব ঘটবে। নি আহ্বান করেছে সকলকে। সেখানে পানাহারের সমস্ত খরচা বহন করবে নবাব সিরাজদ্দৌলা শ্রীমান্ সু।

—রাজী তো হয়েছ?

—আমি হয়েছি? মদে হয়েছে।...আমি এবার মারা যাবো বৃ।...ভাগ্যে রাগ না করে' মান রেখে' আমাকে ডাকলে। তুমি আর শো আজ যদি না আমার খোঁজ নিতে, মারা যেতাম, নিশ্চয়ই মারা যেতাম।

—তোমাকে আর আমার বিশ্বাস নেই। তুমি আবার মরতে যাবে।

—কথাটা মিথ্যে নয় বৃ। বোধ হয় যাবো।...মাতাল কি কখনও সৎপরামর্শ নেয়?...শো-র ভয়ে এতদিন একফোঁটা মদ-ও ছুঁতাম না, আবার কী যে হ'ল, কেন যে ধরলাম।...শুনে হাসবে বৃ, কিন্তু সত্যি বলছি, মদে আমার ভারি ভয়। খেলেই ভেতরের যত কদর্য মনোভাবগুলো বেরিয়ে আসে বুনো শুয়োরের মত।...

—× × ×

—এমন মাতালকে-ও শো করেছিল সংযত। সচ্চরিত্র। হেসো না, শো-র ধৈর্যে ও প্রেমে আমি সত্যসত্যই সচ্চরিত্র। কিন্তু কী যে হ'ল ছাই। দুপুরে সেদিন শো তোমার কাছে এল—কেন যে সেটাকে সহজভাবে নিতে পারলাম না!...সমাজের চোখে শো কত বড় মাননীয়া মহিলা, অথচ কত ছোট তাকে করলাম গোপনে! তোমাকে-ও কি ছাই ছেড়েছি? কত কাদা লেপেছি তোমার নামে, জানো তুমি।

—× × ×

—তোমাদের ছোট করি, অথচ মনে মনে জানি—তোমাদের দুজনের মধ্যে একজনকে-ও ত্যাগ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

—তা আমি জানি সু।

—জানো? অবিশ্বাস করো না।

—না।

—শো-ও অবিশ্বাস করে না। বৃ, লোকে জানে আমি অতুল ধনে ধনী। এ-জনপ্রবাদ কিছুটা হয়তো সত্য। কিন্তু মনের গোপনে, ভাই, আমি একেবারে নিঃস্ব, দরিদ্র। ব্যথায় ব্যথী বলতে কেউ নেই আমার। মা নেই, বাপ্ নেই, মনের মত বউটা ছিল, তা সে কতকাল হ'ল, আজ নেই। আছে শুধু অসংখ্য জ্ঞাতিগুষ্ঠি, আসে অন্ন ধ্বংসাতে, সোহাগ দেখায় কিছু প্রাপ্তির

আশায়।...ব্, প্রিয়বন্ধু, তোমাদের দুজনের মধ্যে কেউ আমাকে ত্যাগ করো না।...শোর হাতদুখানি ধরে' একথা তাকে-ও আজ বলে এলাম।

—× × ×

—শো কাঁদলো আমার কাঁধে মাথা রেখে। বললো: কেন যে ছেলেমানুষী করো মাঝে মাঝে? কেন কষ্ট পাও?—আর আমাকে কষ্ট পেতে দিয়ো না, শো-কে বললাম। শো বলল ব্-কে প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবতে নেই, ব্ বন্ধু। ব্ শিল্পী। শাপভ্রষ্ট। এ-জগতের মানুষই নন ব্। প্রিয়বন্ধু, ভালবাসার জন তিনি। সন্দেহ করতে আছে? ক'রো না।

সু-র এ-সব রিপোর্টের তাৎপর্য যে বুঝলাম না, তা নয়। অন্যদিন হ'লে—এ-সব কথায় হয়তো তার অভিনয়ছলাই অন্বেষণ করতাম! আজ তার প্রতি আমার এতটুকু রাগ হ'ল না। অবিশ্বাস জাগল না। বরং অননুভূত একপ্রকার স্নেহাবেগের কারুণ্যে আন্দোলিত হ'ল অন্তর। কিন্তু তার কথা আর এগোতে দিলাম না।

—একটু বসো ভাই,

বললাম আন্তরিকতার সহজছন্দে:

—আসছি। পাঁচমিনিট।

বাথরুম থেকে ফিরে মুখে একটু স্নো-পাউডার ঘসে আর বেশ বদল করে' শরীরটা বেশ হাল্কা বলে মনে হ'ল।

চা খাবার এল। দুজনে খেয়ে একটু বাইরে ঘুরতে যাব ভাবছি রামস্বরূপ দ্বারের কাছে এসে দাঁড়াল সেলাম দিয়ে। সসম্ভ্রমে এগিয়ে দিল একখানি নামের কার্ড।—একি, শ্রীমতী বি! কখনও তো আসেন না। ব্যাপার কি?...গম্ভীরমুখে রামস্বরূপকে বললাম:

—নমস্কার দাও তাঁকে!

—কোন মহাজন হে?

জিজ্ঞাসা করল সু।

—শ্রীমতী বি।

—হঠাৎ ?

—তাই তো ভাবছি।

—নিশ্চয়ই মোটা কিছু চাঁদার আশায়। আমি রয়েছি, আমারো কিছু খসলো তবে। নারীত্রাণ সমিতি, শিশুপালন সঙ্ঘ, জনশিক্ষা মন্দির—কত কি শুনবে এইবার...অভিনেত্রী হয়ে তো কিছু হ'ল না, এখন জননেত্রী হওয়ার চেষ্টা।

—যাই বলো অভিনেত্রী হিসাবে বি খুবই সাক্‌সেস্‌ফুল।

—তবে এ-সব অকারণ কর্মচক্রে ঘোরা কেন বাপু!

—শিল্পী আর কোনো কাজ করবে না? শুধু ষ্টুডিও আর ষ্টেজ-ই তার কর্মক্ষেত্র ?

—তা নয় তো কি ?...এই আমি চোখ বুজিয়ে পড়ে রইলাম। ও-সব গাছ-কোমর বাঁধা কর্মী মেয়ে দেখলে আমায় চোখ জ্বালা করে।

বি আসছেন, দেখতে পেলাম দূর থেকে। সিঁড়ি পার হয়ে বারান্দায় বেঁকেছেন। দ্রুত এগিয়ে গেলাম সৌজন্য দেখিয়ে :

—আসুন, আসুন।

—নমস্কার।

—নমস্কার।...আসুন।

ঘরে এনে তাঁকে বসালাম। সু-কে দেখে উল্লাসে উৎফুল্ল হয়ে উঠল তাঁর মুখ।

—আপনি এখানে ? ভালো হ'ল। আমাদের হয়ে শ্রীযুত বৃ-কে আপনি-ও কিছু তাহ'লে বলুন সু-বাবু।

সু-বাবু নির্বিকার দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকালেন।

—কি ব্যাপার বলুন তো,

হেসে জিজ্ঞাসা করলাম বি-কে।

—এমন কিছুই না। আমরা 'ইয়ং আর্টিষ্ট' মিলে একটা 'এ্যাসোসিয়েসন্' ফর্ম করেছি। প্রথম অধিবেশন ডেকেছি আগামী রবিবার। পড়েন নি খবরের কাগজে ?

মনে পড়ল, যেন পড়েছি! মাথা নেড়ে তা বুঝিয়ে দিলাম।

—আমাদের সকলের ইচ্ছা: আপনি সেই সভার প্রধান অতিথি হ'ন। ক'লকাতার মেয়র শ্রীযুত বসু সভাপতি হতে রাজী হয়েছেন।

ব্যাপারটা এমন কিছু নয় কে বলেন তবে! এ-যে ভীতিপ্রদ গুরুতর ব্যাপার!...ডাবের মুকুট-পরা ভরা কলসীর মত সভাপতির পাশে ঘণ্টা চার বসে থাকতে হবে নির্বাক, নিস্পন্দ, তারপর সভার সকলে যখন একে একে উঠে যেতে সুরু করবে, তখন আরো ভয়াবহ ব্যাপার, বক্তৃতা হবে গম্ভীর ধৈর্য সহকারে।

—ক্ষমা করবেন,

হাত জোড় করে বললাম:

—বক্তৃতা আমার আসে না।

—বক্তৃতা তুমি করতে পারো না—এটা তুমি বলতে পারো না বৃ।

—বলুন তো,

বলে' সু-এর দিকে কৃতজ্ঞদৃষ্টিতে চাইলেন বি। তারপর:

—বক্তৃতা আপনি ভালোই করতে পারেন। তবে আমাদের সভায় আপনাকে বক্তৃতা করতে হবে না। আমাদের তরফ থেকে বক্তৃতা লিখে দেয়া হবে, সেটা পড়বেন। আপনার নামে সেটা ছাপা হবে।

—আমার নিজের কথা বলতে পারবো না—তাহ'লে তো নিশ্চিন্ত। কিছু মনে করবেন না, সভায় যাওয়া আমার ভালো লাগে না। তা ছাড়া, আমি জানি দাদু এ-সবে রাজী হবেন না।

— × × ×

—তাঁর অনুমতি না নিয়ে কিছু করতে বা কোথাও যেতে আজ-ও আমি পারি না, চাই-ও না।...আর এই রবিবারে বলছেন সভা। ঐ দিন-ই আমার মা আসছেন কলকাতায়।

—তাতে কি,

বলল সু।

বি অকূলে কূল পেলেন যেন। সু বলল:

—ইনি আশা করে' এলেন, তোমার যাওয়া উচিত বু। মাত্র কয়েক ঘণ্টার তো ব্যাপার। যাও, যাও।

সু-র চোখে দুষ্টামির সূক্ষ্ম রেখা। অসহায়ের মত বসে রইলাম। সু বলল :

—আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন বি, বু যাবে।

—দাদুকে একবার জিজ্ঞাসা করি।

—এই সামান্য বিষয়েও দাদু। আচ্ছা ভালো ছেলে তো!

বলল সু :

—আচ্ছা দাদু-কে আমি রাজী করাব।

—তা'হলে কথা দিচ্ছেন?

—কাল সকালে দিলে হয় না?

—× × ×

—একটু ভাবতে দিন শ্রীমতী বি!

—একটা সভায় যাবে এতে আর ভাবাভাবির কী আছে!

—আচ্ছা যা ডিসাইড করেন কাল সকালে ফোনে আমাকে দয়া করে' জানাবেন। আটটার আগেই কিন্তু।...ভুলবেন না তো?

—না।

—তবে উঠি। আরো কয়েক জায়গায় আমাকে যেতে হবে।

—আচ্ছা পরিশ্রম করতে পারেন!

—পরিশ্রম আর কী। এ তো সখ। আনন্দ। আচ্ছা নমস্কার।

—নমস্কার।

শ্রীমতী বি ঘরের বার হয়ে এলেন। সঙ্গে সঙ্গে আসছি দেখে শ্রীমতী বি বললেন :

—আপনি আর কষ্ট করে' আসবেন কেন!

—সে কি কথা।

নিচে নেমে এলাম বি-র সঙ্গে! নিজের হাতে তাঁর গাড়ীর দরজাটা খুলে দিলাম গাড়ীতে উঠলেন বি।

-যাবেন, এই সংবাদটাই যেন পাই!

হাসলাম।

গাড়ী ষ্টার্ট দিয়েছে, হঠাৎ বি চিৎকার করে উঠলেন—এই রোখো।

তারপর গাড়ী থেকে মুখ বাড়িয়ে আমার দিকে চেয়ে ঃ

—দেখেছেন। একেবারে ভুলেছি!

আমি এগিয়ে গেলাম তাঁর কাছে।

—মাননীয়া সী-র কাছে গেছলাম। আপনাকে আমরা আনতে চাই জেনে তাঁর কী উৎসাহ। সভায় আসার জন্যে অনুরোধ করে' একটা চিঠি তিনি আপনাকে দিয়েছেন।

ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে চিঠিখানি বার করে' বি দিলেন আমার হাতে। তারপর ঃ

—দেখেছেন একেবারে ভুলেছি। আসতে-না-আসতেই যে রকম ঘাবড়ে দিলেন যাবো না বলে'।...আচ্ছা।

বি চলে গেলেন। গেটটা পার হয়ে বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করছি, দেখি দাদু আসছেন। সঙ্গে সু। আমাকে দেখে অন্যদিকে মুখ ফেরাল সু।

—সভায় তোমায় যেতেই হল দাদু।...বুড়োটাকে শিখণ্ডী করে' তেমন ফল হ'ল না এ-ক্ষেত্রে।

বললেন দাদু, দুষ্টুমিভরা হাসি তাঁর চোখে। সু-র দিকে তাকালেন তারপর। সু-র মুখে নির্বিকার ঔদাসীন্য।

উল্লেখ-করাই বোধ হয় বাহুল্য যে, শ্রীমান্ বৃ আর্টিষ্ট সভায় উপস্থিত হওয়ার লোভ সংবরণ করলেন না। সকালে আটটার আগেই শ্রীমতী বি-কে ডেকে জানিয়ে দিলেন তিনি রাজী।

—অশেষ ধন্যবাদ,

এল সুমধুর কণ্ঠের কৃতজ্ঞ উত্তর :

—কী ভাবনাতেই ফেলেছিলেন।...জানেন, আপনি না এলে আমাদের সমস্ত উৎসাহ পণ্ড হয়ে যেত ?...আপনাকে আমরা সকলেই চাই।

—আমার ওপর আপনাদের অশেষ স্নেহ।

—শ্রীমতী শো-কে খবরটা দিই তাহ'লে ?...তাঁর ওপর-ই অনুষ্ঠানলিপি রচনার ভার। বলছিলেন, আপনি সভায় আসতে রাজী হলে পর তিনি তা রচনা করবেন। তাঁর কত যে সব নূতন নূতন পরিকল্পনা আছে !

—বৃহৎ একটা ব্যাপার-ট্যাপার তাহ'লে হচ্ছে বলুন।

—বৃহৎ ব্যাপার আর কী ! সামান্য সভা। নৃত্য, গীত, বক্তৃতা—যেমন সব জায়গায় হয়।

—× × ×

—সভা রবিবার, মনে আছে তো ? নোট করে' নিন। আজ শুক্রবার। মাঝে শনিবারটা। সন্ধ্যে ছ'টায়। আমাদের বাড়ীতে।

—ধন্যবাদ !

—সভার আগে আমি গিয়ে আপনাকে নিয়ে আসবো !

—আমি তো দু-একবার গেছি আপনার বাড়ী ! চিনি। আমি তো নিজেই যেতে পারবো !

—সে কি কথা ! নিমন্ত্রিত অতিথিকে কি একলা আসতে আছে ? ওতে সভার গাম্ভীর্য ক্ষুণ্ণ হয়।

—× × ×

—শুনুন। রবিবার দুপুরে আপানাকে সভার কথা একবার জানিয়ে দেব। কেমন ?

—দরকার কি !

—না, না,। আপনার ভোলা-মনটাকে আমাদের ভারি ভয়...হয়তো কী সব লিখতে বসবেন, তারপর বেমালুম ভুলে যাবেন কোথায় কী কথা দিয়েছেন।

— × × ×

—আপনার সম্বন্ধে আমাদের সকলের অনুযোগ তো এই, আপনি ক্রমশঃ 'এস্‌কেপিষ্ট' হয়ে যাচ্ছেন। বেরোন না বাইরে, আগের মত মেশেন না কারুর সঙ্গে।...পাজি মেয়েগুলো কত কী যে বলে' এইজন্যে।

—কী বলে ?

হেসে জিজ্ঞাসা করলাম।

—দেখুন, যে-কথা আমি অশ্রদ্ধেয় বলে' জানি—তা উচ্চারণ করা সঙ্গত মনে করি না।

— × × ×

—সামনাসামনি যে-নিন্দাটা আমরা মানুষকে, বিশেষ করে' শ্রদ্ধেয় কোনো মানুষকে, করতে পারি না—অথচ করবার সুযোগ পেলে আনন্দ পাই, অন্যে বলেছে বলে' সেটা সকলের সামনে, এমন কি সেই শ্রদ্ধেয় মানুষটির সামনে-ও —অক্লেশে আমরা উচ্চারণ করি, লজ্জা পাই না। এটা একরকম প্রতারণা। নয় ?

— × × ×

—কথার জবাব দিচ্ছেন না যে।

হাসতে লাগলাম অকারণে।

—হাসছেন কেন ?...আপনার হাসি, সত্যি···

—দেখলে হাড়পিত্তি জ্বলে যায় ?

—কী যে বলেন,

তুচ্ছ এতটুকু কৌতুকে উল্লসিত হয়ে উঠলেন বি :

—জানেন, আমাদের নেক্‌স্‌ট্‌ ছবিটার সুটিং শেষ হয়ে এল ?

—কাগজ থেকে জেনেছি।

—এ-ছবিতে যিনি 'হিরো'—একেবারে সাই, ওয়ার্থলেশ। তাঁকে নিয়ে কাজ চলে না।...আপনাকে যদি এ-ছবিতেও পেতাম।

—আমার প্রতি আপনাদের অসীম স্নেহ।

—দেখেছেন বকবক করে' বকেই চলেছি।...শ্রীমতী শো-কে খবরটা দিই। --মনে আছে তো কবে সভা ? কবে বলুন দেখি ?

—সোমবার বেলা দুটোয়...

কৌতুক করলাম। বি হেসে উঠলেন :

—বাব্বা, কী দুষ্টুমি-ই আপনি করতে পারেন।

কৌতুকভরা হাল্কা মন নিয়েই সকালের পড়াশুনো সুরু করলাম। অনেকদিন থেকেই আমার বাসনা, বৌদ্ধযুগের বিখ্যাত ভিক্ষুণী দেবী পটাচারার জীবনকথা অবলম্বনে একখানি চিত্রনাট্য রচনা করব। আজ বৌদ্ধ 'থেরীগাথা'খানি আলমারী থেকে বার করে পটাচারার জীবন ও বচনগুলি আর একবার পাঠ করব, এই আশায় বেশ শান্ত ও প্রসন্ন হয়ে বসতে গেলাম। কিন্তু একী! অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই মনটা হঠাৎ রবিবারের সভার কথা ভেবে অস্থির হয়ে উঠল। মনে হ'ল, সভায় উপস্থিত হতে রাজী হয়ে ভালো করি নি। দস্তুর মত ভুগতে হবে। আত্মনিবিষ্ট হয়ে ধর্মকথা পড়ব কি, বুকের মধ্যে রবিবারের সভাটা কাঁটার মত বিঁধতে লাগল খচ্‌খচ্‌ করে। শুক্র...শনি...দুদিন তো মুক্তির আনন্দ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে দুঃসহ রবিবারটাকে বেশ খানিকটা তফাত্‌ করে'—যা খুশি তো করতে পারি এই দুদিন...হাসতে পারি, খেলতে পারি, গাড়ী নিয়ে উধাও হয়ে ঘুরতে পারি, চাই কি বৌদ্ধবচনের অতল অমৃতসাগরে ডুব দিয়ে চুপ করে বসে থাকতে পারি আত্মনিবিষ্ট—কিন্তু না, রবিবারটা উপচে পড়ে প্লাবিত করল শুক্র-শনির স্বাধীনতা, শান্তি-স্বস্তি-স্বপ্ন-সাধনা! নাঃ!

থেরীগাথাখানি মাথায় ঠেকিয়ে তুলে রাখলাম যথাস্থানে। কেমন যেন একটা অস্বস্তি, একটা জড়তার বিস্বাদ মস্তিষ্কের শিরা উপশিরার বিদ্যুৎ বেয়ে সঞ্চারিত হ'ল চেতনায়। বাড়িয়ে বলছি না একটুও : ডাক ছেড়ে কান্না পেল মনে মনে। ইচ্ছা হ'ল গাট্টা মারি মাথায়।

দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে' ঠেসান দিয়ে বসলাম চেয়ারে।...যাক। যা হবার হয়েছে। গতস্য শোচনা করে লাভ নেই। ভোগ যদি থাকে, তরঙ্গ হয়ে বয়ে যাক দেহের ওপর দিয়ে, মনের ওপর দিয়ে। ভোগান্তে যেন ভেসে উঠতে পারি। সাঁত্রে হতে পারি পার। ভোগ যা দেয়, তা-কেই শ্রেয় মনে করে' আঁকড়ে থাকার মোহ যেন না পেয়ে বসে। মানুষ ভূত হয় এই মোহের মদিরতায়। এটা করা, সেটায় যাওয়া, এটায় লাফানো, সেটায় ঝাঁপানো—এটা করলে সেইটা পাবো, সেইটা পেলে ওইটা জুটবে, উঃ, ভাবলেই যেন গা শিউরে ওঠে। ছাত্রজীবনে, এই বছরকয়েক আগে পর্যন্ত এই ভাবেই তো কাটিয়েছি দিন। আবার বুঝি সেই প্রত্যাখ্যাত দুরন্ত দিন আক্রমণ করতে আসছে চতুর্গুণ বিক্রমে ?...প্রতিশোধ নেবে খুব করে'।

টেবিলের ওপর থেকে খবরের কাগজটা আবার টেনে নিলাম আনমনে। সিনেমা-পৃষ্ঠাটির ওপর চোখ পড়ল।...গ্রেটা গার্বোর একটা ছবি চলছে গ্লোবে। ম্যাডান থিয়েটারে কয়েকদিন হ'ল এসেছে রুডল্ফ ভলান্টিনো। সিলভিয়া সিড্নী, শ্যামবাজার 'শো হাউসে।...গেলে হয়। যাবো ? কিন্তু একলা যেতে কি ভালো লাগে ?...

শো এলেন।

— আমি শো।

মুহূর্তে নিস্তেজ মনটায় বিদ্যুৎ খেলে গেল উচ্ছল তরঙ্গে।

—সভায় আসতে রাজী হয়েছেন শুনলাম।

—তা তো হয়েছি।

—অমন করে বলছেন যে ?

— ×

—আপনার দাদু নাকি খুব ষ্ট্রিক্ট ?

—তা একটু বটেন।

—খোকাবাবুকে যে সভায় আসতে দিলেন! নারীর রাজ্যে যদি হারিয়ে যান!

—আপনি তো নারীর মধ্যে নারী।...আপনার রাজ্যে হারিয়ে গেলে খোকাবাবুর লাভ বই লোকসান হবে না বলেই বোধ হয় মনে করেন দাদু!

কিছুক্ষণ চুপচাপ। শো-র কাছ থেকে কোনো সাড়া নেই। হঠাৎ চুপ হয়ে যাওয়ার কারণ কি?

—হ্যালো।

—হ্যাঁ।

—ব্যাপার কী! চুপ করে' ছিলেন যে!

—একটা কথা রাখবেন? আজ আসুন না।

—ভাবছি সিনেমায় যাবো। রুডল্‌ফের ছবি। দেখেছেন?

—দেখেছি।

—কেমন রুডল্‌ফের অভিনয়?

—ভালো। কিন্তু ভালোর-ও ভালো আছে। দেখেছি।

—কোথায়?

—আমাদের দেশে।

—এটা আপনার দেশাত্মবোধের অহংকার। এটা লজ্জাই বহন করে।... আমি তো রুডল্‌ফের মতো কোনো শিল্পীকেই দেখি না কোথাও।

—আমি দেখি। দেখেছি।...রুডল্‌ফ বড় স্থূল...তাঁর শিল্পপ্রতিভা সৌন্দর্যের অহংকারে চেতনার রাজ্যে বড় হৈ-চৈ করে। মৌনের প্রশান্তি কোথা তাঁর শিল্পে?

—ভিন্নরুচিৰ্হিমানবাঃ। থাক তর্ক। করছেন কি এখন?

—কফি করছি।...খাবেন?

—দিন ঢেলে খানিকটা আমার নাম করে'। মুখ দিয়ে না পারি মন দিয়েই পান করে'।...

—আচ্ছা, এমন কোনো বৈজ্ঞানিক যন্ত্র কি হতে পারে না যার সাহায্যে কথার মত কফি-টফিও পাঠানো যায় মুহূর্তে ?

—তাতে অবশ্য আমাদেরই লাভ ষোলো আনা।...মনে হচ্ছে এ-যন্ত্রটা একদিন আবিষ্কৃত হবে—এবং আবিষ্কার করবেন একজন মহিলা বৈজ্ঞানিক।

—এ-অনুমানের তাৎপর্য ?

—একটু-ও গূঢ় বা গভীর নয়।...যারা খেতে দিতে চায় অথচ নানাকারণে পারে না, তাদের ব্যাগ্রতা থেকেই এ-যন্ত্রের জন্ম সম্ভব !

—খেতে দিতে চায় কি মহিলারই ?

—বিনা তর্কে এটা মেনে নেয়া ভালো।

একী ! ক্যানেকসন গেছে ছিন্ন হয়ে।

—হ্যালো।

টেলিফোনের মেয়েগুলো তো ভারি পাজী।...

—হ্যালো।

—কেটে দিয়েছিল। শেষের কথাগুলো শুনতে পাই নি। কী বললেন ?

—অত্যন্ত সত্য এবং সোজা কথা : শরৎচন্দ্র গুরুদেবের চেয়ে-ও জনপ্রিয় হয়েছেন এই সহজ কথাটার ব্যাখ্যা করে।...মেয়েরা খাইয়ে খুসি হয়—এটা বিনাতর্কে মেনে নেয়াই কি সঙ্গত নয় ?

—বোধ হয় নয়,...মেয়েরা সকলকে খাইয়ে তৃপ্তি পায়—এটা ঠিক না !

—এ-কথা অবশ্য মানি।

—মানো ?

—কোনো কোনো ক্ষেত্রে দেখছি, একটু চা আর টোষ্ট্ দিয়ে... এক্সকিউজ্ মি ম্যা'ম্, পরিহাস করছি...

—ছি !...শিল্পীর মত পরিহাস হ'ল না। সেদিনের ব্যাপারে আমি যে কত লজ্জিত তা তো জেনেছেন ! আর কি সে-কথা তুলে পরিহাস ও করতে আছে ?

সত্যসত্যই বড় লজ্জা পেলাম। মুখে হঠাৎ কোনো কথা জোগাল না। প্রায় বিশ থেকে তিরিশ সেকেণ্ড রইলাম নির্বাক হয়ে। তারপর হঠাৎ নির্বোধের মত :

—আচ্ছা...

—আচ্ছা কি! রাগ করে' ছেড়ে দিচ্ছেন নাকি?

—সত্যি বড় লজ্জা পেলাম।

—বেশ করলেন। এখন কবে দর্শন পাবো বলুন।

—কেন, রবিবার তো সবাই মিলছি!

—ওই সবাই-এর মধ্যে? নাঃ, আপনি একেবারে বালক। আমার চেয়ে নিশ্চয়ই দশবছরের ছোট। আপনি কত?

—সাতাশ।

—আমি তবে সাঁইতিরিশ!

—বিশ্বাস করি না।

—কথা ফুটেছে খোকাবাবুর।...কিন্তু অবিশ্বাস কেন?

—আমি একটা বুড়ীকে ভালবাসি, এ-বিশ্বাস আমাকে করতে বলো?

—জানো, মেক-আপে সাতাশি সতেরো হয়!

—যতক্ষণ সতেরো হয়, ততক্ষণ অবশ্যই ভালবাসার যোগ্য। রসজ্ঞের ভালবাসা তো দূরের ভালবাসা!

—দূরটুকু পেয়েই তোমার সুখ?

—কেন নয়?...কাছে পেয়ে যদি সুর কাটে, তবে দূর-পাওয়ার সুর-বাজানোই কি সুখ নয়?...জানো, না-পাওয়ার দুঃখ পায় শুধু নির্বোধে?

কথাগুলি ঔদাস্যের সুরে একটু দুলিয়ে উচ্চারণ করলাম। শো-র মুখ তো দেখতে পাচ্ছি না। দেখতে একবার ইচ্ছা হ'ল। জানতে ইচ্ছা হ'ল, কথাগুলি কেমনতর প্রতিক্রিয়া তুলল তাঁর হৃদয়ে।...বেশ খানিকক্ষণ পরে :

—আজ তাহ'লে সিনেমাতেই যাচ্ছেন ?

—যাবোই যে এমন কোনো প্রতিশ্রুতি দিই নি কারুকে।

—আচ্ছা যান।

—সিনেমার চেয়ে আপনার টান কিছু কম নয়।...কিন্তু আজ না হয় কাল, একদিন তো...হ্যালো, হ্যালো,...আশ্চর্য...!

ফোন ছেড়ে দিয়েছেন শো।

রবিবার সকালে ঘুম থেকে জাগামাত্র সভার কথা নয়, মা-র কথা মনে পড়ল।...অকথিত একটা অভিমানের অন্ধকার নিয়ে সূর্য উঠল আমার আকাশে! দাদুকে লেখা মার সেই চিঠিখানির কথা স্মরণে এল।—আমি এখান থেকে সরে গেলেই মা যদি নিশ্চিন্ত, যাবো, সরেই যাবো, বললাম মনে মনে।

গতকাল অবশ্য মা-র ঘরখানি নিজের হাতে দিয়েছি সাজিয়ে গুছিয়ে। দাদুর ফটোখানি, গুরুদেবের ছবিখানি—ঠিক কোথায় কোন দেওয়ালে রাখলে মা খুসি হবেন—আমার যেন সব জানা। মা ও বাবার তরুণবয়সের যুক্ত ফটোখানি দাদু উৎসাহভরে তাঁর নিজের ঘর থেকে এনে দিলেন আমার হাতে—আমি সেখানি দরজার মাথার ওপর টাঙিয়ে দিতে দাদু অত্যন্ত খুসি হয়ে বললেন—দ্যাট্স্ অল্ রাইট্।

—আমাকে কিন্তু ক'লকাতার বাইরে যেতেই হবে,

আনমনে বললাম আচম্বিতে। দাদু এ-কথা যেন শুনতেই পান নি, ঘরের চারিদিক পর্যবেক্ষণ করতে লাগলেন ঘুরে ফিরে'! তারপর এক সময়ে ঃ

—গুরুদেবের ছবিখানি যে হেলে রয়েছে একটু, নাঃ, ভক্তি দেখছি একটু-ও নেই,

বলে' কৌতুক করতে গেলেন শুষ্কভাবে। আমি তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে ছবিখানি সোজা করে' টাঙিয়ে দিলাম।

মা-র টেলিগ্রাম পেয়েছি গতকাল। বিশ্বনাথ দর্শনের অভিপ্রায়ে গত শুক্রবার তিনি কাশীতে নেমেছেন। কাশী থেকে শনিবার সন্ধ্যার গাড়ীতে রওনা হয়ে রবিবার সকালের দিকেই পোঁছুবেন হাওড়ায়...বীরেন্দ্র, আমার অনুজ, আসছে না। বোনদুটি, ফুল ও কমলা, আসছে সঙ্গে।

—হাওড়ায় তুমি যাবে, না আমি যাবো ?

দাদু জিজ্ঞাসা করলেন আমাকে।

—তুমি-ই যাও দাদু।...আমি গেলে মা বোধ হয় খুসি হবে না।

দাদু ক্ষুণ্ণ হলেন স্পষ্টতঃ

—বেশ,

বললেন গম্ভীর গলায়।

—আমি যাবো ?

বললাম অসহায় ভঙ্গীতে।

—না থাক,

বলে' গাড়ী বার করার আদেশ পাঠালেন ইন্দ্রাসন মারফৎ।

—আমি-ই যাবো দাদু!

—ঘরে যাও!

ঘরে না গিয়ে আমি-ই অবশ্য গেলাম ষ্টেশনে। ইন্দ্রাসন, মাকে মানুষ করেছে ইন্দ্রাসন, পরমানন্দে পাগড়ী মাথায় আর চুড়ীদার পাঞ্জাবী গায়ে দিয়ে আগে থাকতে উঠল গিয়ে মোটরে। দাদু গম্ভীর-মুখে বারান্দায় দাঁড়িয়ে রইলেন, নীচে নামলেন না।

·

গাড়ী ইন করল ষ্টেশনে যথাসময়ে।...প্রথম শ্রেনীর রিজার্ভ কামরা থেকে মা-কে খুঁজে পেতে বিলম্ব হল না। মাকে দেখে ইন্দ্রাসন হঠাৎ একচোট কেঁদে নিল অকারণে। ফুল ও কমলা-ও, কী আশ্চর্য, আমাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদল হাউ-হাউ করে। মা-র মুখেই শুধু ভাবাবেগের কোনো চিহ্ন দেখলাম না। প্রণাম জানাতে আমার মাথাটাকে জড়িয়ে ধরলেন। তারপর ঃ

—বাবা ভালো আছে রে ?

—হাঁ মা।...বীরেন্দ্র এল না কেন ?

ভাইটা আসবে না শুনেছিলাম। তবু এ-প্রশ্ন করার কারণ ছিল। বাবা আসবেন বলেছিলেন, কাজে আটকে পড়েছেন, সেটার অর্থ না-হয় বুঝতে

পারি, কিন্তু দিন কতকের জন্যে ভাইটা এখানে এলে এমন কি ক্ষতিটা হ'ত? নাকি বড়দার পাল্লায় পড়ে যদি বদ্ হয়ে যায়—এই ভয়ে মা তাকে আনলেন না সঙ্গে? মা বললেনঃ

—বীরেন্দ্রর এই বছর এম-এ. পরীক্ষা!

—কমলারও তো আই-এ. পরীক্ষা, সেটা তো আরো আগে!

বললাম অভিমানের সুরে। মা এ'কথার জবাব দিলেন না। লাগেজ নামানোর কাজে ইন্দ্রাসন তো তদারক করছে—তবু অকারণে সেদিকে দৃষ্টি ফেরালেন।...

ষ্টেশনের সীমা পার হয়ে ব্রিজের ওপর আমাদের কার উঠতেই অকারণে মা একটা নিঃশ্বাস ফেললেন। আমার কাঁধে একখানি হাত রাখলেন নিস্তেজ ভাবে। বললেনঃ

—এম্, এ পাসটা আর করতে পারলি না।

—ও আর হবে না।

—আমি কিন্তু একটা-একটা করে' সব কটা পাস করব!

বলল ফুল, দু-বছর পরে সে ম্যাট্রিকুলেসন দেবে।

—তুই থাম!

বলল কমলাঃ

—জানো বড়দা, পড়ায় তো কত ওর চাড়! বললাম, দু-একখানা বই সঙ্গে নে, তা বললে মুখ ঘুরিয়েঃ কলকাতা দেখতে যাচ্ছি—বই নিয়ে গিয়ে কী হবে।

কমলা নিশ্চয়ই তাহ'লে বইপত্তর আনছে একগাদা। দিনকতকের জন্যে আসছে, কিন্তু সময় নাকি নষ্ট করবে না একটু-ও। পড়বে। শঙ্কিত হলাম। আমাকে না জিজ্ঞাসা করে বসে লজিক কি ট্রিগ্নোমেট্রি!

খানিকক্ষণ সব চুপচাপ। হঠাৎ মাঃ

—এখন দিনরাত করিস কি?

—বাড়ী গেলেই তো দেখতে পাবে !

—একবারো সময় পাস না আমার কছে যাওয়ার, কি চিঠি লেখার ?

—মাঝে মাঝে তো লিখি !

—ভালো !

— × × ×

—কী ছিলি, কী হয়ে গেলি খোকা !

ইন্দ্রাসন এতক্ষণ ড্রাইভারের সামনে বসে নীরবে চলেছিল। হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে সে :

—দাদাবাবু কিন্তু দিনরাত পড়াশুনো করে দিদিমণি !

ইন্দ্রাসন মা-কে বলে দিদিমণি, আমাকে, দাদাবাবু। মা তাই :

—বু-কে তুমি আর খোকাবাবু বলো না কেন ?

—বলতুম তো। এখন বড হয়েছে, কত বড় বড় লোক সব আসে, কত খাতিরের মানুষ এখন, এখন কি...

বড় ভালো লাগল ইন্দ্রাসনকে। যেন নিম্নতম একটা অন্ধ-গভীর গহ্বর থেকে আলোকের আকাশে আমাকে সে টেনে তুলল আচম্বিতে, অপ্রত্যাশিত ভাবে। মা বললেন :

—খোকাবাবুই ব'লো !

ইন্দ্রাসন হাত তুলে একবার মাথায় ঠেকিয়ে বলল :

—আচ্ছা,

আমার দিকে চাইল তারপর। হাসলাম।

—বাইরের লোকদের কাছে বলবো দাদাবাবু আর দিদিমণির কাছে, খোকাবাবু—

কুক দিয়ে হেসে উঠল ফুল আর কমলা। তখন আমি :

—আর এদের একজনকে ব'লো কচিখুকী আর একজনকে, বুড়োখুকী।

তীব্র প্রতিবাদ জানাল দুইবোনে-ই। মা-র গম্ভীর মুখে একটু হাসির আভাস দেখতে পেলাম।

—দিদিমণির মেয়েরা তো আর দিদিমনি হয় না,

কৌতুকভরে যুক্তি দিল ইন্দ্রাসন।

—আর ছেলে বুঝি দাদাবাবু হতে পারে,

বলল কমলা।

—দিদিমণি এতদিন ছিল না, তাই দাদাবাবু, দাদাবাবু। দিদিমণি এল, এখন—

—খোকাবাবু,

প্রতিশোধ নিল ফুল।

চৌরঙ্গী পার হয়ে গাড়ী এগিয়ে এল বাড়ীর কাছাকাছি, থিয়েটার রোডে। মা বললেন ঃ

—অনেক জায়গায় অনেক নূতন বাড়ী দেখছি। কলকাতাকে যেন চেনা যায় না।

কমলা-ও সায় দিল মা-র কথায়। ফুলের কাছে একেবারে নূতন জায়গা এই কলকাতা। একবার সে এসেছিল বটে বয়স তখন তার তিন কি চার! সে তো না-আসারই সামিল। হাঁ করে' সে দেখতে লাগল এদিক সেদিক।—কলকাতাটাই সব থেকে ভালো, বলল আত্মগত। তারপর ঃ

—আজ আমাদের নিয়ে বেড়াতে হবে বড়দা।

—আজ নয়, আজ একবার দক্ষিণেশ্বর যাবো খোকাকে নিয়ে, কাল তোরা বেরুস,

বললেন মা, ফুলকে।

—আমি তো আজ যেতে পারবো না মা। সভা আছে একটা!

—আমরা এলুম, আর আজকেই সভা ?

অভিমান করল ফুল।

—কিসের সভা ?

মা জিজ্ঞাসা করলেন।

—বাড়ী এসে গেছে। চলো, বলছি!

দাদু দাঁড়িয়ে ছিলেন বারান্দায়। গেট পার হয়ে আমাদের গাড়ী বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করছে দেখামাত্র যুবকের বিক্রমে তিনলাফে এলেন নীচে। চাকর বাকরেরা চকিতে জমায়েৎ হয়ে গেল অভ্যর্থনার জন্যে। হৈ চৈ লেগে গেল মুহূর্তে।

মোটার থেকে নেমেই মা কচি খুকীটির মত ছুটে গেলেন দাদুর কাছে। প্রণাম করলেন। তারপর তাঁকে জড়িয়ে ধরলেন আনন্দে। দাদু তাঁর মাথায় হাত রেখে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন পাথরের মত।

ফুল এল। এল কমলা। প্রণাম করল।

—চাঁদের হাট বসলো বাড়ীতে

দাদু বললেন গদগদ স্বরে। তারপর দুপাশে দুজনকে নিয়ে সংগ্রামবিজয়ী সেনাপতির মত প্রবেশ করলেন বাড়ীর মধ্যে।

মা আর আমি তাঁকে অনুসরণ করলাম।

ইন্দ্রাসন তখন চাকর-বাকরদের ধমকে দিতেই ব্যস্ত।—সামান্য ওই ক-টা বাক্স নামাতে দেরী হচ্ছে কেন?—চিৎকার শোনা গেল দূর থেকে।—দেখিস্ ওটা মাটির হাঁড়ি, কাশীর চমচম আছে ওটাতে, ভাঙে না যেন।...ও সুটকেশটা আমার হাতে দে, দিদিমণিদের গয়নাপত্র আছে ওটায়।

দুপুরের আহারের পর্ব আজ একটু বেলায় মিট্‌ল। ঘরে এসে বসেছি খানিকক্ষণ, ফুলকে সঙ্গে নিয়ে মা এলেন আমার ঘরে।

—কত বই! বাব্বা!

বলল ফুল। মা বললেন:

—মিটিং-এর কথা শুনলাম বাবার কাছে। হ্যাঁ রে, ওটা নাকি সিনেমার মেয়েগুলোর মিটিং?

—শুধু মেয়েদের নয় মা, ছেলেরা-ও থাকবে ও-মিটিং-এ। তবে যতদূর শুনেছি মেয়েরাই থাকবে বেশী।

—দূর থেকে কত কথা শুনি। বিশ্বাস করি না। কিন্তু কী যে হচ্ছিস্ দিন দিন!...এতকাজ থাকতে শেষকালে ওই সব বাজে ছেলে-

মেয়েগুলোর সঙ্গে বাজে কাজে তুই মন দিবি, ভাবতে পারি নি আমরা।

—× × ×

—ও মিটিং-এ না গেলেই নয় ?

—কথা দিয়েছি মা!

—কথা দিয়ে তো অনেক কথাই আমরা ভাঙি।...তুই দক্ষিণেশ্বর চল্!

—আজ হয় না মা!

—কথা শুনবি না খোকা ?

—শুনবো না কেন ? কাল চলো না!

—না আজ-ই। মানত্ আছে।

—তবে আর কারুকে সঙ্গে নিয়ে যাও!

—তোকেই সঙ্গে যেতে হবে!

—এ তোমার অদ্ভুত জেদ।

—হুঁ!

বলে' মা উঠে গেলেন। মনটা অন্ধকার হয়ে গেল যেন। এতদিন পরে মা এলেন। দুটো মিষ্টি কথা-ও কপালে জুটল না। অদৃষ্টকে ধিক্কার দিয়ে নীরব হয়ে শুয়ে রইলাম ইজি চেয়ারটায়।...ফুল বলল :

—মাকে বলো না বড়দা তোমার সঙ্গে মিটিং-এ যাবো।

অসহায় মনে হ'ল নিজেকে। তবু বললাম :

—বলবো। তুই এখন যা।

উল্লাসে হাততালি দিয়ে ফুল বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। কিছুক্ষণ কাটল নিস্তব্ধতায়। একবার দাদুর কাছে গেলে হয়, ভাবলাম। মা এসেছেন, দাদু নিশ্চয়ই আজ তাঁর সঙ্গে, কি নাতনীদের সঙ্গে, কথাবার্তা বলছেন। গিয়ে কিন্তু দেখলাম—অন্যান্য দিনের মত দাদু ঠিক সেই রকম প্যাস ফিরে শুয়ে আছেন, তন্দ্রা যাচ্ছেন।

মার ঘরটার পাশ দিয়ে ফিরে এলাম। ঘরের দ্বার বন্ধ। বাড়ীর নীচের তলায় চাকর-বাকরেরা কাজ-কর্মে ব্যস্ত। রাঁধুনী-মার গলা শুনতে পেলাম, যোগীন্দ্রকে বলছে : কত বড়লোকের মেয়ে, কত বড়ঘরের বউ—কিন্তু দেখেছিস্, দেমাক বলে জিনিস্ নেই, নিজে এসে খুন্তি ধরলো।

ঘরে এসে বসলাম বিষণ্ণ। সমস্ত আবহাওয়াটাই যেন শূন্য বলে মনে হ'ল। বাড়ীতে সবাই আছে—অথচ আমার জন্যে যেন কেউ নেই। আমি একা, শূন্য একটা ভগ্নপ্রাসাদে যেন ঘুরে মরছি এদিক সেদিক।

এমন সময় শ্রীমতী বি কথামত ফোন করলেন। কত কাজ করেন, কিন্তু ঠিক খেয়াল আছে কোথায় কী বলেছেন, কখন কী করতে হবে।

বিষণ্ণ ভাবটা চেপে রেখে বললাম :

—মনে আছে। যথাসময়ে প্রস্তুত থাকবো !

—এখন জাষ্ট্ থ্রি ! ঠিক সাড়ে পাঁচটায় গাড়ী নিয়ে যাবো।

—অশেষ ধন্যবাদ !

—বড় ব্যস্ত। যথাসময়ে আসবো। কেমন ?...নমস্কার !

—নমস্কার !

যথাসময়ে তারপর এলেন বি। আগে একবার এসেছিলেন—নিঃসঙ্কোচে রামস্বরূপের সঙ্গে ওপরে উঠে এলেন সরাসরি। সসম্মানে তাঁকে আমার ঘরে বসালাম।...মা দেখলেন বি-কে। ভয় হ'ল, মা বি-কে যা নয় তাই একটা প্রশ্ন বুঝি করে বসবেন। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, তেমন কোনো দুর্ঘটনা ঘটল না। দাদু অবশ্য মা-কে বুঝিয়ে বলেছেন, সভায় আজ না গিয়ে উপায় নেই। তবু মার মুখ দেখে মনে হল না, মা ভালো ভাবে তা বুঝেছেন। অপ্রসন্ন মুখে তিনি ঘরের মধ্যে চলে গেলেন।

বেশ পরিবর্তন করে যাবার জন্যে প্রস্তুত হলাম। দাদুর কাছে একবার আসতে হ'ল—তিনি একটু হেসে চোখের ইশারায় আমাকে যেতে বললেন। মার ঘরে এসে দেখি ফুল সেজে-গুজে প্রস্তুত। আমাকে দেখে :

—দ্যাখো না বড়দা, মা যেতে দেবে না বলছে।

—আসুক না আমার সঙ্গে!

—না,

মা বললেন গম্ভীর কণ্ঠে। ছোট বোনদুটোর কাছে খুবই ছোট হয়ে গেলাম। দাদু এলেন এই সময়। শুনেছেন সব।

—যাক, যাক! যেতে দে বেটী!

—ও যাবে ওই সব মিটিং-এ?

—কিছু ভয় নেই রে বেটী! যাক!

—না থাক। ওকে যেতে হবে না,

আমি বললাম নীরস কণ্ঠে।

—তোরা মায়ে-পোয়ে ঝগড়া করে' বাচ্ছিটাকে কষ্ট দিস নে, নিয়ে যা দাদা!...যা ফুল...

ফুল একরকম লাফ মেরেই বেরিয়ে এল ঘর থেকে।

শ্রীমতী বি ফুলকে দেখে, তার পরিচয় পেয়ে ভারি খুসি হলেন। হাত ধরলেন তার।—কচি বোনটি, বলে' করলেন আদর। মুহূর্তে জয় করে নিলেন তাকে।

মোটারে গিয়ে উঠলাম তিনজন। দূর থেকে দেখলাম—বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছেন দাদু, মা আর কমলা।

দাদু হাত নেড়ে মাকে কী যেন বোঝাচ্ছেন।

গাড়ীতে ষ্টার্ট দিল ড্রাইভার।

—আর দশ মিনিট সময় আছে মোহন সিং,

বললেন শ্রীমতী বি, হাত-ঘড়িটার দিকে চেয়ে।

—জি,

বলে' মোহন সিং হাওয়ার বেগে এগিয়ে চলল থিয়েটার রোডের মোড় পার হয়ে টালিগঞ্জ অভিমুখে।

—আজ আপনাকে একটু বিষণ্ণ দেখছি যেন,

জিজ্ঞাসা করলেন বি

—শরীরটা সকাল থেকে তেমন ভালো নেই।

—দেখুন তো কী জুলুম আমাদের। শরীর খারাপ হওয়া সত্ত্বেও যেতে হচ্ছে।···কিন্তু উপায় তো নেই।

—আমার এমন কিছু হয় নি,

বলে' হাসলাম। সহজ হওয়ার চেষ্টা করলাম। এঁদের উদ্যম, উৎসাহ আনন্দ, আদর্শ পণ্ড করে' দে'য়ার অধিকার আমার নেই। আমার মধ্যে যাই হ'ক, দুঃখ যাই থাক, আজ আমি এঁদের সভার প্রধান অতিথি, আমার আজ—এই, এই সময়ে, অন্য কোনো পরিচয়ের আমি মূল্য দেব না। যদি দিই, তবে আমি অক্ষম। জিজ্ঞাসা করলাম :

—সভায় কী কী হবে ?

বিশেষ কিছু না, বি যা বললেন, তার সারমর্ম এই : তেমন বিশেষ কিছু না। একটু নাচ, গান, আবৃত্তি। একটু বক্তৃতা, আলোচনা, প্রধান অতিথির কথা। সভাপতির ভাষণ। সভাভঙ্গে পরস্পরের সঙ্গে আলাপ-পরিচয়। কিছু জলযোগ। এই আর কি।

—খুব রাত্রি হবে ?

—দাদুর ভয় বুঝি ?

—দাদুকে আমরা ভয় করি না। মা-র ভয়,

বলল ফুল হঠাৎ আমাদের দিকে ফিরে। মনে করছিলাম শহরের দৃশ্য দেখতে দেখতে সে অন্যমনস্ক হয়ে চলেছে। তা নয়। পাজিটার কান আছে সজাগ।

—মা-কে বুঝি খুব ভয় করো তোমরা ?

বি আদরের স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন ফুলকে।

—করি না আবার। বড়দা যে এত বড় ছেলে, সে-ই কী রকম ভয় করে !

হাসতে লাগলাম। একটু পরে হঠাৎ একরকম আচম্বিতে ঃ

—অতিথি মহাশয়ের ভাষণটি লিখে রেখেছেন তো ?

—ভয় নেই। আছে। একেবারে ছাপা জিনিষ পাবেন।

—বাঁচলাম। সত্যি কথা বলতে কি, লোকের কাছে দুটো কথা সাজিয়ে বলতে হলেই আমি অন্ধকার দেখি।

—ভারি আশ্চয্যি কিন্তু। আপনি জানেন, আপনার কথার ভঙ্গী তরুণেরা কতটা নকল করেছে ?

—সে তো অভিনয় !

—সভায় বক্তৃতাটাও কি অভিনয় নয় ?

—আমি তা মনে করি না।···আমার মনে হয় বক্তৃতাটা কথার মতই সত্য এবং সহজ। যদি তা না হয়, তবে তার শক্তি কম হয়, মূল্য কম হয়।······অবশ্য আমাকে দিয়ে আপনারা যেটা পাঠ করাবেন—সেটা বোধ হয় ভালোই হবে, কেননা তা অভিনয় হবে।

—এই অভিনয়টুকু আমাদের শিখিয়ে দিতে পারেন, তাহ'লে অনেক লজ্জা থেকে মানুষ বাঁচে। জানেন, এদেশে এমন অনেক পণ্ডিত মশাই আছেন যাঁরা দুটো লাইন পড়তে পারেন না ভালো করে, উচ্চারণ করেন যেন গোলালোকের মত ?

—তবু তো লোকে তাঁদের কথা শোনে !

—শোনে আর হাসে। অমুক নামজাদা অধ্যাপক, অমুক অকস্‌ফোর্ডের ডক্টর, অমুক মন্ত্রী, অমুক বিলেতফেরৎ আন্তর্জাতিক—কত বড় বড়

নায়, কিন্তু শুনুন বক্তৃতা, হয় হাসবেন, নয় কানে তুলো গুঁজে' বসে থাকবেন।

—আপনার বুঝি শুদ্ধ, স্পষ্ট উচ্চারণের দিকে খুব ঝোঁক!

—আপনি আর্টিষ্ট হয়ে এই কথা বলছেন?

—কিন্তু বলুন তো, অমুক ডক্টর বা অমুক আন্তর্জাতিক মহোদয়ের চরিত্রটি আপনাকেই যদি অভিনয় করতে হয়, তবে আপনার শুদ্ধ উচ্চারণের জাতটা কী হবে? নিজের মত উচ্চারণ করবেন, না চরিত্রটি যেমন উচ্চারণ করে বলে' আপনার ধারণা—তেমনভাবে করবেন?

উত্তরে শ্রীমতী বি কত কী যেন বলতে যাচ্ছিলেন, আমাদের গাড়ী সভামন্দিরের প্রাঙ্গণদ্বারে তখন পৌঁছে গেল।······

হঠাৎ 'এসেছেন' 'এসেছেন' উঠল রব।

কানের দুপাশে বেজে উঠল অসংখ্য শঙ্খ। উলু ধ্বনি হ'ল ঘন ঘন। শ্রীমতী বি ফুলের হাত ধরে' আগেই নেমে গেলেন গাড়ী থেকে। বেশ খানিকটা তফাতে গিয়ে দাঁড়ালেন তারপর।

নিজে নামতে যাচ্ছি, দ্রুত এগিয়ে এলেন একজন বর্ষীয়সী মহিলা। পরম সমাদরে গাড়ী থেকে হাত ধরে আমাকে নামালেন। মুখ তুলে' দেখি, কী সৌভাগ্য, শ্রীমতী সী!

—আপনি এসেছেন!

—হ্যাঁ বাবা। আজ-ই তো আসবার দিন। জয়ী হও!

সী-র কথার সঙ্গে সঙ্গে বিপুল উদ্যমে বাজল শাঁখ। সার বেঁধে অগ্রসর হয়ে এল একদল কিশোর কিশোরী। ফুল ছড়ালো চলার পথে। পুষ্পময় কোমল পথে সী আমার হাত ধরে' নিয়ে চললেন সভাদেশের অভিমুখে।

সভার কাছাকাছি এসেছি—হঠাৎ কিশোরের দল দুসারে বিভক্ত হয়ে গেল। মাঝের পথ দিয়ে এগিয়ে এলেন একজন অভিজাত মহিলা, প্রৌঢ়বয়স্কা, মাতৃপ্রতিমা যেন। কপালে এঁকে দিলেন তিলক, মাথায় দিলেন ধানদুর্বা। বরণ করলেন কলাসম্মত অনিন্দ্যভঙ্গীতে।

সভাদ্বারে অগ্রসর হতে-না-হতে, মাননীয় সভাপতি শ্রীযুক্ত বসু দ্রুত উঠে এলেন স্মিতমুখে।

আলিঙ্গন দিলেন পরমস্নেহে। হাত ধরে' নিয়ে চললেন আসনের সম্মুখে।

এ-সব কী ব্যাপার? এ-সবের জন্যে তো প্রস্তুত ছিলাম না। সভার প্রধান অতিথিকে এমন করে' সম্বর্ধনা করা হয় নাকি কোথাও? বি তো এর বিন্দুবিসর্গ-ও আগে আমাকে জানান নি। চারিদিকে চাইতে লাগলাম—কোথায় বি? কাকে প্রশ্ন করব—কী অর্থ এ-সব শিল্পলীলার?

বি ফুলকে নিয়ে কোথায় যেন তখন লুকিয়েছেন। সভায় প্রবেশ করলাম বিস্ময়স্তব্ধ, আত্মমগ্ন।

অনুপম সুন্দর এই সভাগৃহ। দ্বারপ্রান্তে মঙ্গলঘট রয়েছে সজ্জিত—ঘটে নিপুণহস্তের চিত্রলেখা। মেজে বিচিত্রবর্ণের আশ্চর্য আল্পনা। পূর্বকোনে সভাপতির ও অতিথির আসন। মূল্যবান একখানি গালিচার দুই পাশে তাকিয়া, তাকিয়ায় সিল্কের ওয়াড়, ওয়াড়ের ধারে ধারে সূচীশিল্পের কারু কৃতিত্ব। প্রধান অতিথির আসনের বামপার্শ্বে আর্টিষ্টদের সমাহার, সভাপতির দক্ষিণপার্শ্বে নিমন্ত্রিত জনকয়েক গণ্যমান্য মহাশয় ব্যক্তি, বোধকরি সাহিত্য সিনেমা, শিক্ষা ও সংবাদজগতের কর্ণধারেরা। সম্মুখে বেশ খানিক ফাঁকা জায়গা, ছোট্ট একটি মঞ্চ নির্মিত হয়েছে সভাদেশের পশ্চিমপ্রান্তে। শোনা গেল, দুটি বালিকা নাকি নৃত্য করবে, অভিনয় করবে।...

আমাকে পাশে নিয়ে শ্রীযুক্ত বসু আসন গ্রহণ করলেন।...সভাপতির নাম যথারীতি প্রস্তাবিত হ'ল। সমর্থিত হ'ল। শ্রীমতী বি এসে সভাপতির গলায় মালা দিয়ে প্রণাম করলেন। সভাপতি সেই মালা সস্নেহে দান করলেন প্রধান অতিথির গলায়।...ধন্য ধন্য উঠল ধ্বনি। সঙ্গে সঙ্গে আড়াল থেকে সুরু হ'ল গান। গানের তালে তালে নৃত্যের ভঙ্গীতে এগিয়ে এলেন,

এ কী, শ্রীমতী শো! এ কী রূপ! এ কী অভিনব, অপ্রত্যাশিত, অপার্থিব রূপলীলা? নাকি তিলোত্তমা সত্যসত্যই অবপ্লুতা এই পৃথিবীতে? স্বপ্ন তো নয়, মায়া তো নয়, মতিভ্রম তো নয়?

তিলোত্তমা অপূর্ব ছন্দোভঙ্গিতে পূজাভাবের প্রসন্নতা নিয়ে প্রণতার বেশে দাঁড়ালেন সম্মুখে। কমলোপম শ্রীকরদ্বয় লীলাভরে সঞ্চালিত করে' প্রকাশ করলেন বরণনৃত্যের আনন্দ। করদু'খানি সহসা প্রদীপের মত করে আরতি করলেন অদৃশ্য কোনো দেববিগ্রহের।

আবার বাজল শঙ্খ। উঠল উলুধ্বনি। বর্ষিত হ'ল পুষ্প, পুষ্পসার।

সভাপতি সহসা আমার পরিচয় দিতে উঠলেন।...কিন্তু এ-সব কেন?... ব্যাপার কী, হঠাৎ এত প্রশংসাই বা কেন?...

ভাববার কিছু সময় নেই তখন।...ভাবসম্মোহিত্যের মত উপবিষ্ট অতিথি। কৃতাঞ্জলি তিনি স্তম্ভিত কৃতজ্ঞতায়।

সভাপতির ভাষণের পর সভা হ'ল নিস্তব্ধ। নূতন একটি গান সুরু হল নেপথ্যে:

—তোমার আসন শূন্য আজি
হে বীর, পূর্ণ করো,

ধ্বনিত হ'ল। মঞ্চের যবনিকা সরে যেতে দেখা গেল অপূর্বকান্তি একটি দেবকিশোর গানের তালে তালে নৃত্য করতে করতে আবির্ভূত হ'ল দর্শকসাধারণের সম্মুখে। নৃত্য করল গভীর ভাবাবেগে। গানের তালেই মঞ্চ থেকে নামল, মাল্যহস্তে। এগিয়ে তা পরিয়ে দিল প্রধানঅতিথির গলায়। সম্মোহিত অতিথি সহসা দণ্ডায়মান হয়ে আলিঙ্গন করলেন কিশোরটিকে। চুম্বন করলেন তার ললাটদেশ।

ঘন ঘন হাততালি পড়ল আবার। হাততালির মধ্যেই নেপথ্য থেকে আবৃত্তি সুরু হয়ে গেল। সভা নিস্তব্ধ হলে বুঝলাম আবৃত্তি অনেকটা এগিয়ে গেছে:

—তার চেয়ে যবে

ক্ষণকাল অবকাশ হবে,

বসন্তে আমার পুষ্পবনে

চলিতে চলিতে অন্যমনে

অজানা গোপন গন্ধে পুলকে চমকি

দাঁড়াবে থমকি—

পথহারা সেই উপহার

হবে সে তোমার।

চমৎকার আবৃত্তি। এমন মধুর কণ্ঠের স্পষ্ট শোভন আবৃত্তি শুনিনি কখন-ও। নাকি পরিবেশ অনুসারে ভালো লাগে নাচ, গান, আবৃত্তি, অভিনয়? এই স্বপ্নময় সুন্দর পরিবেশে যা শুনব, যা দেখব, সব-ই কি লাগবে না ভালো?

কে বললে লাগবে ভালো। বেসুরো, বেতালা কিছু হলে পরিবেশের ছন্দটি যাবে না কেটে? আবৃত্তি যে ভালো লাগছে, তার কারণ পরিবেশের সৌন্দর্যটি ক্রমশঃ বর্ধিত হচ্ছে এর নৈপুণ্যে:

—বন্ধু, তুমি সেথা হতে আপনি যা পাবে

আপনার ভাবে,

না চাহিতে, না জানিতে সেই উপহার

সেই তো তোমার।

আমি যাহা দিতে পারি সামান্য সে দান—

হোক ফুল, হোক তাহা গান॥

—চমৎকার!

বলে' হাততালি দিয়ে উঠলাম আনন্দে। এমন সময় কোথায় ছিলেন বি, পাশে এসে বসলেন, ফুল এল, বসল কোনঘেঁষে

—ভালো লাগছে?

—চমৎকার, চমৎকার!

—এইবার একটি নৃত্যনাট্য হবে। পাঁচ মিনিট এখন তাই বিশ্রাম। নৃত্যটি পরিকল্পনা করেছেন শ্রীমতী শো।...গুরুদেবের 'সাগরিক' কবিতাটির ভাবালম্বনে নৃত্যনাট্য। দেখবেন। খুব চমৎকার লাগবে!... তোমার, ফুল, সভা ভালো লাগছে?

ফুল উজ্জ্বল আনন্দে মাথা দোলাল।

একটু এদিক-ওদিক নয়, ঠিক পাঁচ মিনিট পরেই শাঁখ বাজল। যবনিকা উঠে যেতে সুরু হল নৃত্যনাট্য: সাগরিকা।

সাগর উপকূলে উপবিষ্টা সুন্দরী নায়িকা।

নায়ক এলেন, করে পুষ্পশর, শিরে মকড়চূড়।...

ধ্বনিত হ'ল নেপথ্য সঙ্গীত:

জাগো জাগো

অলস-শয়নবিলগ্ন।

সংগীতের তালে তালে নৃত্য করল নায়ক। অপূর্ব সে নৃত্য-কলা। নায়কের অংশ-ও অভিনয় করছে একটি বালিকা।

নায়কের নৃত্যপুলকে পুষ্পিত হ'ল প্রেম। নায়িকা উঠে দাঁড়াল। যোগ দিতে এল নৃত্যে। প্রথমে লজ্জাভাবের নৃত্য, সরমজড়িমার ছন্দ। তারপর প্রেম প্রকাশের দীপ্তি।

ভাবের মৌনে নিমজ্জিত হ'ল সভার মনোলোক। কেউ নেই, কিছু নেই, আছে শুধু সুরছন্দের আনন্দ। স্তম্ভিত বিস্ময়ে লক্ষ্য করছি নৃত্যশিল্পের সূক্ষ্মতা।

আশ্চর্য নৃত্য। মিলনবিলাসের চারুনৃত্য। পাওয়ার নৃত্য। পূর্ণ হওয়ার সাধন-নৃত্য।...

নির্বাক পুলকাবেশে সমাধিস্থ হয়ে আছি—অকস্মাৎ নেপথ্য সংগীতে বাজল ঝড়ের ঝংকার। সাগর বুঝি গর্জন করল, বাতাস রূপ নিল

প্রলয়-ঝটিকার। সংগীত-সুরের তালে তালে 'ভাঙ্ ভাঙ্' 'রাখ-রাখ' রবে।

মিলননৃত্যের কাটল ছন্দ। তবে ঝড়-ই উঠল—বিচ্ছেদের ঝড়। ভাগ্য-বিপর্যয়ের প্রলয়ংকর প্রবল ঝড়।

ছবিছায়ার আঙ্গিকরীতি নেয়া হ'ল এই স্থানে। সাদা পর্দার ওপর আলোছায়ার সাহায্যে পেছন থেকে দেখান হ'ল—একখানি তরী চলেছে কূল থেকে অকূলে। হঠাৎ ঝড়ে ডুবে গেল তরী।

শান্ত হলে তুফান—

কূলে দাঁড়িয়ে আছে হৃতসর্বস্ব সেই নায়ক। দীনবেশ। হাতে শুধু একটা বীণা।

হারাণোর ছন্দ দুলে উঠল নায়কের নৃত্যে। থেকে থেকে দুলে দুলে ফুলে ফুলে উঠল নৈরাশ্যের হাহাকার।

তখন—

নাড়ি-ছেঁড়া বেদনার সুরে মন্দ্রিত হ'ল সভার আকাশ ঃ

হায় রে
ব্যথার কথা যায় ডুবে যায়
যায় রে।

পট পরিবর্তিত হল।

দেখা গেল, নায়িকা বিপ্রলব্ধা।

বিরহ-নৃত্যের ব্যঞ্জনা তার অঙ্গভঙ্গিতে।...তবু কি বিচিত্র কথা, কী যেন তার আছে, হারিয়ে-ও হারায় নি কী যেন—এই ভাবের দিব্যতা জাগছে তার মুখের মৌনে।

এমন সময় কে এল?

এল সেই সহায়সর্বস্বহীন দীননায়ক। নেই পুষ্পশর, নেই মকরচূড়া। এনেছে শুধু বীণা।

বীণা বাজানোর মোহন ভঙ্গীটি নৃত্যে ফুটিয়ে তুলল নায়ক।

বাজল শঙ্খ। জাগল উলুধ্বনি।

নায়িকা এল এগিয়ে, হাতে প্রদীপ। মেঘের ফাঁক থেকে চন্দ্রলেখার দিব্যতার মত একফালি ঈষৎ আশা লীলা করল তার নৃত্যানন্দে।

[illegible] আরতি নিয়ে নায়িকা দাঁড়াল নায়কের সম্মুখে।

প্রদীপখানি তুলে ধরল বরণের ভঙ্গীতে।

কমলোপম শ্রীকরদ্বয় ছন্দাবেগে সঞ্চালিত করে' স্বাগত জাগল শ্রদ্ধাসম্ভ্রমে।

আবার বাজল শঙ্খ। জাগল উলুধ্বনি।

যবনিকা পড়ে' গেল।

রুদ্ধ গম্ভীর বসে আছি আসনে। অনেকক্ষণ পরেই বুঝি সাড়া মিলল প্রাণের।

তখন সভাস্থ সকলে হাততালি দেয়া শেষ করেছে।

—কী সুন্দর!

ফুল বলছে, শুনলাম।

—ভালো লাগল?

বি[illegible]ভরে জিজ্ঞাসা করলেন।

মঞ্চের যবনিকা তখন আবার উঠছে।

এতক্ষণ মনে ছিল না শো-কে দেখি নি সভায়। দেখলাম, মঞ্চে [illegible] দাঁড়ালেন। একখানি গোলাপী রঙের সাধারণ শাড়ী পরেছেন এবার, বেশভূষার [illegible] পারিপাট্যই এখন নেই।

সভা নিস্তব্ধ [illegible] তাঁকে দেখে।

[illegible] তাঁর [illegible] একখানি, কী ওটি, ছবি তো নয়, পড়া সুরু [illegible] এ-কী লজ্জার কথা, আমাকে দেয়া হচ্ছে।

[illegible]টি [illegible] শ্লোক আবৃত্তি করলেন শো। স্পষ্ট, সুন্দর সাধু [illegible]

বাঙ্লায় সেটি ব্যাখ্যা করলেন অনবদ্য ভাষায়।

তারপর মানপত্র:

অর্থাৎ—

আমি যে একজন ক্ষণজন্মা শিল্পী, অমরতার পথে হয়েছি অগ্রসর, ফলাও করে' হ'ল বলা। শিল্পজগৎ আমার কাছে আশা করে অনেক, ধ্যানদিব্য প্রাচীন ভারতবর্ষের অমৃতনিষ্যন্দী শিল্পসৌন্দর্য আমাতে আবার প্রকাশ পাবে।

অতএব,

—হে তরুণ শিল্পী, তোমাকে নমস্কার।

তুমি আমাদের বিস্মৃত হ'য়ো না! বন্ধুরূপে, প্রিয়বন্ধু, আমরা তোমাকে স্মরণ করব অহরহঃ!

অসীম উদয়াচলে সূর্যের মত যখন তুমি আরো দীপ্যমান হবে, তখন স্মরণ ক'রো, প্রিয়বন্ধু, তোমার যৌবনজীবনের চলার পথে আমরাই ছিলাম তোমার সঙ্গী, সঙ্গিনী!

ইত্যাদি, ইত্যাদি।

সভার মাঝখানে এমনতর একটা মানপত্র-ও যে দেয়া হবে, এটা আমার জানা ছিল না। বি বলেন নি, শো-র মুখে-ও শুনি নি। এই সমস্ত অভ্যর্থনা, সম্বর্ধনা বা মানপত্র-টত্রের ব্যাপার আছে জানলে পাছে আমি সভায় না আসি—এই ভয়ে বি বা শো এটা গোপন করেছিলেন।

মাননীয়া সী-ও যে-পত্রখানি আমাকে দিয়েছিলেন, তাতে একটা সভাই মাত্র হবে, সে-সভায় আমাকে অতি অবশ্যই যেতে হবে, অন্যথা করলে চলবে না—এমনতর কথা লেখা ছিল। আসলে এ-সভাটা তাহ'লে আমাকে সম্বর্ধনা দেয়ার জন্যেই আয়োজিত হয়েছে? সভার নিমন্ত্রিত সকলেই তা-ই জানেন। সাংবাদিকদেরো তাই বলে' আনা হয়েছে।

—কেন পছন্দ করছেন না?

বললেন বি।

—করছি না বললে মিথ্যা বলা হবে। কিন্তু—

কী একটা আপত্তির কথা যেন বলতে যাচ্ছিলাম। শো এলেন মানপত্রখানি নিয়ে। দাঁড়িয়ে উঠে তা গ্রহণ করলাম মাথা নত করে।

আবার হাততালি পড়ল।

নির্দিষ্ট বক্তাদের একে একে আহ্বান করলেন সভাপতি। পাঁচ মিনিট করে' সময় দেয়া হ'ল সকলকে। তারি মধ্যে বড় সুন্দর সুন্দর কথা বললেন বক্তারা। আমার প্রশস্তি-গাওয়াটাই অবশ্য সকল বক্তারই মুখ্য উদ্দেশ্য, কিন্তু প্রসঙ্গ রচনা করে নিয়ে অনেকেই আধুনিক যুগ, দেশ, সমাজ ও সিনেমাজীবনের কথা বড় কৌশলেই উত্থাপন করলেন। সিনেমা ও নীতিজীবন সম্বন্ধে আমি যে-সমস্ত মন্তব্য পত্রে প্রবন্ধে প্রকাশ করেছি, অনেকেই, বুঝলাম, সেগুলি পড়েছেন। সেগুলি থেকে 'বয়ান' তুলে অনেকেই বেশ জোরালো প্রস্তাব সব উত্থাপন করলেন।...বয়োজ্যেষ্ঠদের অনেকে উঠলেন শুধু আশীর্বাদ জানাতে। কেউ-বা স্নেহভরে কল্যাণ-উপদেশ দিলেন মার্জিত ভাষায়। আবার কেউ-বা সিনেমাজগতের পাপের কথা তুললেন প্রসঙ্গতঃ। পাপের দূষিত হাওয়া এ-জগৎ থেকে যতদিন না একেবারে বিদূরিত হচ্ছে—ততদিন পর্যন্ত এ-জগতের দিকে ভদ্রসমাজ ও শিক্ষিতসমাজের চোখ পড়বে না—মন্তব্য করলেন অনেক।...

ঘণ্টাখানেক ধরে প্রায় দশএগারো বক্তার কথা শুনলাম—কিন্তু একঘেয়ে লাগল না একটুও। এটা কি শুধু নিছক প্রশংসা শোনার উন্মাদনায়? বক্তাদের ভাবভাষা ও মাত্রাজ্ঞান এবং সর্বোপরি শালীন সৌন্দর্য রচনার প্রতিভা কি আমাকে প্রভাবিত করল না?

নীরবে বসে আছি। চমক ভাঙল, সভাপতি মশায় যখন আমাকে কিছু বলার জন্যে আহ্বান করলেন।

হাতে তো মুদ্রিত ভাষণটি আছেই। শঙ্কিত হওয়ার কিছু নেই। উঠলাম। উঠবামাত্র, কী আশ্চর্য, নিজে থেকে কিছু বলতে ইচ্ছা গেল হঠাৎ। হাততালি সুরু হয়েছিল আমার অভ্যর্থনায়, থামতেই আমি কথা

সুরু করলাম এদিক ওদিক কোনদিকে না চেয়েই। একটির পর একটি কথা সাজিয়ে প্রায় দু-তিন মিনিট আমি অনেক কথাই গেলাম বলে'।...আমি আশীর্বাদ প্রার্থনা করলাম সকলের। আমি শক্তি প্রার্থনা করলাম ঈশ্বরের। আমি বললাম ঃ আমার প্রিয়বন্ধুরা আমার সম্বন্ধে যা ভাবে, আমি যেন তা-ই হতে পারি প্রাণপণ সাধনায়।

বক্তৃতা করছি দেখে শ্রীমতী বি. দেখলাম, আনন্দে উচ্ছ্বাসে সোজা হয়ে বসেছেন। মাননীয়া সী-র চোখদুটি স্নেহের স্বগীমতায় উজ্জ্বল হয়ে উঠল। আর শো?...একটু দূরে বসে আছেন শো, কা ভাবছেন কে জানে, নয়ন মুদ্রিত করে' প্রস্তরপুত্তলীর মত আছেন উপবিষ্টা।

বক্তৃতা করতে করতে সুর ও তালের সামঞ্জস্য রক্ষা করেই লিখিত অভিভাষণে আমি প্রবেশ করলাম। বেশ খানিকটা অগ্রসর হয়েছি, দেখলাম, শো চোখ মেলে গালে হাত দিয়ে বসেছেন।

—ঈশ্বরের আশীর্বাদ আর আপনাদের শুভেচ্ছা শিরোধার্য করে' আমরা অগ্রসর হয়েছি, সমাজজীবন ও সিনেমাজগৎ'কে আমরা কলুষমুক্ত করবো।...সমাজকে শিক্ষা দেবার অহংকার আমরা করি নে, কিন্তু আমরা চাই, আমাদের জীবনশিল্প এমন আনন্দ প্রকাশ করুক, যার প্রভাব কোনো তপস্বী অধ্যাপকের জ্ঞানগর্ভ উপদেশের চেয়ে কম শক্তিশালী হবে না।

—সাধু! সাধু!

উঠল রব।

—দুঃখী আমাদের জাতি, দরিদ্র আমাদের দেশ। এই সভার আভিজাত্যময় আনন্দপরিবেশকে অস্বীকার করি না, অভিজাত শিল্পরুচির মার্জিত রসবিলাসকে আমি মূল্য-ই দিই, কিন্তু এর দ্বারা আমাদের জাতি ও দেশের সাম্প্রতিক রূপটি ধরতে পারা তো সম্ভব না।...আমি জানি, এই জাতীয় সভায় এটা উল্লেখ করা একপ্রকার রসাভাস, তবু না বলে' তো পারছি না ঃ আমরা যখন গানে, নৃত্যে, ভাবে আনন্দে বিভোর রয়েছি, তখন-ই কত মানুষ অন্নাভাবে রয়েছে শুখিয়ে, বস্ত্রাভাবে করছে আত্মহত্যা

বাসার অভাবে কাঁদছে ফুটপাতে পড়ে। এদের কি আমরা চিনি? শিল্পীদের সঙ্গে এই সব সহায়সর্বস্বহীন আর্ত মানুষগুলির কী সম্বন্ধ? আমরা, শিল্পীরা, তাদের থেকে কি ভিন্ন? তাদের কোনো কথা আমাদের চিত্তকে কি চঞ্চল করে না? আমাদের চিত্রে তাদের মহিমা কি প্রকাশ পেতে পারে না শিল্পসৌহার্দে?

—শুনুন, শুনুন!

বলে' উল্লাস প্রকাশ করলেন সভাপতি বসু।

—রাজনৈতিক উদ্দেশ্যসাধনে এই সব 'মূক মুখে'র কথা বলা বা চিত্র আঁকা এক কথা, আর সত্যকার আত্মিক ভালবাসায় উদ্বুদ্ধ হয়ে এদের আপন বলে' জানা আর কথা।...আমরা শিল্পী, রাজনীতির প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করি না বটে, কিন্তু তার নির্দেশকে, হুকুমকে, শিল্পবিষয়ের সারবস্তু বলে' মানতে পারি না। অন্তর্জীবনের প্রসন্ন প্রেমকেই শিল্পসত্তার সারশক্তি বলে' জানি, আর তার-ই সাধনা করি অন্তরেবাহিরে।

—× × ×

—কিন্তু ভোগজীবনই যদি প্রবল হয়, এ-প্রেমের সাধনা হবে কথার কথা, মিথ্যাকথা। আর এই জন্যই—দুঃখী এই ভারতবর্ষের সত্যচিত্র অংকন করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হবে না। শিল্পীকে তাই যোগী হতে হবে অন্তরে, যোগ দিতে হবে দেশের সুখদুঃখ আশানৈরাশ্যের সঙ্গে। ব্যক্তিগত মোহবিলাস ত্যাগ করে' সত্যই যদি জাগরিত হই সমষ্টির চেতনায়, আমাদের শিল্প মুষ্টিমেয় কয়েকজন ভোগবিলাসী অভিজাতের জন্যই নির্দিষ্ট থাকবে না, আপামর জনসাধারণের তা উপভোগ্য হবে, সম্পদ হবে।

—জয়যুক্ত হও বাবা!

সভার মধ্য থেকে আশীর্বাদ করলেন শ্রদ্ধেয়া সী।

—আপনাদের আশীর্বাদ আমি মাথায় পেতে নিলাম। চলার পথে এ আমার পরম পাথেয়!...

সী-র আশীর্বাদ পেয়ে তাঁর দিকে দৃষ্টি রেখে নিজে থেকে কথা কয়টি বললাম। তারপর পুনর্বার চোখ ফেরালাম মুদ্রিত ভাষণটির বৈদগ্ধ্যে :

—অহরহ আমি অন্বেষণ করে' চলবো—কোথায় সেই শিল্পী, সেই প্রেমিক, সেই যোগী, সেই সর্ব অবস্থায় অবস্থিতচিত্ত মহান রসবেত্তা—নিন্দা পেয়ে-ও যিনি মুহূর্ত-ও নামবেন না নৈরাশ্যে, স্তুতি পেয়ে-ও, আত্মা হারাবেন না অহংকারে...আশীর্বাদ করুন, সৌন্দর্যসাধনায় মানবাত্মার মুক্তি আনাই যেন আমাদের ব্রত হয়! মান আসে আসুক, কিন্তু তা-ই আমাদের আদর্শ নয়, অর্থ আসে আসুক—কিন্তু তা-ই নয় একমাত্র কাম্য, লোকপ্রতিষ্ঠা হয়, ভালো, কিন্তু তার-ই জন্যে যেন আত্মাকে বিক্রয় করে' না বসি! সুন্দর জীবনে সুন্দরতম মহান প্রেমের ইচ্ছা পূরণেই যাঁর আনন্দ—তরুণ ভারতবর্ষে আবির্ভূত হ'ন তিনি—আমরা তাঁকে আহ্বান করছি ব্যাগ্র প্রতীক্ষার আনন্দে!...

—সাধু, সাধু!

—বেঁচে থাকো বাবা!

বক্তৃতা পাঠ শেষ করলাম।...হাততালি বেজে রইল দুইমিনিট কাল, আমার কিন্তু সেদিকে তখন কান ছিল না। কথার মন্ত্রে আমি তখন সম্মোহিত। কথাগুলি, হ্যাঁ, আমারই বটে! পত্রে-পত্রিকায় এই জাতীয় কথাই তো আমি লিখে থাকি। এই ভাষণের লেখক কি লেখিকা নিশ্চয়ই আমাকে জানেন, আমার রচনাবলীও পাঠ করেন গভীরভাবে।... সে যাই হ'ক, এ-ভাষণের ভাষাটা তো আর আমার নয়। এ যেন আমাকে উদ্বুদ্ধ করার একটা অভিনব আয়োজন। এ যেন দৈববাণী। আমাকে যেন ক্ষুদ্র গৃহকোন থেকে জনতায় টেনে এনে বলা হ'ল : প্রেম জানো। হও। করো। প্রেম সঞ্চার করো দেশে। মানবসমাজে। ত্যাগ করো আত্মরতি। ভোগবিলাস। হও যোগী। সত্যকার শিল্পী।

হবো, হবো—বললাম মনে মনে চিৎকার করে। হাততালি থেমেছে তখন। আর একবার সভাপতি উঠলেন আমার ভাষণের প্রশংসা করতে।

এবার দেখলাম শ্রীমতী বি সভাপতি মশায়ের কথাগুলি দ্রুত লিখে নিলেন।... শ্রীমতী শো উঠলেন সভাস্থ সকলকে ধন্যবাদ দিতে। দু'চার কথা তিনি বললেন, কিন্তু মনে রইল, লেগে রইল মনের গোপনে—ভালো ছবির স্বপ্নের মত, পুষ্পিত গোলাপের গন্ধের মত।

হাত তুলে তাঁকে নমস্কার জানালাম।

সভা শেষ হল।...

সভা থেকে বার হলাম রাজ-আভিজাত্যে। যেন চলতে জানি না, আমাকে পরম সমাদরে ধরে ধরে নিয়ে যাওয়া হ'ল বিশ্রামাগারে।

ফুল এল আমার সঙ্গে সঙ্গে।

সভাপতি বসু মশায় অনেকক্ষণ অনেক কাজের ক্ষতি করে' শিল্পীদের সম্মানে ছিলেন বসে—কিন্তু আর থাকতে চাইলেন না। সী-ও বললেন, বুড়ো হয়েছি। অনেক রাত হলো বাবা।...শ্রীমতী বি এবং বি-র পিতৃদেব শ্রীযুক্ত চৌধুরীর পীড়াপীড়িতে সামান্য কিছু জলযোগ করেই তাঁরা যে যাঁর মোটারে গিয়ে উঠলেন। আমার-ও তো গেলে হয় এইবার!

—রাত কত হ'ল?

বি-কে জিজ্ঞাসা করলাম। বি ফিক করে' হেসে বললেন:

—যাবার কথা ভাবছেন? আজ বোধ হয় কিছু বেশি বকুনি খাবেন! দশটা বেজে গেছে কখন!

তারপর ফুলের দিকে চেয়ে:

—খিদে পায় নি ফুল?

—এই তখন তো কত খেলুম!

ফুল বলল।

—ওর এক প্রস্থ তাহ'লে হয়ে গেছে? কখন হ'ল?

—ওই যে যখন আবৃত্তি হচ্ছিল!

বলল ফুল।

—বটে!

—বোনের ওপর ঈর্ষা করবেন না, আপনার-ও হবে!

হেসে কৌতুক করলেন বি।

—না, না!

ব্যস্ত হয়ে বললামঃ

—আমাকে এখুনি ছুটি দিন শ্রীমতী বি!

—সে কি হয়!

বলে' একরকম টানতে টানতেই আমাকে খাবার ঘরে নিয়ে এলেন শ্রীযুক্ত চৌধুরী। একটা চেয়ারে বসিয়ে দিলেন বন্ধুর সমাদরে। নিতান্ত অসহায়ের মত তখন বললামঃ

—দেখুন, আমার কথাটি আপনারা বুঝে দেখুন। কতদিন পরে আজ বাড়ীতে মা এসেছেন। নিজের হাতে হয়ত তৈরী করেছেন কত কী। আমি যদি বাড়ীতে আজ না খাই ভারি দুঃখ করবেন তিনি!

—মা খুব রাগ করে' আছেন বড়দার ওপর!

বলল ফুল। শঙ্কিত হলাম—কেন, কী বৃত্তান্ত—হয়ত কৈফিয়ৎ দিতে হবে এখনি। কিন্তু না, খাওয়া নিয়ে সকলে ব্যস্ত, বেঁচে গেলাম ফুলের কথায় কেউ কান দিল না।

শো-কে ডেকে আনলেন বি। শো-কে সব কথা বললাম। শুনে শোঃ

—মা এসেছেন?

—হ্যাঁ, আজ-ই সকালে!

—তবে বি, ওঁকে ছেড়ে দাও!

—কিছু খাবেন না?

বললেন শ্রীযুক্ত চৌধুরী। উপরোধে একটা সন্দেশ মাত্র খেলাম। ফুলকে কেউ-ই অবশ্য ছাড়ল না। খাওয়ালো একরকম ধরে বেঁধে।

খাওয়ার পর্ব চলছে। এল সু। সত্যি সু-র কথা একবার-ও এখানে মনে পড়ে নি।...

—বাঃ, বাঃ, সব রেডি!

কৌতুক করল সুঃ

—অবশ্য যথাসময়ে আসাই আমার অভ্যাস!

শ্রীমতী বি হাসলেন। তাড়াতাড়ি একখানি চেয়ার এনে দিলেন তার কাছে। প্লেট এল সঙ্গে সঙ্গে।

—চমৎকার!

বলে' সুরু করল সু মুহূর্ত বিলম্ব না করে'।

—কোথায় ছিলে বন্ধু?

জিজ্ঞাসা করলাম।

—বাড়ীতে!

একটা মাছের ফ্রাই-এ কামড় দিয়ে বলল সু।

—আমাকে সভায় ভিড়িয়ে দিয়ে বেশ তো সরে রইলে! এলে না কেন?

—কেন আসবো? আমি সম্বর্ধনা ডাকলে শো আসে না, শো ডাকলে আমি আসবো কেন?

—এমনি ছেলেমানুষ আপনি?

বললেন শ্রীমতী বি। হাসতে লাগলেন।

—সত্যিই শেষ পর্যন্ত আপনি এলেন না?

বললেন শ্রীমতী শো। শো-র কথার সামাজিকতাটুকু মনে মনে বেশ উপভোগ করলাম। মুখে-চোখে সে-ভাবটি বোধ হয় বড স্পষ্ট হয়ে প্রকাশ পেল। শো তা দেখে লজ্জিত হলেন। বি-র পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন। বি তখন অন্যান্য অতিথি অভ্যাগতদের আপ্যায়ন করছেন।...

—সভা হ'ল কেমন?

সু জিজ্ঞাসা করল।

—এলে না তো! এলে বড় আনন্দ পেতাম!

—আরে তুমি-ও যেমন। চার-পাঁচঘণ্টা ভদ্রভাবে সভায় বসে থাকা— ও তোমার শোভা পায়।

—আমার সম্বর্ধনাসভায় তুমি নেই, এটা যেন অবিশ্বাস্য। আগে তুমি এ-রকম সভা কত অরগানাইজ করেছ।

-তা করেছি,

বলতে বলতে আমার কানের কাছে মুখ নিয়ে এল সু। তারপর মৃদুস্বরে ঃ

—জানো তো আমি কত দুর্বল মানুষ। কত হিংসা, কত ঈর্ষা আমার মধ্যে। মাতালের মনকে কি বিশ্বাস আছে বৃ?

—কী সব যা তা বলছ।

—যা তা নয় বৃ। শো-কে আর আমি কখন-ও ভুল বুঝতে চাই না!...উঃ প্রচুর খাওয়া হ'ল। তুমি যে খেলে না!...

—মা-র হাতে গিয়ে খাবো। মা এসেছেন আজ।

—এসেছেন?

সু উঠে দাঁড়াল উৎসাহে।

—চলো যাই! দেখা ক'রে আসি!

—ওকি উঠলেন!

বি ছুটে এলেন ঃ

- আর কী চাই তা তো বললেন না?

—ধন্যবাদ। যথেষ্ট খেয়েছি। ধন্যবাদ!

—ওঠো ফুল, আর খায় না!

—বা রে!

—বি বললেন একটু যেন ক্ষুণ্ণ হয়ে ঃ

—নিজে-ও খাবেন না, বোনটাকেও খেতে দেবেন না!

—বোন?

সু কী যেন চিন্তা করল মুহূর্তকাল, তারপর উল্লাসে ফেটে পড়ে ঃ

—আরে, আরে সেই ফুলটা এত বড় হয়েছে!

—দেখেছ আগে?

—দেখিনি আবার। ও তো কলকাতায় এসেছিল। তখন স্ত্রী বেঁচে। মনে পড়েছে। বাড়ী নিয়ে গেছলাম। তখন এতটুকু কচি মেয়ে। বিজয়া বলেছিল, বড় সুন্দর খুকীটি। ফেরাতে ইচ্ছা করছে না। মনে পড়ছে।

ফুল উঠে দাঁড়িয়েছে তখন। সু বলল ঃ

—চলো, চলো ! মাকে কতদিন দেখি নি !

—একটু আসছি,

বলে' শ্রীমতী বি দ্রুত এগিয়ে গেলেন তাঁর বাবার কাছে। শো-কে একটু আড়ালে ডেকে নিলেন কী যেন বলবার উদ্দেশ্যে।

—তোমাকে বাড়ী পেঁছে দেয়ার ভার আছে আমার ওপর, সম্রাজ্ঞীর আদেশ। নইলে কে আসত এই ভিড়ে হট্টগোলে।

বলল সু ঃ

—তা এসে ভালো হ'ল। মা-র খবর মিলল। বোনটীকে দেখলাম।

বলে' পরমাদরে সু ফুলকে কাছে নিল টেনে।

শো এলেন। ফুলকে সু-র কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে আমার দিকে চেয়ে বললেন ঃ

—বি বলছেন, তিনিই আপনাকে বাড়ী পেঁছে দেবেন।

—বেশ তো !

—আমার ওপরই তো ও-ভারটা রয়েছে !...মা এসেছেন শুনেছি। আমি-ই যাই না !

—সে তো কাল গেলেও পারো !

শো বলল অস্ফুট সুরে।

—যথা আজ্ঞা।...মাতৃদর্শন ললাটে আজ নেই। বিদায় ব্র !

শ্রীযুক্ত চৌধুরী এলেন কৃতাঞ্জলি।

—এবার একটু বিশ্রাম নিন' !

বললাম সৌজন্য দেখিয়ে। চৌধুরী হাসলেন। বললেন ঃ

—আপনারা সব এসেছেন। কী সৌভাগ্য।...দেখুন, আমি ভাবছি—আমার বাড়ীতে এসেছেন, আমাদেরি কারুর যাওয়া উচিত আপনার সঙ্গে।

—আমি আপনাদের কারুর মধ্যে কি গণ্য নই ?

বলল সু !

—তা বলছি নে। তা বলছি নে !

—আপনি আমাদের হয়ে শ্রীমতী শো-কে পেঁছে দিন !

বললেন বি।

—তাতে আমার আপত্তি নেই অবশ্য।...আসুন শ্রীমতী শো!

– দাঁড়ান, মিঃ বৃ-কে আগে গাড়ীতে তুলে দিই!

—এখনি ব্যবস্থা করছি!

বললেন শ্রীযুক্ত চৌধুরী।

সভা থেকে ফিরলাম, রাত এগারোটায়। মা, দেখলাম দাঁড়িয়ে আছেন বারান্দায়, প্রস্তরমূর্তি।

বি মোটর থেকে আমার সঙ্গে নামলেন। হাত ধরে নামালেন ফুলকে। গাড়ীর ভেতর থেকে তারপর ফুলের তোড়া, মালা আর মানপত্রখানি দিলেন ফুলের হাতে।

নমস্কার করলেন হাত তুলে।

—খুব কষ্ট দিলাম!

বললেন সুমিষ্ট সৌজন্যে।

হয়তো এর উত্তরে বেশ ভালো কয়েকটি কথা-ই বি-কে শোনাতে পারতাম। কিন্তু মা-কে দেখে, ওই ভাবে দেখে, কেমন 'যেন অস্বস্তি বোধ হ'ল। যা হক একটা বললাম। বললাম নির্বোধের মত:

—না, না, কষ্ট আর কী!

—আচ্ছা, রাত অনেক হ'ল। আর আপনাকে আটকাবো না!

তারপর একটু কৌতুক করে:

—রাতে যদি মা বা দাদুর কাছে বকুনি খান, নিশ্চয়ই আমাদের মনে পড়বে!

বলা উচিত ছিল:

—আপনাদের মনে পড়বে কারণে অকারণে,

কিন্তু বললাম:

—কি যে বলেন!

—আচ্ছা চলি! চলি ছোট বোনটী!

ফুল মাথা দোলাল।

চলে গেলেন বি।

বারান্দায় উঠে এলাম আমরা ভাইবোন। ফুলের হাত থেকে ফুলের তোড়াটি নিয়ে মা-র পায়ের কাছে রাখতে গেলাম। মা বললেন নীরস কণ্ঠে :

—তোমার ঘরে রাখো গে!

ফুল হাঁ করে' দাঁড়িয়ে রইল। কিছু বুঝল না ব্যাপারটা।

সভা থেকে যে আনন্দস্বপ্ন নিয়ে এসেছিলাম মুহূর্তে তা যেন ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল।

কিছু না ব'লে ঘরের দিকে অগ্রসর হলাম। মা বললেন :

—বাইরে খেয়ে এসেছ, না এখানে খাবে?

—খেয়ে এসেছি!

—ভালো!

—না মা, বড়দা কিছু খায় নি! আমি খেয়েছি!

—তবে যে বলছ খেয়েছি!

—খেতে ইচ্ছে নেই।

—কী হয়ে গেছ খোকা!

—আমি কী হয়ে গেছি আসা অবধি তাই তো কেবল ভাবছ মা, কিন্তু তুমি কী হয়ে গেছ একবারো তো ভাবছ না!

—× × ×

—বড়দাকে কেন বকছ মা?...জানো মা, বড়দা ইজ্ এ গ্রেট্ ম্যান! চলো না ঘরে, এটা পড়ে দেখবে!

ব'লে' ফুল ফ্রেমে-বাঁধা চিত্র-বিচিত্র মানপত্রখানি একটু উঁচু করে' তুলে মাকে দেখাল।

কি জানি কেন, রাগ চড়ে গেল মাথায়। ফুলের হাত থেকে মানপত্রখানা নিলাম ছিনিয়ে। ছুঁড়ে ফেলে দিলাম বারান্দার তলায়।

কাঁচ-ভাঙার শব্দে রাতের মৌন আঁত্‌কে উঠল ঝন্‌ঝনিয়ে। দু-একজন চাকর 'কি হ'ল' বলে' ছুটে গেল বাইরে।

মা দাঁড়িয়ে রইলেন পূর্ববৎ প্রস্তরমূর্তি।

ঘরে এসে দরজা বন্ধ করলাম।

সকালবেলায় দাদুর ঘর থেকে ডাক এল। কাল রাত্রে কিছুই খাই নি—দাদুর কানে এটা নিশ্চয়ই গেছে—তাই আকস্মিক এই ডাকের অর্থ কী, বুঝতে বিলম্ব হ'ল না। মনটাকে বেশ কঠিন করেই উপস্থিত হলাম দাদুর ঘরে।...দেখলাম আমার প্রাতরাশের ব্যবস্থা দাদুর ঘরেই আজ করা হয়েছে।...কমলা ও ফুল সেখানে দাঁড়িয়ে আছে পুতুলের মত নীরবে।

মনের রাগটা, অকারণেই দ্বিগুণ বর্ধিত হ'ল।

দাদু বললেন ঃ

—ব'সো!

— × × ×

—ব'সো!

দাদু বললেন কঠিন গাম্ভীর্যে।

বসতেই হ'ল।

—কাল রাত্রে কিছু খাওনি, এটা খুব অন্যায় করেছ বৃ!

— × × ×

—আচ্ছা খেয়ে নাও!

—খেতে ইচ্ছে নেই!

—নেই?

দাদু চুপ করে রইলেন কিছুক্ষণ। তারপর ঃ

—বাইরে এত বড় হয়েছ, ঘরের মধ্যে এমনি ছেলেমানুষী!

—ঘরের মধ্যে এসে তো বুঝতেই পারি না আমি বড় হয়েছি। যে রকম ব্যবহার সব তাতে তো মনে হয়—আমি একটা মদখোর দুষ্ট মাতাল ছাড়া আর কিছু না।

—তর্ক রাখো!

—তুমি দাদু, বিচার করবে না?

—কার বিরুদ্ধে নালিশ করছ মূখ্যু?...তোমার শিক্ষাদীক্ষা কি লোপ পেয়েছে?

—শিক্ষার অহংকার করি না!

—অশিক্ষার বড়াই করো! ছি!

—আমি আর এ বাড়ীতে থাকতে চাই না।

—সেটা বুঝতেই পারছি।...বেশ!...

উঠে পড়লাম সবেগে। মা এলেন ছুটে। হাত ধরলেন চেপে:

—ব'স্ খোকা!

মাকে এক রকম ধাক্কা দিয়েই ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম।...ঘরে এসে দেখা হ'ল সু-র সঙ্গে। সু আবার পাছে আমায় ধরে টানাটানি করে, এই ভয়ে শান্তভাব ধারণ করলাম তার কাছে। বললাম:

—মা দাদুর কাছে আছেন, তুমি সেখানে গিয়ে বসো সু, আমি আসছি!

বলে' দ্রুত আমি লঙ্ কোটটা গায়ে গলিয়ে নিলাম। মণিব্যাগটা নিলাম, নিলাম আরো দুটো একটা দরকারী জিনিষ। আলমারী থেকে সব কখানা নোট-ও নিলাম সঙ্গে।

—যাচ্ছ নাকি কোথায়?

—এখনি আসছি!

—এত তাড়াতাড়ি করছ যে! ব্যাপার কী?

—এসে সব বল্‌ছি!

হতভম্বের মত বসে রইল সু। ভাবল বুঝি বিপদ ঘটেছে কিছু। দ্রুত বেরিয়ে এলাম বারান্দা পেরিয়ে সিঁড়ির কাছাকাছি।

ফুল ছিল দাঁড়িয়ে। ধরল।

—সরে যা এখান থেকে!

বললাম ক্রুদ্ধস্বরে। অদৃষ্ট ভালো, তখন ইন্দ্রাসন ছিল না সেখানে। বেরিয়ে গেলাম বাড়ী থেকে।

এতটা রাগ করা আমার পক্ষে হয়তো সঙ্গত হ'ল না। কিন্তু আত্মাভিমানে আমি সত্যসত্যই সম্বিত হারালাম। বাইরে আমার এত

যশ, প্রতিষ্ঠা, আর ঘরের মধ্যে এমনি তিক্ততা, এমনি অশান্তি, চিরটা কাল আমাকে খোকা বানিয়ে রাখার এমনি দুশ্চেষ্টা—আর আমার ভালো লাগলো না। আগুন জ্বলল মাথায়—সেই আগুন বুঝি পোড়াতে চাইল সব মায়া, সব বন্ধন।—কে মা, কে দাদু, চাই না কারুকে। একা হতে চাই, হবো একা। ছোট দুটো বোনের সামনে, চাকর-বাকরদের সামনে সম্মান যার অক্ষুণ্ণ থাকে না, একা না হলে সে মরবে, পলে পলে উপহসিত হয়ে মরবে!

গতরাত্রে খাওয়ার জন্যে মা আমাকে একবারো অনুরোধ করেননি, ফুল ডেকেছিল, কমলা এসেছিল ডাকতে, ইন্দ্রাসন এসেছিল দাদুর ভয় দেখাতে, দাদু তখন নিদ্রিত, কেউ আমাকে দরজা খোলাতে তাই পারেনি। মা একবার ডাকলে কী হ'ত জানি না,—না ডেকেছেন, ভালোই করেছেন, তা' আজ আবার হাত ধরা কেন, 'চরিত্রহীন অধম' ছেলেটাকে স্নেহ দ্যাখানো কেন? গুরুদেব আসছেন, হতভাগাটা এখন দূরে সরে গেলেই তো বাড়ীর মঙ্গল!

আগুন জ্বলল মাথায়। সেই আগুন দগ্ধ করল বুদ্ধি, বিবেচনা, সংযম।... পথে একটা ট্যাক্সী ভাড়া করে'—ভালো কি মন্দ বিচার করলাম না, সোজা চলে এলাম শো-র বাসায়। দারোয়ান আমাকে দেখে চিনতে পারল। উঠে দাঁড়াল। ভেতরে খবর পাঠাতে মথুর এল নেমে। সে-ও চিনল। তার কাছে শুনলাম, শো-র আজ ওস্তাদজীর আসার দিন, এসেছেন, নাচের পরীক্ষা নিচ্ছেন, শেখাচ্ছেন।

শো-র তপস্যায় বাধা দেয়া সঙ্গত হবে না, গাড়ীকে ঘুরতে বললাম তৎক্ষণাৎ।

কোথায় যাবো এইবার? মুহূর্তে তা স্থির করে' ফেললাম। এলাম সু-র বাড়ীতে। সু নেই জানি। তবু তার বাড়ীতে এসে ভৃত্য কালোকে ডাকলাম। দরজা খুলে দিতে বললাম নিচের ঘরের। ট্যাক্সীর ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে আশ্রয় নিলাম সু-র বৈঠকখানায়।

প্রায় মিনিট পনের কাটল। সু-র দেখা নেই। ভালো লাগল না

আর পড়ে থাকতে। কিন্তু কোথায় আর যাবো ছাই? এত মানুষ আমাকে চায়, ভালবাসে বলে' শুনি—কিন্তু আশ্রয় নেয়ার মত কোনো জায়গাই, সত্যি, আমার নেই।...বড় অসহায় মনে হ'ল নিজেকে। সত্যি কেউ নেই!...বি-র কাছে যাবো?...স্ট্রেঞ্জ! এটা মনে হ'ল কী করে'? ওটা মনে হওয়া তো একটা শোচনীয় অভব্যতা। বি আমার কে? কী তার সঙ্গে সম্বন্ধ?

আচ্ছা—

চকিতে চিন্তা করে' নিলাম যাব কোথায়।

কালোকে ডেকে' দরজা বন্ধ করতে বললাম।

—সু তো এখন-ও এল না কালো, এলে বলিস্, এসেছিলাম।

বেরিয়ে পড়লাম রাস্তায়। ট্যাক্সী করে' সোজা চলে' এলাম সী-র বাড়ীতে। কড়া নাড়তে ঝি এল। দরজা দিল খুলে। সী আছেন কিনা জিজ্ঞাসা করাতে, বলল ঝি:

—মা পুজোয় বসেছেন। তা বসেছেন অনেকক্ষণ। এইবার উঠবেন!... একটু অপেক্ষা করবেন?

—নীচের ঘরে তবে বসি?

—খুলে দিই।

নীচে বসে রইলাম অনেকক্ষণ। বোধ হয় আধঘণ্টা।

সী নামলেন। আমাকে দেখেই কপালে করাঘাত করলেন স্নেহমূর্ছিত সংকোচে, বিষাদে। তারপর:

—হা রে আমার কপাল!

বললেন খেদের সুরে:

—তুমি বৃ—মাথার মণি, এতক্ষণ নিচে বসে আছ কাঙালের মত?... এসো, এসো!—

ওপরে গেলাম। সী বললেন:

—তা হঠাৎ এই সকালবেলা?...কী ব্যাপার বাবা?

সী-কে একটি-একটি করে' সব কথাই বললাম। বলতে দ্বিধা হ'ল না একটু-ও। মনের তিক্ততা পারলাম না চাপতে। বললাম:

—বাইরে আপনারা আমাকে এত বড় করছেন, কিন্তু ঘরের মধ্যে কত ছোট হয়ে যে আমাকে থাকতে হচ্ছে।...আর, মা, সহ্য হচ্ছে না যেন। বাড়ী আর ফিরবো না, এইটি স্থির রেখে উপদেশ দিন কী করবো।

স্নেহোজ্জ্বল সহানুভূতির আলোয় সী-র চোখ চক চক করে' উঠল। অনেকক্ষণ নীরব থেকে তিনি বললেন:

—ভালো করো নি বু, বাড়ী থেকে এমনভাবে বেরিয়ে এসে। খুব-ই ছেলেমানুষী করেছ।...আদরে-গোবরে মানুষ, একটুকু তিক্ততা পারো না সহ্য করতে।

একটু থেমে পুনরায়:

—মা-র ওপর রাগ করে' এদিক-সেদিকে কতক্ষণ ঘুরবে বু? মা, মা-ই। ভুল করে' অভিমান করছেন, ভুল ভাঙ্‌লেই বুকে নেবেন তুলে! বুকে নিতে পারছেন না, এ-জন্যে তাঁর কী যে কষ্ট—তুমি শিল্পী হয়েও তা বুঝতে পারছ না?

—× × ×

—এখনি গিয়ে দেখো গে, তোমাকে নিরাপদে ফিরিয়ে দেয়ার জন্যে কত দেবতার মানত করে' বসেছেন। মায়ের প্রাণ, বু, তোমরা সন্তানেরা, যতই বুদ্ধিমান হও, বোঝো না।...তা নইলে এমন ছেলেমানুষী করো?...ছি!

'মানতের' কথা উঠতে বুকটা কেমন-যেন গুরু গুরু করে' উঠল। মা আমাকে নিয়ে গতকাল দক্ষিণেশ্বর যাবেন বলে জিদ করছিলেন—স্মরণে এল।...মা আকুপাকু করে অসহায়ভাবে চেষ্টা করছেন—কী করে' দেবতাদের দয়ায় তাঁর চরিত্রহীন বয়াটে ছেলেটা আবার সৎপথে আসে! করুণার্ত হ'ল মনটা। কিন্তু অভিমান-ও জাগল সঙ্গে সঙ্গে।...এত অবিশ্বাস, এত সংশয়—জানা নেই, বোঝার বালাই নেই, স্নেহভরে দুটো মিষ্টি কথা বলে' সন্তানের মান রাখার ধৈর্য নেই, এই নাকি মা-র কাজ!

সী বললেন:

—মা-ও যে মেয়েছেলে বাবা। যেখানে সেটা মেয়েছেলে মাত্র, সেখানে সে আর সকলের মতই ভুল করে, কিন্তু, যেখানে তিনি মা, সেখানে তাঁর ভুল কখন-ও হয় না!

নাঃ, বাড়ী ফিরতে তা'বলে' আর চাই না।

আজ যখন এ-সব ইতিকথা শান্তভাবে লিখে যাচ্ছি তখন কৌতুক যে জাগছে না তা নয়, কিন্তু, এ-থেকে জীবনের যে সত্যটি উপলব্ধি করেছি তা তো উপেক্ষা করতে পারি না।...মনে পড়ছে গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ মাঝে মাঝে ছাত্র ও শিক্ষকসমাজকে তত্ত্বোপদেশ দেয়ার জন্যে ক্লাস নিতেন বৃদ্ধ বয়সে-ও। তিনি বলতেন, মানুষের মধ্যে আছে দ্বৈতসত্তা: অহং আর আত্মা। আত্মার জয়গান তিনি গেয়েছেন, কিন্তু প্রাচীন শাস্ত্রকারদের মত অহংকে উপেক্ষা করেন নি কখনও। বলতেন তিনি, অহংটি হচ্ছে বিশেষ আর এই বিশেষটির বৃন্ত আশ্রয় করেই আত্মার অশেষে শতদলের মত প্রকাশ পাওয়া সম্ভব।...বালকবয়সে গুরুবচনের তাৎপর্য তেমন গ্রহণ করতে পারি নি—আজ কিন্তু জীবন দিয়ে অহরহ করছি গ্রহণ। আজ বুঝতে পারছি, মানুষের মত শিল্পীর-ও আছে দ্বৈতসত্তা—দক্ষিণে তার পরম জ্ঞানী বামে তার অক্ষম অজ্ঞানী। একটাকে যদি বলি দার্শনিক সত্তা অপরটি তবে তারি পশ্চাতে অর্বাচীন একটা বালকবুদ্ধি।

শিল্পী এই বালকটিকে দেখে-ই বিশ্বের বিশেষ রূপটি আভাসে বুঝে নেন, কেননা বালকটি-ই হচ্ছে সর্বজনীন। দার্শনিক যে, বিশ্বের অন্ধকারে সে আলো জ্বালতে পারে, পথ দেখাতে পারে, কিন্তু বলাই বোধ হয় বাহুল্য, সাধারণ থেকে সে অনেক যোজন দূরে, সাধারণে তাই তাকে ধরতে পারে না, বুঝতে পারে না। শান্ত স্থিতধী থেকে জনসমাজে যখন আমি বক্তৃতা করি, শ্রোতৃমণ্ডলী হয়তো আমার জ্ঞানের, আমার ভাষণের, আমার তত্ত্বতপস্যার তারিফ করে, কিন্তু অবচেতনার মর্মলোকে তারা যে আমাকে দূরের মানুষ বলেই জানে, সেবিষয়ে কোনো সন্দেহ-ই তো করি নে। কিন্তু যেখানে সামান্য অভিমানে বালকের মত আমি ক্ষিপ্ত

হই, চোখে জল আনি শিশুর সরল ক্রোধ বেগে, কাছের মানুষগুলির সঙ্গে তখন তো আমার কোনোই পার্থক্য নেই। যারা আমাকে মহান শিল্পী বলেই শুধু জানে, তারা আমার বালকত্ব দেখে বিস্মিত হতে পারে, নিন্দা-ও করতে পারে কেউ কেউ, কিন্তু বালকত্বের উর্বরা মাটি থেকেই যে শিল্পসত্তার পুষ্পতরু জাগে অনুকূল বাতাসে, এটা যারা জানে, তারা বিস্মিত হয় না, পরিহাস করে না বরং দূরের মানুষটাকে কাছে পেয়ে স্নেহের আনন্দে পালন করে, সহানুভূতির সৌন্দর্যে সম্মানিত করে তার ব্যক্তিত্ব।

সা বললেন:

—সকাল থেকে তো কিছু খাও নি, এসো, তুমি আমি দুজনে বসে কিছু খাই আজ!

—× × ×

—কিন্তু আমি তো চা খাই নে। চায়ের কোনো ব্যবস্থাও আমার নেই।...বাইরে থেকে চা,— না ও আমি তোমাকে খেতে দিতে পারবো না।

কিছু সন্দেশ, কিছু পেস্তাবাদাম কিসমিস, কিছু পাকাফল আর ভেজানো কাচা মুগ জুটল অদৃষ্টে। সা বললেন:

—এই আমার সকালের আহার বাবা।...তোমার হয়তো খুবই কষ্ট হল।

—কষ্টের কথা বলছেন কেন, লজ্জার কথা বলুন। আপনার ভাগটা হঠাৎ এসে বেমালুম আত্মসাৎ করে গেলাম।

—কথার ছিরি দেখো পাজি ছেলের। এমন বুদ্ধি না হলে কি মায়ের ওপর রাগ করে' বাড়ী থেকে বেরিয়ে আসে?

এক গ্লাস মিছরীর জল এল তারপর। পান করে' প্রাণটা শীতল হ'ল। বুঝতে পারলাম, এতক্ষণ মরুভূমি হয়ে ছিলাম অন্তরে। কাটল আরো কিছুক্ষণ। সা-কে বললাম বিনীত স্বরে:

—তবে মা এইবার উঠি!

—বাড়ীই যাবে তো?

—এখনো রাগ আছে?

হেসে বললেন সী:

—এখন একটু বিশ্রাম করো না!

—× × ×

—শুয়ে পড়ো একটু!...দাঁড়াও তোমাকে একখানি বইটই দিয়ে যাই।

বলে' তিনি সামনের 'তাক' থেকে 'চৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থখানি আমার কাছে এনে দিলেন। বললেন:

—আমার কাছে আর তো বিশেষ কোনো বই নেই বাবা, তা এ বইখানি বড় ভালো, পড়ো না একটু!

হাত বাড়িয়ে নিলাম গ্রন্থখানি। তখন সী:

—ঘরের কাজগুলো সেরে নিই গে। নিজের হাতেই সব করে' নিতে হয়। তুমি বিশ্রাম করো!

বলে' ঘর থেকে ধীরে ধীরে চলে গেলেন বাইরে থেকে দরজা ভেজিয়ে দিয়ে। চরিতামৃত পূর্বেই পড়েছি। পৃথিবীর একখানি অদ্বিতীয় গ্রন্থ বলে' জানি। কিন্তু এখন এ-গ্রন্থ আস্বাদ করার মত মন আমার নয়!

চুপ করে শুয়েই রইলাম। এখনি উঠতে হবে জানি। সংসারক্ষেত্রে আমার মত অপদার্থ মানুষের একা থেকে স্বাবলম্বী হওয়া যে কত কঠিন—যত চিন্তা করলাম, ততই শিউরে উঠলাম গোপনে।

আকাশপাতাল ভাবছি শুয়ে শুয়ে। ঝি এল। একতাড়া খবরের কাগজ আমার বিছানার ওপর রেখে বলল:

—মা পাঠালেন!

উঠে বসলাম উৎসাহে। মনেই ছিল না গতরাত্রের শিল্পীসভার বিবরণী আজ সকালের কাগজগুলিতে পাওয়া যাবে।

অগ্রগতি, চিত্রভারতী, চিত্র-পরিচিতি, ফিলম্‌জগৎ, শিল্পী-সমাজ, ছবিছায়া, ছবি ও বাণী—কত কাগজ-ই না সে কিনে আনিয়েছেন আমার জন্যে।

দেখতে লাগলাম পরমোৎসাহে।

গতরাত্রের সভার খবর ফলাও করে ছাপা হয়েছে পত্রগুলিতে। প্রত্যেকটিতেই আমার প্রতিকৃতি মুদ্রিত হয়েছে দু-তিন রকম কালিতে। কোনো পত্রে একাধিক ফটো হয়েছে ছাপানো: প্রৌঢ়বয়স্কা মহিলাটি ধানদুর্বা দিয়ে আমাকে আশীর্বাদ করছেন, সভাপতি বসু মহাশয় নিজের গলা থেকে মালা খুলে আমাকে দিচ্ছেন পরিয়ে, প্রদীপনৃত্য প্রদর্শন করছেন সুন্দরী শো, কিশোর বালকটিকে স্নেহভরে আলিঙ্গন করছি আমি,—এই সমস্ত ছবি বেশ ভালো জায়গায় স্পষ্ট করে' প্রকাশ করা হয়েছে। বসু মহাশয়ের প্রশংসা, শো-র মানপত্র এবং আমার অভিভাষণ (?) মুদ্রিত হয়েছে বড় বড় হরফে। সম্পাদকীয় মন্তব্যে কোনো কোনো পত্রে বলা হয়েছে: জাতির মধ্যে যখন শিল্পপ্রীতি জাগরিত হয়েছে, তখন জাতির মানসজীবনের উন্নতি সম্বন্ধে আর কোনো সন্দেহেরই কারণ নেই।

মনটা সহসা প্রভাত আলোর মত উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বাড়ীতে এ-সব কাগজ নিশ্চয়ই গিয়েছে—দাদু অবশ্যই দেখেছেন, এবং মা কি দেখেন নি? তাঁকে-ও দেখানো হয়েছে নিশ্চয়ই। ফুল কি মাকে এ-সব না দেখিয়ে ছাড়ছে!...

চোখ বুজিয়ে, মা এখন কী ভাবছেন, ছেলেমানুষের মত ভাবতে ইচ্ছা হল। হঠাৎ, এ কী বিচিত্র গতি আমার মনে, অভিমানে সেটা আবার বিমর্ষ হয়ে উঠল দ্বিগুণ আবেগে। বাইরের এই মানসম্ভ্রম—কী এর মূল্য, যদি গৃহে না পাই শান্তি, গৃহে যদি সবাই ভাবে, বিশেষ করে মা ভাবেন: আমি হীনতম একটা হীন মানুষ, সিনেমা করি বলে সাধুতা ও ধর্মের বালাই নেই আমার চরিত্রে—এবং ছি, ছি কী লজ্জা—যত সব মেয়েমানুষের সঙ্গ পেতেই আমার লালসা!

মা এসব কথা স্পষ্ট করে' বলেন নি এখনও, কিন্তু তাঁর ব্যবহারে এ-সব বোঝার আর বাকিটা কী আছে? গুরুদেব বাড়ীতে এলে আমাকে যেন দূরে সরানো হয়—কী এর অর্থ তা বোঝা কি এতই কঠিন! যত সব বাজে মেয়েগুলোকে বাড়িতে ঢুকিয়ে পুজোৎসবের পুণ্যসময়েও পাছে হৈ চৈ করি—এই জন্যেই না এই সাবধানতা!

হায় রে অন্তর্যামী মায়ের মন!

—কী বাবা, রাগ পড়ল?

সা এলেন একমুখ হাসি নিয়ে!

—পড়লো বোধ হয়,

বলে' হাসলাম। উঠতে উঠতে বললাম:

—হঠাৎ সকালে আজ আপনাকে ব্যস্ত করে' গেলাম।

—ব্যস্ত করে' গেলে?...কত আনন্দ যে দিয়ে গেলে। দুঃখ পেয়ে তুমি আমারই কাছে ছুটে এসেছ, এ-ঘটনা না ঘটলে কি বিশ্বাস করতাম! কত আপনার জন মনে করেছ আমাকে! এ-ভাগ্য বহন করবার শক্তি কি ছাই আমার আছে?

একটু থেমে পুনর্বার:

—নীচজাতের মেয়ে যদি না হতাম তোমাকে আজ ভাত রেঁধে খাওয়াতাম সত্য সত্যই মায়ের মত নিজের হাতে।

—মায়ের আবার নীচজাতি!

—বড় যে মাতৃভক্তি!...পাজি ছেলে! যাও মায়ের পা ছুঁয়ে ক্ষমা চেয়ে নাও গে!

—তা নেব, কিন্তু আজ আমাকে ভাত রেঁধে খাওয়াতে হবে!

—ছি অমন কথা ব'লো না ধন!

—কেন ব'লবো না! আমি জাতটাত মানি না!

—আমি যে মানি রে বেটা!

তারপর হঠাৎ সুর বদলে:

—তর্ক দিয়ে এটা বোঝাতে চেয়ো না বু। জিদ করাও এ-ক্ষেত্রে সঙ্গত

নয়।...মন থেকে যদি কোনদিন জাতটাত আর না মানি, ডাকবো তোমাকে, খাওয়াবো নিজের হাতে।

—ভালো লাগলো না কথাটা। আপনার মত এত বড় একজন প্রতিভা-ময়ী শিল্পীর মুখে এটা ভালো শোনালো না।

—হয়তো শোনালো না। কিন্তু জাতির অহংকারে উগ্র হয়ে অন্যকে অপমানিত করার চেয়ে জাতির অগৌরবে সচেতন থেকে আপন সীমা লঙ্ঘন না করাটা খুব খারাপ হয়তো নয় ধন।

একথার আর জবাব দিলাম না। দিয়ে লাভ নেই বুঝলাম। সংস্কারকে এক কথায় সরানো যে যায় না—এটা না মেনে উপায় নেই। তবু এইটুকু ভালো, জাতির অহংকার মানুষকে তুচ্ছ করার ঔদ্ধত্য ও অশিক্ষাকে তিনি নিন্দা করলেন। সেকালের শিল্পী তিনি, বিপ্লবের বরাভয় নেই তার শিক্ষায়, সংস্কারে। জোর করে' আপন অধিকার নিতে তিনি চান না—কিন্তু জাতির অহংকারে কেউ কারুর অধিকার হরণ করছে, এটা-ও পারেন না সহ্য করতে!

চুপ করে' আছি দেখে সী একটু যেন অপ্রতিভ হলেন। একটু থেমে থেকে ধীরে ধীরে সুরু করলেন ঃ

—দ্যাখো বৃ, তুমি কি বলতে চাও আমি জানি। কাঁচা বয়সে তেজ করে' ভাবতুম মানুষ সবার বড় আর সব মানুষই সমান।...এইজন্যে সমাজের চোখে যাঁরা বড় ছিলেন, বাক্যে ব্যবহারে তাঁদের সমান-ই হতে যেতুম, আত্মঅহংকারের আনন্দে ছিলুম-ও বেশ।...তারপর নবদ্বীপে গিয়ে গুরুমন্ত্র কানে নেয়ার পর কী যে হ'ল, অহরহ ভাবতে সুরু করলুম, বড় যাঁরা তাঁদের তো সমান হতে চাই, কিন্তু সমাজের চোখে যারা ছোট, তাদের কি সমান মনে করেছি কখন-ও? ব্রাহ্মণ-কায়স্থদের অন্ন-দেয়ার অহংকার নেব, কিন্তু কোনো হাড়ি-ডোমের অন্ন আমি ছোঁবো না, ভদ্র-হওয়ার দায়ে পড়ে বাইরে তাদের স্বীকার করলে-ও মনে মনে ঘৃণায় থাকবো নাক তুলে, এ কেমনতরো রীতি বলো! আজ অবশ্য তোমাদের শহরের সমাজে ব্রাহ্মণ-কায়স্থের বা শূদ্রজনের বাহ্যতঃ তেমন ভেদাভেদ নেই। কিন্তু সেই

কারণে, জাতি-ভেদটা নেই বলেই কি মনে করো? ভেবে কি দেখেছ সমাজে আজ জাতিভেদের সংস্কার নূতন রীতিতে করেছে আত্মপ্রকাশ? আজ পৈতেধারীকে হয়তো ব্রাহ্মণ বলে' শ্রদ্ধা করি না, কিন্তু বাড়ী-গাড়ী উপাধিধারীরাই কি আজ ব্রাহ্মণ নয়? এই ব্রাহ্মণদের সমান হতে চাই, তাঁদের সভায় স্থান পেলে, তাঁদের পাশে বসতে পেলে, তাঁদের গাড়ীতে চড়তে পেলে—যে অহংকারটা অনুভব করি, সেই অহংকারই কি প্রমাণ করে না, তাঁরা আমার চেয়ে ঢের উঁচুস্তরের মানুষ? উঁচুর প্রতি ষোলো আনা লোভ আর নীচুর প্রতি নেই এতটুকু আকর্ষণ—এতে কি বুঝবো না জাতিভেদ আছে আমারি চরিত্রে, এবং এটাকে জীইয়ে-ও রাখতে চাই বাইরে না হ'ক, অন্তরে?

—আপনার কথা, হয়তো অনেকেই সমর্থন করবেন না,

হেসে বললাম ঃ

—কিন্তু আমি করবো। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ-ও বলবো, মনের সমাজকে বদলাবার ভার তো নিতে হবে। নিচু যাদের বলছেন তাদের কোলে নিন, টেনে তুলুন!...

—তুলুন বললেই কি তোলা হয় ধন? প্রেম না হলে তুলবে কে? বুদ্ধি দিয়ে তোলা, তর্কযুক্তি দিয়ে তোলা এক কথা, আর কাজে কর্মে, আচারে বিচারে, ভাবে ভাবনায় হৃদয় দিয়ে তুলতে চাওয়া আর কথা। এটা যে এখন-ও হয় নি। হলে অবশ্য গুরুমন্ত্র সার্থক হবে জীবনে। তখন উঁচু-নিচু প্রশ্ন-ই আর তুলবো না বৃ!...সেদিন এসো!

—তাহ'লে মায়ের হাতে অন্ন পাওয়ার ভাগ্য আজ হ'ল না!

বললাম হেসে। শুনে সী-ও হাসলেন। তিরস্কার করলেন ঃ

—পাজি ছেলে কোথাকার! যে মা থালা সাজিয়ে বসে আছে প্রতীক্ষা করে' তার কাছে যাওয়ার নাম নেই, আর কোথাকার কে তার ঠিক নেই, মাতৃনামের ভক্তি দেখিয়ে তার কাছেই জিদ চলছে কাঙালপনার! কী আমার মাতৃভক্ত ছেলে রে!

তিরস্কার পেয়ে-ও মনটা ভরে গেল স্বর্গীয় মাধুর্যে।

আবার একদিন আসবো বলে' প্রতিশ্রুতি দিয়ে সী-র বাড়ী থেকে এলাম বেরিয়ে। বাড়ী-ই ফিরবো, ইচ্ছা হচ্ছিল। কিন্তু বিচিত্র আমার মন, ট্যাক্সীতে চড়ে' বসতেই বেঁকে বসল বালকমনটা। সম্পূর্ণ অকারণেই নির্দেশ দিলাম ড্রাইভারকে : চলো দক্ষিণেশ্বর !

ভবতারিণীর মন্দিরের সামনে নেশাগ্রস্থের মত বসে রইলাম অনেকক্ষণ। এমনতর নেশায় কখন-ও আমাকে পায় নি। মনে মনে কী যে বললাম আজ আর কিছু মনে নেই—কিন্তু বাহ্যজ্ঞানশূন্য হয়ে মায়ের চোখের দিকে যে সারাক্ষণই চেয়ে ছিলাম—এটা আজও মাঝে মাঝে স্মরণে আসে। কী যে আছে মায়ের ওই অচপল দুটি প্রস্তরনয়নে। দেখতে দেখতে প্রস্তরীভূত হতে হয় সমাধির মহাসুখে।...মূর্তি পূজার যাঁরা বিরোধী তাঁরা আমার এ-কথা অবশ্যই বুঝবেন না। কিন্তু মূর্তির মধ্যেই অমূর্ত ভাবরহস্যের অনির্বচনীয় আনন্দ যাঁরা আস্বাদ করেন, তাঁরা নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন—মায়ের ওই বরাভয়নন্দিত স্নেহ-গম্ভীর চোখদুটি যদি প্রকাশ না পেত, ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের সমাধিজীবনের অনেক লীলাতত্ত্বই অজানার মধ্যে থাকত প্রচ্ছন্ন।

তত্ত্বজ্ঞানকে প্রাণ না হ'ক, গান কি দেয় নি শিল্পমূর্তি ?—প্রশ্নটা জাগল আচম্বিতে।

স্থির হয়ে বসেই রইলাম। মন্দিরে পূজারী ও পূজারিণীদের ভিড় ক্রমশঃ কমে এল। পুরোহিত কী মনে করে আমার দিকে এগিয়ে এলেন ! ললাটে পরিয়ে দিলেন সিন্দুরের ফোঁটা। চরণামৃত দিলেন হাতে। ভক্তিভরে তা' পান করলাম।

হস্ত ধৌত করে' বাঙালী ভক্তদের মতই পুরোহিতের পায়ে হাত রেখে প্রণাম করতে গেলাম। 'জয় গুরু' বলে' মাতৃমূর্তির দিকে তাকালেন,

—নারায়ণে মতি হো'ক,

আশীর্বাদ করলেন, শান্ত, প্রসন্ন। তারপর আত্মগতভাবে :

—শিব, শিব, জয় শিবশম্ভু!

বললেন অস্ফুট ছন্দে।

মা-র কথা হঠাৎ মনে পড়ল। মা প্রত্যহ শিবের পূজা করেন, কিন্তু নারায়ণের নাম নেন কারণে অকারণে। আবার এ-ও দেখেছি—কলকাতায় এলেই একবার অন্ততঃ তাঁর যাওয়া চাই কালীমন্দিরে, পরেশনাথে, গুরুদ্বারে, বৈষ্ণবমঠে। সর্বদেবতার প্রতি এই অদ্বয় অনুরাগ, ভারতবর্ষের সাধনা-মন্দিরে এটি যে দক্ষিণেশ্বরের দান—পুরোহিতের আচারে ব্যবহারে তা স্পষ্ট হ'ল, প্রত্যক্ষ হ'ল।...মনোবৃত্তির এই সর্বানুভূত্ব, এই উচ্চতা ও প্রসার-ই তো আসল কথা, দক্ষিণেশ্বর এই তো শিখিয়েছে ভারতবর্ষকে। এইটি হলেই তো ধর্ম হ'ল। এইটি যার নেই, তার ধর্ম নেই।...আমার ধর্ম নেই?...মা ভাবেন, আমার ধর্ম নেই, আমি নাস্তিক!

কি আশ্চর্য, আমি অকারণে মন্দিরের এদিকে সেদিকে এইবার তাকাতে লাগলাম। মনে হ'ল—মা বোধ হয় একবার আসতে-ও পারেন দক্ষিণেশ্বরে।... নিদারুণ বিষাদের মধ্যেও অদ্ভুত একপ্রকার কৌতুক জাগল অন্তরে। এই সময় মা যদি আসেন, বিস্মিত হবেন নিশ্চয়ই। বোধ করি নাস্তিক ছেলেটার ওপর একটু বিশ্বাস-ও জাগবে গোপনে।

কিন্তু কই মা! আমার জন্যে কার-ই বা কী চিন্তা আছে? ছেলেমানুষ তো নই যে আমাকে খুঁজতে বেরুবে সকলে? তা ছাড়া বাড়ীতে গুরুদেব আসছেন, আমি এখন বাড়ীর বাইরে থাকলে সকলেই তো স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচে। চলে গেছি, এত ভালোই হয়েছে।

ভবতারিণীকে আভূমি নত হয়ে প্রণাম করলাম। মন্দির থেকে চলে যাওয়ার জন্যে সিঁড়ি দিয়ে নামছি, পুরোহিত ডাকলেন:

—এতক্ষণ আছ যখন, আর একটু ব'সো বৎস, মায়ের প্রসাদ পেয়ে যাও!

এমন ভাবে কোথাও কখনও কিছু গ্রহণ করি নি। এ-এক নূতন অভিজ্ঞতা আমার জীবনে! থমকে দাঁড়ালাম। তারপর:

—যে আজ্ঞে,

বলে' বসলাম পুনর্বার।...

প্রসাদ প্রার্থী ছিলেন অনেকেই, এলেন যথাসময়ে। একটু পরেই ডাক পড়ল। সার দিয়ে তখন সকলে বসে গেলেন নীরবে। ভালো লাগল এই দেখে, পুরোহিত আমার চেহারা বা বেশভূষায় প্রভাবিত হয়ে বিশেষ কোনো ব্যবস্থা করার চেষ্টা করলেন না। অঙ্গুলী নির্দেশে পংক্তির মধ্যেই আমাকে বসতে বললেন।...

প্রসাদ পাওয়ার পর—সকলের দেখাদেখি আমি-ও শাল পাতার মধ্যে উচ্ছিষ্টগুলি নিপুণভাবে পুরে নিয়ে নির্দিষ্ট স্থানে ফেলে এলাম।... ছাত্রজীবনে শান্তিনিকেতনে এটা আমাদের করতে হত, মনে পড়ল। নিজের উচ্ছিষ্ট নিজেকেই পরিষ্কার করতে হবে—এই ছিল গুরুদেবের নির্দেশ।

শান্তিনিকেতনে আমরা সকল জাতের ছেলেমেয়ে একত্র এক পংক্তিতে বসে খেয়েছি, কোনো জাতিভেদ মানি নি। কিংবা হয়তো এই কথা বলা-ই ঠিক, শান্তিনিকেতনে আমরা জাতি হিসাবে ছিলাম একজাতি, ছাত্রজাতি—দক্ষিণেশ্বরে যেমন জাতি হিসাবে আমরা একজাতি, সন্তানজাতি, ভবতারিণীর সন্তান আমরা সকলে! সী যদি আজ পাশে থাকতেন, নিশ্চয়ই নিজেকে নীচ জাতীয়া বলে আর মনে করতে পারতেন না। আসল কথা কোনো একটি ভাবের আনন্দে অন্নকে প্রসাদ করে নিতে পারলে আর সে অন্ন কোনো কারণেই হয় না অপবিত্র। শুধু তো ক্ষুন্নিবৃত্তির আয়োজনেই মানুষ তুষ্ট নয়, আরো কিছুতে তার যে প্রয়োজন! প্রসাদ করে নিয়ে অন্নের মান ও মহিমা সে তাই বাড়াতে চায়। সে বলে ঃ মা ছুঁয়ে দেয় যে-অন্ন, সে-অন্নকে অপবিত্র করতে পারে এমন কিছু নেই, কেউ নেই ইহপৃথিবীতে। সী যদি প্রসাদ তুলে দিতেন হাতে করে—নীচজাতিত্বের সংকোচ তাঁর অবশ্যই তিরোহিত হত।...তবু জানি, সী-ই সত্য। প্রেম না হলে প্রসাদ পাওয়া হয় না, যেমন প্রসাদ পেলে প্রেম না হয়ে যায় না।

ভবতারিণীর প্রসাদে আজ শুধু ক্ষুন্নিবৃত্তি-ই হল না, প্রেম-ও হল। বুদ্ধিতে যা ছিল, বোধে এল। বুঝলাম ঃ প্রসাদ যতক্ষণ পাই না, ততক্ষণ পর্যন্ত সংসারে উচ্চ-নীচ দেখি, যত দেখি—ততই তর্কের বড়াই করি, যুক্তির লড়াই-এ যাই। প্রসাদ পেলে সব শান্তং, শিবং, অদ্বৈতম্‌!

মা-ভবতারিণীর দিকে চেয়ে মনে হ'ল নবভাবের চেতনা উদ্ভাসিত হ'ল জীবনগহনে। মনে মনে প্রণাম করলাম ভক্তিনত।

পুরোহিতের কাছে এসে প্রণামান্তে তাঁর হাতে দশটি টাকা দিলাম বিনীতভাবে। বললাম ঃ

—দরিদ্রনারায়ণের সেবায় এটা ব্যয় করবেন!

—নারায়ণে মতি হ'ক!

পুরোহিত আবার আশীর্বাদ করলেন।

বেলা তখন প্রায় দুটো, দক্ষিণেশ্বর থেকে সরাসরি সু-র বাড়িতে এসে উপস্থিত হলাম।...সু-র যদি দেখা পাই বাড়ীর খবর কিছুটা মিলবে। যদি তেমন বুঝি—বাড়ী ফিরব, নইলে—

মূর্খ ও অবিশ্বাসী আর কাকে বলে!

সু-র বাড়ী এসে শুনলাম, এই খানিকক্ষণ আগে বাড়ী ফিরে এই মাত্র সু আহার শেষ করেছে।

—বিশ্রাম করছে ?

—না, বাবু তো বললেন এখনি বেরোবেন। গাড়ী বাইরেই রাখতে বললেন। ট্যাক্সীকে বিদায় দিয়ে সু-র ওপর উঠলাম।...সু এক মিনিট বুঝি শুয়েছিল বিছানায়, আমার পায়ের শব্দে ধড়মড়িয়ে উঠে এল বাইরে,

—কে ? ব্র নাকি ?

বলল হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠে।

—আমি-ই বটে !

সু এসে বুকে জড়িয়ে ধরল আমাকে। যেন দেশোদ্ধারে জেলে গিয়েছিলাম ফিরে আসছি বছর বারো পর—কিংবা যেন হারিয়ে গেছলাম কচি খোকা, হঠাৎ পাওয়া গেল অপ্রত্যাশিতভাবে। প্রায় হাঁফাতে হাঁফাতেই বলল সু :

—যাক বাঁচলে ! আর কোনো কথা নয় ! চলো !

—ওকি বসছ কেন হে ?

—কেন, একটা দিন-ও এখানে আশ্রয় দিতে পারো না !

—একটা মিনিট-ও নয়।...আচ্ছা মানুষ তুমি। খুঁজে খুঁজে হয়রাণ হতে হয়েছে। ছিলে কোথায় ঘাপটি মেরে ?

—দক্ষিণেশ্বরে।

—দক্ষিণেশ্বরে ?...ওই দেখো, ওই দিকটাই কেবল যাওয়া হয় নি! ভাবতেই পারি নি—হঠাৎ তোমার ভক্তি উঠবে উথলে! বেশ হয়েছে! এখন চলো! তোমাকেই খুঁজতে আবার বার হবো ভাবছিলাম!

—আমি কি কচি খোকা! হারিয়ে গেছি?

—ওটা আমার মুখে শোনায় ভালো, তোমার মুখে না!...যার মা আছে, বোনের মত দুটো বোন আছে, সবার ওপরে দাদু আছে, জানো না ভাই—তার বয়েস বাড়ে না কোনদিন!...থাক বাজে কথা। চলো!

—× × ×

—এখনো বসে রইলে? তুমি গেলে তবে সবাই মুখে দুমুঠো ভাত দেবে তা' জানো।...জানো কি চাকর-বাকরদেরো অনেকে মুখে জল দেয় নি?...তোমাকে জ্ঞানীগুনী বলে জানি—কিন্তু তুমি এই রকম ছেলেমানুষ? এমনভাবে কষ্ট দাও সকলকে, বিশেষ করে মা-কে?... হোপ্‌লেশ!

সু আমাকে টানতে টানতে নীচে নামাল। গাড়ীতে তুলল।

গাড়ী চলল তীরবেগে।...নীরবেই চললাম দুজনে। অনেক পরে সু:

—বেশ খেলাটা খেল্‌লে বৎস। মাঝখান থেকে আমি বেচারা ছুটে ছুটে মারা গেলাম।...ওদিকে শো-র কি খবর তা জানি না। তুমি গেছ্‌লে, দরজা থেকেই ফিরে গেছ, এ-খবর পেয়ে সে তো চাকরবাকরদের মারতে শুধু বাকি রেখেছে। তারপর আমি যখন গিয়ে বললাম, তোমাকে পাওয়া যাচ্ছে না, ফরসা মুখখানা ফ্যাকাসে করে' সে তো পাথর হয়ে বসেই রইল, কোনো কথাই ছাই বললে না।

—চলো না তার কাছ থেকে একবার ঘুরে আসি!

—তুমি একটি অমানুষ। মা রয়েছে না খেয়ে শুখিয়ে, তার জন্যে চিন্তা নেই, কোথাকার কে শো, তার ভাবনায় প্রেম একেবারে উথলে উঠলো।...অকোয়ার্ড!

—× × ×

—মা-র কান্না দেখেছ কোনদিন? চোখ আছে? তেড়ে তো বীরত্ব দেখিয়ে বেরিয়ে গেলে, তারপর কচি মেয়ের মত কত সে কাঁদলো, কত কাঁদতে পারে, ভেবেছ কোনদিন?

—× × ×

—শিল্পী, প্রেমিক, দার্শনিক, কবি—মিথ্যে, সব মিথ্যে।...তোমার যত প্রেম ওই সব সিনেমার মেয়েগুলোর জন্যে।...চলো না শো-র কাছে ঘুরে আসি—

সু দাঁত খিঁচিয়ে উচ্চারণ করল শেষের বাক্যটা।

হাসলাম।

—হাসতে লজ্জা করছে না?

—না!

সু চটে উঠে আরো লেকচার করতে বুঝি উদ্যত হচ্ছিল, কিন্তু গাড়ী প্রবেশ করল থিয়েটার রোডের মধ্যে। সু থামল। তারপর হঠাৎ:

—মা যা বলেন শুনো বু, সুখী হবে তাহ'লে!...সিনেমার মেয়েটেয়ের বাড়ী আর যেয়ো না!

—আচ্ছা!

বলে' কৌতুকভরে আবার হাসলাম।...আমার অনুপস্থিতিতে সু-র সঙ্গে মার কী সমস্ত কথা হয়েছে অনুমান করা তেমন কঠিন হ'ল না।... কিন্তু কৌতুকভরে সমস্ত তিক্ততাকে উড়িয়ে দিতে যে জানে না, পারিবারিক শান্তি আসে না তার জীবনে।

আবার হাসলাম।

গেট খুলে দিল রামস্বরূপ। আমাকে দেখতে পেয়ে হঠাৎ সোজা হয়ে দাঁড়াল সৈনিকের মত, সেলাম দিল বিপুল আনন্দোচ্ছ্বাসে।

চকিতে খবর রটে গেল, আমি এসেছি। মুহূর্তের মধ্যে নিস্তব্ধ বাড়িখানা উৎসবের কলকোলাহলে হল পূর্ণ। হৈ-চৈ করে ছুটে এল ভৃত্যদল।... ইন্দ্রাসন এল মারমুখী হয়ে। ডুকরে উঠল:

—বুড়ো বয়সে আর সয় না দাদাবাবু, এবার আমাকে তোমরা বিদায় দাও!

—তাই দেব!

বলে' অকারণে তার পিঠ চাপড়ে দিলাম।

সিঁড়ির পথে কমলার সঙ্গে দেখা। সঙ্গে তার লালঝরি। আমাকে দেখে লালঝরি ঘোমটা দেয়। ঘোমটার ফাঁকে একচোখে লুকিয়ে দেখে। আজ-ও দেখলাম, বেটী একচোখে আমার দিকে রয়েছে চেয়ে। চোখটায় চোখ পড়াতে বুঝলাম বেটীর মনটায় জেগেছে স্বস্তির প্রসন্নতা।

—ফুল কোথা রে?

জিজ্ঞাসা করলাম কমলাকে।

—এতক্ষণ তো বারান্দায় দাঁড়িয়েছিল!...

—মা?

—দরজা খুলছেন না।

—তুমি একটি আন্‌গ্রেটফুল্‌ নরাধম!

বলল সু আমাকে:

—এই আমি তোমার ঘরে বসছি। যাও মার কাছে!...

মার দরজা তো বন্ধ। দাদুর সাহায্য নেয়া দরকার বোধ হয়। এলাম তাঁর ঘরে। দাদু শুয়ে আছেন। মুখ অস্বাভাবিক রকমের গম্ভীর।... টেবিলের ওপর আজকের তারিখের অনেকগুলি পত্রিকা রয়েছে ছড়ানো। দু-একখানি পত্রিকা একটু আগেই যে পড়ছিলেন—কাগজ রাখার ধরণ দেখলেই তা বোঝা যায়।

আমাকে ঘরে ঢুকতে দেখে অত্যন্ত গম্ভীরকণ্ঠে দাদু বললেন:

—তোমার মা সেই থেকে না খেয়ে আছে—ইচ্ছা হয় তার কাছে যাও!... খেয়েছ?

খেয়েছি বলতে কেমন যেন দ্বিধা হল। বললাম—

—না!

—সেকি, কোথাও দুটো খেয়ে নিতে পারো নি?...রাগ কাদের ওপর করছ মুখ্যু!...দিন দিন তোমার বয়স বাড়ছে না কমছে?

ঘর থেকে বেরিয়ে আসছি, দাদু ডাকলেন:

—শোনো! তোমার মাকে বলবে কোনো বন্ধুর বাড়ীতে খেয়েছ! আমি তাকে তাই-ই বলেছি।

বেদনায় টনটনিয়ে উঠল হৃদয়! বললাম:

—দক্ষিণেশ্বরে কিছু প্রসাদ পেয়েছি!

• —দক্ষিণেশ্বরে ?...দক্ষিণেশ্বরে ছিলে এতক্ষণ ?

বলতে বলতে দাদু বিছানা ছেড়ে উঠলেন। মার ঘরের কাছে এলেন দ্রুত। নিতান্ত গম্ভীরমনে থাকলে সকলকেই দাদু নাম ধরেই ডাকেন! মাকে ডাকলেন:

—সরস্বতী, দরজা খোল্!

— × × ×

—বু এসেছে।...খোল্ দরজা!

মা দরজা খুললেন।

—বু এতক্ষণ দক্ষিণেশ্বরে ছিল।...বললাম তোকে ভাবনার কিছু নেই... সেখানেই সে প্রসাদ পেয়েছে।...তা কিছু পূজা দিয়েছিস ?

—দিয়েছি।

বলতে বলতে আমি দ্রুত এগিয়ে গিয়ে মাকে বালকের মত জড়িয়ে ধরলাম। মা আমার মাথায় হাত রেখে পাথরের মত দাঁড়িয়ে রইলেন। ফুল ছিল মা-র পাশেই। ফ্যালফেলিয়ে চেয়ে রইল আমার মুখের দিকে। যেন কতকাল পরে দেখছেন—এইভাবে মা-ও চেয়ে রইলেন আমার মুখের দিকে। তারপর:

—কী চেহারা করেছিস খোকা!

বললেন স্নেহার্দ্র কণ্ঠে।...দাদু আর দাঁড়ালেন না সেখানে।...মাকে বসালাম বিছানার ওপরে।

—খবরের কাগজের ছবিতে বড়দাকে কেমন সুন্দর দেখিয়েছে—নয় মা ?

বলল ফুল সরল আনন্দে।

—সত্যি খেয়েছিস তো খোকা ?

—এই তোমার পায়ে হাত দিয়ে বলছি খেয়েছি, খেয়েছি, খেয়েছি!

হঠাৎ তারপর কৌতুকের সুরে :

—ভাগ্যে রাগ করে' বেরিয়ে গেলাম, তাই তো ভবতারিণীর প্রসাদ জুট্‌লো কপালে।

মা সত্যই বড় তুষ্ট হলেন শুনে। দেখে সাহস হল। বললাম :

—খাবে চলো!

—এই অবেলায় আর কিচ্ছু খাবো না!

—একটু কিছু খাবে চলো।...কই ওঠো! সু আমার জন্যে অপেক্ষা করছে ঘরে।...যেতে হবে।

—সু আবার এসেছে। বেটার মত বেটা এই সু। কী ভালোটাই না তোকে বাসে খোকা। পাগলের মত ঘুরে বেড়ালো শহরটা।...একলাটি সে বসে আছে, যা!

—তোমাকে বসিয়ে তবে যাবো।...কমলা, রাঁধুনীমাকে সব দিতে বল্‌ গে।

—ও বেটী-ও তো খায় নি!

—তুই-ও খাস নি?...বেশ করেছিস্‌!

—সারাক্ষণ ধরে খবরের কাগজগুলো পড়ছিল, আর আমাকে বকছিল!

—এই বুঝি তোর 'এগ্‌জামিনের' পড়া!

শরতের আকাশের মত স্বচ্ছ হয়ে গেল মলিনান্ধ হৃদয়টা। অভাবনীয় একটা তৃপ্তির আস্বাদে মনপ্রাণ বিভোর হয়ে উঠল আচম্বিতে। কমলার হাত ধরে বললাম :

—যা ভাই মাকে নিয়ে। খেয়ে নি গে যা।...ফুল তুই খেয়েছিস্‌?

—হ্যাঁ!

—লক্ষ্মী মেয়ে। চালাক মেয়ে। আর এরা সব বোকা মেয়ের দল।... হ্যাঁ রে, দাদু খেয়েছেন?

—দাদু আবার খাবে না!

ঠোঁট উল্টে বলল ফুল :

—ঘড়ি ধরে দাদু খায়।...একমিনিট যদি এদিক-ওদিক হয়...বাব্বা!... আজ-ই একটু দেরী হয়েছিল বলে'—

—থাম্ পোড়ারমুখী !

বললেন মা। তারপর আমার দিকে চেয়ে ঃ

—তুই-ও দুটো খাবি আয় তবে।

—না মা, প্রসাদ পাওয়ার পর সেদিন আর কিছু খেতে নেই।

মা-র কাছেই কবে যেন এ-শাস্ত্র একদা শুনেছিলাম। আজ সেটি কাজে লাগল।

মা কী খুসি যে হলেন !

মা খেতে গেলেন কমলাকে নিয়ে। মাকে খুসি করতে পেরেছি, মনে হ'ল রাজ্য জয় করেছি অকস্মাৎ।

সু-র কাছে এলাম শিস্ দিতে দিতে। দেখলাম, সু গভীর নিদ্রায় যেন অসাড়। আহা সারাটা দিন ঘুরেছে বেচারা ! ঘুমাক !

ইজি-চেয়ারটায় পরম আরামে গা ঢাললাম।...হঠাৎ সু-র নাসিকা বিপুল বিক্রমে উঠল গর্জন করে'।

—ষ্টুপিড, আমি বলি তুমি ঘুমিয়েছ।

—মনে শান্তি এলেই ঘুম আসে।

—শান্তি তা'হলে আসে নি ?

—আগে রিপোর্ট দাও।

—রিপোর্ট ভালো ঃ মা খেতে গেছেন।

সু পাশ ফিরে শুল। হঠাৎ ফিরল আবার ঃ

—শো-কে একটা ফোন করে' দাও না ভাই ঃ তুমি এসেছ। বেচারা একটু ঘুমুতে পাক।

—ও আমি পারবো না !

—আচ্ছা, কাজ নেই !

বলে' আবার পাশ ফিরল সু।...দীর্ঘ পাঁচসাত মিনিট সব চুপচাপ।

—এই, সত্যি ঘুমুলে নাকি ?

আশ্চর্য, সু সত্যসত্যই ঘুমিয়ে পড়েছে।

২১

একটা ব্যাপারে মাকে পরদিন সকালে খুবই অবাক ক'রে দিলাম: গুরুদেব আজই সন্ধ্যাবেলায় এখানে এসে পোঁছুচ্ছেন শুনে—সকাল থেকেই চাকরবাকরদের নিয়ে মেতে গেলাম সারা বাড়ীখানি সাজাবার কাজে।... মার কথায় বার্তায় ও ব্যবহারে গভীর সন্তুষ্টি প্রকাশ পেল, গুরুদেবের মহিমা যে আমি বুঝতে পেরেছি, এটা আবিষ্কার করে তিনি ভয়াবহ একটা দুশ্চিন্তার দায় থেকে যেন বাঁচলেন।

দাদুর মনোভাব অবশ্য কিছুই বুঝতে পারলাম না। গৃহসজ্জায় আমার অভূতপূর্ব উৎসাহ দেখে কৌতুকভরে শুধু হাস্য করলেন মাত্র।...তারপর বাড়ীর সামনেটায় যখন নানা রঙের বৈদ্যুতিক আলোকমালায় সজ্জিত করছি, ভৃত্যদের আদেশনির্দেশ দিচ্ছি এদিকওদিক ছোটাছুটি করে'—হঠাৎ দাদু অপ্রত্যাশিত ভাবে একবার এলেন আমার কাছে, কানের কাছে মুখ এনে নিতান্ত সমবয়সী বন্ধুর মতই ফিস্ ফিস্ করে' বলে' গেলেন: চতুর বটে!

এতক্ষণে বুঝলাম দাদুও তুষ্ট হয়েছেন অন্তরে।

বাড়ীখানি সাজানো হ'ল ছবির মত। গেট থেকে বাড়ীর সীমার মধ্যে ঢুকেই একটু এগিয়ে বাঁ-হাতি নির্মিত হল গুরুদেবের আসন। সেটি আমার পরিকল্পনানুসারে ছোট্ট একটি মনোজ্ঞ মঞ্চের মত করে' তৈরী করা হ'ল। দক্ষিণ পার্শ্বে নির্মিত হ'ল পূজার বেদী। যজ্ঞকুণ্ড রচিত হল প্রাচীন বেদোক্ত নিয়ম ও পদ্ধতি অনুসারে। দাদু সামনে দাঁড়িয়ে থেকে গুরুদেবের নির্দেশ-পত্র দেখে এটা করালেন।

গেটের দুপাশে সিন্দুরচর্চিত পূর্ণকলস আমি নিজের হাতে স্থাপন করলাম। ফুল উৎসাহভরে বয়ে নিয়ে এল শিস্‌যুক্ত দুটি ডাব, আমি সে দুটি

কলসীর ওপর নেড়েচেড়ে ঠিক করে বসিয়ে দিলাম। কলাগাছদুটো ফুল ঠিক বাগিয়ে আনতে পারল না, দারোয়ান রামস্বরূপ তাকে সাহায্য করল।

মা দাঁড়িয়ে সব দেখলেন বারান্দা থেকে। টম্বকে দিযে একবার ডেকে পাঠালেন আমাকে। বারান্দার তলায় আসতেই :

—ওরা তো সব করছে খোকা, তুই এবার একটু বিশ্রাম করবি আয়!

—আসছি!

বলে' উৎসাহভরে আবার একটা কাজে গেলাম যেতে। মনে মনে বুঝলাম, মা এতে আরো খুসি হলেন।

গুরুদেবের প্রতি মার ভক্তি যে কত গভীর—আমার প্রতি তাঁর দেখেই তা অনুমান করা সহজ। শিক্ষিত বাঙালীরা বলেন, মেয়েরাই সমাজে ধর্ম রেখেছে। আমরা, অবাঙালীরা, ধর্মের ব্যাপারে কিন্তু মেয়ে ও পুরুষ উভয়েই সমান বলে জানি। আমরা বাঙালীদের মত ভাবপ্রবণ যেমন নই, যুক্তিবাদীও নই তেমনি। শিক্ষা ও সংস্কৃতির ব্যাপারে আমরা প্রায়শই সনাতন পন্থা ত্যাগ করতে পারি না। আমরা গীতা পাঠ করি গভীর শ্রদ্ধায়, তুলসীদাসের রামায়ণ গান করি গভীর আনন্দে, গুরুকে অবতার জ্ঞানে পূজা করি গভীর বিশ্বাসে, গুরুবচনকে বেদবাণী বলে জ্ঞান করি গভীর আশ্বাসে। বাঙালীদের সমাজে আজ গুরুবাদের তেমন জোর নেই বলে শুনি—আমরা কিন্তু গুরু বলতে অজ্ঞান,—বলতে কি গুরুই আমাদের ধ্যান, জ্ঞান, ধর্ম, কর্ম।

অবশ্য বাঙালীরা ভাবের জীবনে যাঁকে মান্যযোগ্য মনে করে, তার জন্যে সর্বস্ব করতে পারে পণ। আসলে বাঙালী ভাবমার্গের জাতি বলে'—ভেবে' যাঁকে ভালো বলে মনে করে—তাঁকে আঁকড়ে ধরে প্রাণপণে, সার-সত্য মনে করে তাঁকেই। তার পর রাত ভোর হলে হঠাৎ যদি ভুল ভেঙে যায়, সে মুখ ফেরায় দারুণ উপেক্ষায়। আজ যাকে শিব বলে' পুজো করে, কাল তাকে পাথর বলে' কুকুর লেলাতে দ্বিধা করে না বাঙালী।...আমরা,

অবাঙালীরা, কিন্তু এতটা নই! যুক্তিবাদী নই বলে' অন্তর্জীবনে ঘন ঘন মত বদলাই না পান থেকে চুণ খসলে, বিশ্বাসের জীবনে যে-কোন একটা সত্যকে ধরে আমরা প্রায়শই স্থির থাকি, এসব নিয়ে তর্কবিতর্ক-ও করি কম। বাঙালীরা যখন অন্তর্জীবনের সত্যাসত্য নিয়ে প্রবলবিক্রমে মাতামাতি করে, জীবনের সবটাই প্রায় ব্যয় করে বসে, আমরা তখন সে-বিষয়ে তেমন মাথা না ঘামিয়ে সময় ক্ষেপণ করি অন্যত্র, কর্মজগতের লাভলোকসান, ক্রয়বিক্রয়, ব্যবসাবাণিজ্য, দানধ্যান প্রভৃতিতে করি আত্মনিয়োগ।...এইজন্যে একজন অবাঙালী যখন দানধ্যান করে, মন্দির কি ধর্মশালা নির্মাণ করে' লক্ষ্য করে দেখবেন—তার মধ্যে সমাজচেতনার তেমন কোনো যুক্তি নেই, যেমন আছে সনাতন ধর্মচিন্তার সমর্থন। তার বিশ্বাস, জীবনে সে যা পাপ করেছে, প্রতারণা করেছে, শোষণ করেছে কি তোষণ করেছে,—এই দানধ্যান বা মন্দির নির্মাণের পুণ্যধারায় তা ধুয়ে যাবে, মুছে যাবে। বাঙালীরা এতে হাসে, উপহাস করে, বিদ্রোহ করে, অভিশাপ দেয়। ধনবান অবাঙালী এ-সব কিন্তু গ্রাহ্যই করে না। তার বিশ্বাস ব্যবসাবাণিজ্যের ব্যাপারে সে যতই পাপ বা অন্যায় করুক না কেন, তা ধুয়ে ফেলার উপায় আছে তার হাতে! বাঙালীর হাতে পাপ ধুয়ে ফেলার কিন্তু কোনো উপায়ই আজ নেই,—সে পাপ করে, করে' আবার যুক্তির দ্বারা করে সমর্থন, স্বাভাবিক ও বাস্তব এবং মানবোচিত বলে চালায় তর্ক। অনেকে আবার তত্ত্ব-ও করে গম্ভীর ভাষায়।

বাঙালীসমাজে মানুষ হয়ে বাঙালীদের মত আমি-ও যে তর্ক করতে, তত্ত্ব করতে শিখি নি—তা বলি নে। কিন্তু মাকে তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে গুরু-অভ্যর্থনার কর্মে অবতীর্ণ হয়ে হঠাৎ আজ উপলব্ধি করলাম, আসলে আমি-ও একজন সনাতনপন্থী গুরুবাদী মানুষ মাত্র! গুরু-বন্দনায় আমার যে আনুরক্তি এটা অপ্রত্যাশিত বলে' মনে হলে-ও আসলে এটা রক্তের মতই আমার চরিত্রে প্রবহমান।

দাদু বলে গেলেন: চতুর বটে!

কিন্তু ক্রমশঃ মনে হ'ল, না, এটা আমার চাতুর্য মাত্র না। চাতুর্য হলে উৎসাহের ভাবে এত আনন্দ অনুভব করব কেন? কেন গুরুদেবের আগমন প্রতীক্ষায় সারা দুপুর অনুভব করব আশ্চর্য উত্তেজনা?

আমার ঘরেই গুরুদেবের শোয়ার ও বসার ব্যবস্থা করা হ'ল। বাড়ীর মধ্যে আমার ঘরখানি সব থেকে ভালো এবং প্রশস্ত। এ-ঘরে অনেকজন-ই একত্র থাকা যায়। তবু বাইরের কেউ কাছে থাকলে গুরুদেবের ধ্যান ও যোগসাধনার বিঘ্ন হতে পারে—এই ধারণায় আমার দরকারী জিনিসপত্র নিয়ে অন্য একটা ঘরে যাবার আমি প্রস্তাব করলাম। মা বললেন ঃ

—আমার ঘরটাও তো খুব ফাঁকা। একটা ধারে তুই এসে দিনকতক থাক্ না খোকা!

প্রস্তাবটি খুবই মনোমত হ'ল। বহুদিন মা ও বোনেদের সঙ্গে একত্র থেকে বসে শুয়ে গল্প করি নি—কথা বলি নি, মনে মনে আচম্বিতে খুবই উল্লসিত হয়ে উঠলাম।

ফুল ও কমলা উল্লাসভরে আমার দরকারী বইপত্র, পেন পেনসিল এবং ফোনটা নিজেদের ঘরে নিয়ে এল।

ইন্দ্রাসন, রামস্বরূপ ও টম্বুকে ডেকে আমার ঘরের খাট, চেয়ার টেবিল ভিন্ন ঘরে সরিয়ে দিতে লাগল।...আমার ঘরটি গঙ্গাজলে ধৌত করা হল অনেকক্ষণ ধরে।

গুরুদেবের নির্দেশানুসারে মেজে খড় বিছিয়ে তার ওপর নূতন একখানি কম্বল বিছিয়ে রচিত হ'ল তাঁর শয্যা।...

মার ঘরে এসে একপাশে মেজের ওপরেই একখানি ছোট তোষক পেতে আমার শয্যা রচনা করে' নিলাম দ্রুত।

—ওকি করছ বড়দা?

বলল কমলা।

—আমার বিছানা!

—মেজে শোবে ?...ও-পাশে তো একটা সিঙ্গিল খাট পেতে নেয়া যেত !

—গুরুদেব যতদিন থাকবেন মেজেতেই শোবো।

হাসলেন মা, কী স্নেহোদ্বেজিত উজ্জ্বল তাঁর হাসি !

—এ-পাশে খাটেই বা আমরা শোবো কেন ?

বলল ফুল গাল ফুলিয়ে।

—থাম তুই !

বলে' ধমক দিলাম ফুলকে। তারপর ফোনটা ঠিক মাথার শিয়রে যথাযথভাবে রেখে মার দিকে চেয়ে বললাম ঃ

—এই আপদটার জন্যে তোমাদের কিন্তু অনেক ঝামেলা সইতে হবে মা ! দিনরাত ওটাতে 'ক্রিং ক্রিং' বেজে-ই আছে।

মা হাসলেন। গৌরবোজ্জ্বল আনন্দদীপ্ত তাঁর হাসি !

—আমি তোমার সব ফোন ধরবো বড়দা !

বলল ফুল পরমোৎসাহে।

—আচ্ছা, তুই এ-কয়দিন আমার সেক্রেটারী। কিন্তু ইংরেজীতে ফোন এলে ?

ফুলের আত্মমর্যাদায় বোধ হয় একটু আঘাত লাগল ঃ

—আমি ইংরেজী বুঝি না নাকি ?

—তা'হলে তো একটা সেক্রেটারীতেই কাজ হবে.। দ্যাট্স্ অল্ রাইট্।...কমলা তোর চাকুরী হ'ল না !

সারা দুপুর ধরে' মা ও বোন দুটোর সঙ্গে বিস্তর জল্পনা-কল্পনা করা গেল ঃ কটা শাঁখ বাজবে, গুরুদেবের আসার সময় কে কোথায় কী ভাবে থাকবে, কে কার পরে এগিয়ে এসে প্রণাম করবে। প্রণামান্তে কী ভাবে পেছিয়ে আসবে ভক্তিপ্লুত সৌজন্যে—গুরুদেবের শিষ্যদের কী ভাবে অভ্যর্থনা করা হবে—কাগজে কলমে সব লেখা হ'ল বিস্তর চিন্তা করে'।

অবশেষে বহু-প্রতীক্ষিত সন্ধ্যা এল, এলেন গুরুদেব।

সঙ্গে এলেন মাত্র দুজন শিষ্য : ডাঃ সচ্চিদানন্দ ও স্বামী আত্মানন্দ। ডাঃ সচ্চিদানন্দ গুরুদেবের সংসারী শিষ্য, বিশ্ববিখ্যাত পণ্ডিত, সারা পৃথিবী ভ্রমণ করেছেন অশান্ত জ্ঞানস্পৃহায়, গুরুদেবের কাছে দীক্ষা নিয়ে শান্তি পেয়েছেন অন্তরে। স্বামী আত্মানন্দ, সন্ন্যাসীশিষ্য, দীর্ঘকাল তন্ত্র ও যোগ-সাধনায় ছিলেন ব্যাপৃত, অলৌকিক শক্তি করেছেন অর্জন—ভক্তরা বলেন, মন্ত্রবলে নাকি মৃতজনকে-ও জীবন দেয়ার সাধনায় হয়েছেন সিদ্ধ।

দাদু তাঁদের দু'জনেরই গুরুভাই। গাড়ী থেকে নেমেই পরম স্নেহে দাদুকে তাঁরা আলিঙ্গন করলেন। কুশল জিজ্ঞাসা করলেন।

দু'জনের অনুমতি নিয়ে দাদু গুরুর নিকটে অগ্রসর হলেন 'জয় গুরু' বলে'। প্রণামান্তে গুরুভাই দুজনকে গৃহাভ্যন্তরে নিয়ে যাওয়ার আদেশ প্রার্থনা করলেন গুরুদেবের কাছে। আদেশ দিলেন গুরুদেব।

মা এলেন গঙ্গাজলের কলসী নিয়ে। গুরুদেবের পা ধুইয়ে দিলেন ভক্তিভরে। কুঞ্চিত কেশগুচ্ছ ঠেকালেন তাঁর শ্রীচরণে। তারপর সদ্যক্রীত একখানি নূতন গামছায় তাঁর পা দিলেন পরিপাটী করে' মুছিয়ে। মা যা করলেন, কমলা ও ফুলকে-ও তাই করতে হ'ল।

শাঁখ বাজতে লাগল ঘনঘন!

—নারায়ণ, নারায়ণ!

বলে' গাড়ী থেকে অবতরণ করলেন গুরুদেব।

প্রাচীন ঋষিদের কল্পনার চোখেই শুধু দেখেছি। প্রত্যক্ষ করলাম আজ, স্মরণীয় এই সন্ধ্যায়।

দিব্যকান্তি অনিন্দ্যনীয় পুরুষ তিনি। দৈর্ঘ্যে বোধ হয় ছয় ফুট মানুষটি হবেন। বেশ স্বাস্থ্যবান লাবণ্য সুন্দর দেহ। বয়স শুনেছি নব্বই ছাড়িয়ে গেছে, কিন্তু শক্ত সবল এখনো সাধারণ যুবকের মতই।

শুভ্র কেশ, শুভ্র শ্মশ্রু, শুভ্র বসন ও উত্তরীয়, শুচিসুন্দর হাস্যভঙ্গী, উন্নত প্রশস্ত ললাট, আকর্ণবিস্তৃত চক্ষু, চক্ষুতে দিগন্তব্যাপী দিব্যদৃষ্টি। আজানুলম্বিত

বাহুদ্বয় ঊর্ধ্বে উত্তোলন করে' স্মিতবদনে তিনি সমবেত জনতাকে আশীর্বাদ করলেন।

মনে হল বুদ্ধদেব বুঝি পুনর্বার আবির্ভূত হলেন ধরাধামে!

বাড়ীর আত্মীয়স্বজনরা সকলেই একে একে সমবেত হলেন গুরুদেবের কাছে। গুরুদেব অনেককেই চিনলেন। পুরাতন কর্মচারিদের অনেককেই নাম ধরে' ডেকে অবাক করে' দিলেন তাদের! নূতন যারা এসেছে তাদের নামধাম জিজ্ঞাসা করলেন পরম স্নেহভরে। মন্ত্র উচ্চারণ করে' সকলের মাথায় হাত রাখলেন।

আমি ছিলাম দূরে দাঁড়িয়ে। স্তব্ধ হয়ে দেখছিলাম ছবি। ছবি, ছবি, ভক্তি ও প্রীতির স্বর্গীয় ছবি। একজন মানুষ এত মানুষের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছে—এত ভক্তি, এত প্রীতি!

নিস্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়েই ছিলাম। হঠাৎ চমক ভাঙ্‌ল। ছুটে গেলাম গুরুদেবের কাছে। দুহাতে তাঁর চরণধূলি করলাম গ্রহণ।

—অনেক বড়টা হয়ে গেছিস্‌ বৃ!

বলে' দুহাত দিয়ে আমাকে বুকে নিলেন তুলে। স্থিরদৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চেয়ে রইলেন কিছুক্ষণ।

মস্তক আঘ্রাণ করে' হঠাৎ বললেন:

—জয়ী হও বৎস!

এমন সময়—

ক্ষুদ্রায়তন একটি চতুর্দোলা বহন করে আনল কর্মচারীরা। মূল্যবান সিল্কের বস্ত্রে ও নানাবিধ সুগন্ধী কুসুমে সুসজ্জিত সেই চতুর্দোলা। চতুর্দোলার মধ্যে ভেলভেটের সুদৃশ্য আসন, আসনের উত্তরে সুচিত্রিত সুন্দর তাকিয়া।

গুরুদেব চতুর্দোলার আসনে গিয়ে বসলেন। নারায়ণ নাম উচ্চারণ করলেন। শঙ্খধ্বনি সুরু হল নবোদ্যমে। গুরুদেবের ওপর বর্ষিত হতে লাগল পুষ্প, পুষ্পমাল্য।

চারজন জোয়ান কর্মচারী যথাবিহিত শ্রদ্ধাপ্রদর্শনান্তে অনুমতি নিয়ে স্কন্ধে উত্তোলন করল সেই চতুর্দোলা।

—গুরুজীকি জয়,

ধ্বনি উঠল মুহুর্মুহু।

মহানন্দে কর্মচারীচতুষ্টয় চতুর্দোলাখানি বহন করে' সিঁড়ি ভেঙে বারান্দা পার হয়ে গুরুদেবের জন্য নির্দিষ্ট গৃহখানির সম্মুখে এল। নামাল চতুর্দোলা।

—নারায়ণ!

বলে' দোলা থেকে বহির্গত হলেন গুরুদেব।

তখন—

মা, আরো তিনজন এয়োস্ত্রী সমভিব্যাহারে গুরুবরণে এলেন নানাবিধ অর্ঘ্যউপচারে সজ্জিত থালিকা হস্তে।

প্রদীপমালায় সজ্জিত একটি থালিকায় গুরুদেবের চরণদ্বয় তাঁরা বন্দনা করলেন।

পুষ্পসজ্জিত একটি থালিকায় গুরুদেবের বক্ষ ও ললাট বন্দনা করা হ'ল।

একটি থালিকা থেকে গঙ্গোদকপূর্ণ শঙ্খ তুলে নিলেন মা, তারপর গুরুদেবকে সাতবার প্রদক্ষিণ করলেন,—শঙ্খের জল গুরুদেবের মস্তকে অর্পণ করে মন্ত্রোচ্চারণ করলেন 'শিবায়, নারায়ণায় শম্ভবে, গুরুবে নমঃ'!

দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলী মধ্যমার শিরোদেশে স্থাপন করে' সহসা গুরুদেব হস্তখানি একবার ঊর্ধ্বে উত্তোলন করলেন।

সম্মুখস্থ সকলে মস্তক অবনত করলেন তখন।

অন্যমনস্কভাবে দাঁড়িয়েছিলাম। চমকে উঠে আমি-ও মাথা নিচু করলাম যন্ত্রের মত।

কতক্ষণ দাঁড়িয়েছিলাম জানিনা—মাথা তুলতে দেখলাম, গুরুদেব ঘরে প্রবেশ করেছেন, তাঁর শয্যায় গিয়ে বসেছেন।

শুনলাম, একটুপরেই তিনি যোগধ্যানে বসবেন। বাইরের কারুর সঙ্গে কোনো কথা এখন বলবেন না।

ধর্মের নামে অদ্ভুত এই আড়ম্বর ও আভিজাত্য মনকে একটুও বিষণ্ন যে করল না তা নয়। গুরুদেব নীরবে এ-সব সহ্য করে' গেলেন, প্রতিবাদ করলেন না, কিন্তু কেন করলেন না? তবে কি মনে মনে এ-সব চান? ঐশ্বর্যের আড়ম্বরে তাঁর আসক্তি ?...প্রশ্ন জাগল।

মানুষকে দেবতা বানিয়ে এই যে ভক্তির আতিশয্য—এটার-ই বা মূল্য কি, তাৎপর্য কি? সব মানুষই দেবতা, এ-তত্ত্ব স্বীকার করি, কিন্তু বিশেষ একজনকে বেছে নিয়ে এই যে অর্থহীন, যুক্তিহীন ভাবাবেগ, এটা কি শুধু হাস্যকর, ক্ষতিকর নয়?

কাকে এ-প্রশ্ন ক'রবো? কে এর উত্তর দেবে? সকলেই ভক্তির আবেগে আন্দোলিত, রোমাঞ্চিত।...আর স্বয়ং গুরুদেব তো এখন কথাই বলবেন না।

প্রশ্নব্যাকুল বিষণ্ন মন নিয়েই গুরুদেবের বিছানার কাছে গিয়ে বসলাম। বিছানাটি অবশ্য নিতান্ত দরিদ্রোচিত।...এরই বা অর্থ কী?...

মা বললেন:

—এমন বিছানায় কি মানুষে শোয়?

গুরুদেব হাসলেন।

—কত কষ্ট যে হচ্ছে এই বিছানা দেখে, বুঝতে কি পারছেন না?

—× × ×

—যেমনটি করতে চাইলাম, করা হ'ল না!

—আরো করতে চাস্ বেটি, আরো চাস্ জ্বালাতে?

বললেন সন্ন্যাসী মৌন ভঙ্গ করে'। হাসলেন:

—জ্বালা।...সাত জন্ম লাগবে।...

মা হাসলেন।

কি বিচিত্র। মুহূর্তে আমার বিষণ্ন ভাব গেল কেটে। আমার প্রশ্নাবলীর কোনো সামাজিক উত্তর না-পেয়ে-ও মনটা গুরুদেবে আকৃষ্ট হল আচম্বিতে। আমাদের প্রতি করুণা করে' সর্বত্যাগী যে-মানুষটি জনতার এই আড়ম্বর-অত্যাচার নির্বিকারভাবে সহ্য করে' চললেন, মনে হ'ল—তাঁর দেবত্বে ও প্রেমমহত্ত্বে বিশ্বাস না-করাই নাস্তিকতা।

সনাতন হিন্দুধর্মের বহুকালীন সংস্কার আমার রক্তে। প্রশ্ন করি, বিদ্রোহী হই—মুহূর্তেই আবার শান্তিলাভ করি ভাবাবেগের তলাতলে।

গুরুদেবের পায়ের কাছে একটু ঘেঁষে এসে বসলাম।

মা বললেন:

—সারাদিন তো পরিশ্রম করলি খোকা, এইবার একটু বাইরে যা, ঘুরে ধেরে আয়!

ইচ্ছা হ'ল গুরুদেবের সঙ্গে দুটো একটা কথা কই, তাই বললাম:

—এখানেই থাকি না মা!

—মা-ই জগদ্গুরু, বৎস...আদেশ মান্য করো!

গুরুদেব বললেন, স্নেহপ্রসন্ন।

—যে আজ্ঞে!

বলে, প্রণাম করে ঘর থেকে এলাম বেরিয়ে। মা-ও বেরিয়ে এলেন সঙ্গে সঙ্গে। বড় ব্যস্ত তিনি। শুনলাম ষোড়শোপচারে ভোগ রচনা করতে হচ্ছে তাঁকে।

—যা একটু ঘুরে আয়...রাত যেন বেশি করিস না!...বলতে বলতে তিনি বারান্দা পার হয়ে দ্রুত নিচে নেমে গেলেন।

পাশের ঘরেই স্বামী আত্মানন্দ এবং ডাঃ সচ্চিদানন্দের থাকার বন্দোবস্ত হয়েছে। ইচ্ছা হ'ল তাঁদের সঙ্গে একবার দেখা করি! কিন্তু তাঁদের ঘরের দ্বারপ্রান্তে এসে দেখলাম, ঘর লোকে লোকারণ্য।

কোথায় যাব এখন?...এতক্ষণ নেশার ঘোরে ছিলাম—ভিড়ের মধ্যে যে উত্তেজনার রস আছে—তা পান করছিলাম আকণ্ঠ। হঠাৎ নেশা গেল ভেঙে। বুঝলাম, এই ভিড়ের জগৎ আমার জন্যে নয়। মাতৃআদেশ-ই পালনীয়। যাই...পালাই...

কিন্তু যাব কোথায়?

গাড়ী তো বার করলাম। অকারণে প্রিন্সেপ ঘাটের কাছ বরাবর এলাম। গঙ্গার ধার দিয়ে হেস্টিংস পর্যন্ত ধীরে ধীরে ড্রাইভ করে' চললাম।

এতক্ষণ পরে, কা আশ্চর্য, শো-র কথা মনে এল।...যাব তার কাছে? হঠাৎ যাব?...সু-র কাছে যাই।...সু কি ছাই বাড়ী আছে এখন? শো-র কাছে-ই আছে হয়তো।

সারাদিনের মধ্যে একবারো সু আজ আসে নি।

সু-র বাড়ীতেই এলাম।...কিন্তু কেন যে এলাম, না এলেই ছিল ভালো।...

দেখি, সু বাড়ীতেই অবশ্য আছে: বৈঠকখানায় কয়েকজন বন্ধু নিয়ে মহানন্দে সভা করে বসেছে। হৈ-হল্লা চলছে লজ্জাহীনভাবে। সামনের টেবিলে কয়েক বোতল মদ রয়েছে—কয়েকটা শূন্য বোতল পড়ে রয়েছে এদিকে সেদিকে।

আমাকে হঠাৎ এই সময় দেখবে সু, এটা বোধ হয় কল্পনা-ও করে নি। একটু অপ্রতিভ হ'ল বুঝি। কিন্তু তা' কিছুক্ষণের জন্যে। হাত নেড়ে সে গান গেয়ে উঠল উল্লাসে। আহ্বান জানাল অশ্লীল আদরে। বলল:

—এসো, প্রাণের ইয়ার, এসো। তা' নিশ্চয়ই শ্রীমতী শো-র দূত হয়ে তুমি এসেছ?

সু-র কথার অর্থ হঠাৎ ধরতেই পারলাম না।

—দূত তুমি। অবধ্য। মাননীয়। এসো, এসো—বাহুপাশে এসো।

বলল সু নাটকীয় ভঙ্গীতে।...সু-র বন্ধুদের অনেকেই আমার পরিচিত। তারাও অনুরূপ ভাষায় আহ্বান জানাল হৈ-হৈ করে।

দ্বারদেশে দাঁড়িয়ে আছি তখন-ও। দেখে সু উঠল। এসে ধরল হাত। মুখ দিয়ে তার ভর ভর করে মদের গন্ধ বেরুচ্ছে।

—তা রাগ করছ কেন বৎস? দেখে যাও, ভালো করে' পরীক্ষা করে দেখে যাও—নতুন কোনো মেয়েমানুষ এখানে এনেছি কি না। রিপোর্টটা ঠিক মত দিয়ো সখে!

—× × ×

—নি, দেখে যাও, আসে নি। শালী আসুক আমি তা চাই-ও না। একেবারে দিব্যি গেলে বলছি, চাই না।...এরা সব ভদ্রলোক তো রয়েছে, বলুক চাই কি না!

—সত্যি আমরা কেউ-ই চাই না!

হৈ-হৈ করে' বললেন 'ভদ্রলোকেরা'।

—কতক্ষণ ধরে চলছে এ-সব?

—কতক্ষণ চালাতে বলো বৎস?

—তোমার-ও একটু চলবে নাকি?

একজন ভদ্রবন্ধুর সহৃদয় উক্তি। সু ক্ষেপে উঠল শুনে:

—চুপ রও। বৃ-কে এ-সব বলো না। বৃ সাধু।

—কি আমার সাধু রে!

—আমি চলি সু!...

—রাগ করে যাচ্ছ?

—না।

—তবে একটু হাসো।...কই হাসি দেখি!

—× × ×

—হাসলে না! তোমরা কেউ-ই হাসতে চাও না! তুমিও না। শো-ও না। শুধু হুকুম করো।...আমি মানবো না তোমাদের। যাও, সরে পড়ো!... কই যাও!

চলে যাওয়ার জন্যে পা বাড়ালাম। মাতালটা হুড়মুড় করে' এগিয়ে এল আবার। ধরল হাত। হাউ-হাউ করে' কেঁদে ফেলল তারপর।

—চলে যাচ্ছ সত্যি সত্যি। সবাই তোমরা আমাকে ত্যাগ করতে চাও? তুমি বৃ, তুমি-ও?

—শো-র সঙ্গে আবার এর মধ্যে হ'ল কি?

হঠাৎ সু-র কথার সুর গেল বদলে।

—হবে আবার কী! ও শালী কেবলি আমাকে ধমক দেবে, হুকুম করবে, আমি যেন ওর হুকুমের আরদালি। সাধে কি যাকে হ'ক বিয়ে

করে' ঘর-সংসার করতে ইচ্ছা যায় আবার !...একটু ভাব নেই, ভালবাসা নেই, ভক্তিটক্তি নেই, শুধু হুকুম ?...আমি ওকে 'ডাইভোর্স' করেছি !... এখন খাবো, প্রাণভরে খাবো, ডাইভোর্স করেছি, কিছু বলতে পাবে না বাবা !

—মদ খেতে বারণ করে, এ তো তোমারই ভালোর জন্যে।

—আর নিজে যখন খায় ?

একজন বন্ধুর প্রশ্ন !

—কোন্ ইডিয়েট বলে শো মদ খায় ?

সু জ্বলে উঠল অকস্মাৎ :

—দেখি নি একদিনো। তবে হ্যাঁ, নি বটে একখানি চিজ্। আচ্ছা টানতে পারে। সিনেমারাজ্যে জোড়া নেই।...যাই বলো বু, নি-র সঙ্গে প্রেম করেই আনন্দ !

—আচ্ছা আনন্দ করো ! চলি !

—নি-র নামেই চটে উঠলে ?...তা শো কী বলেছে বলে' যাও !

—শো বলেছে, তুমি গোল্লায় যাও !

হৈ-হৈ করে উঠল মাতালদল। কয়েকটা ইংরেজী অশ্লীল শব্দের গালাগাল কানে এল ভেসে।

মোটরে ষ্টার্ট দিলাম।

সোজা চলে' এলাম শো-র বাসায় ! কী হ'ল আবার সু-র সঙ্গে—স্পষ্টভাবে জানবার কৌতূহল জাগল তীব্র হয়ে।

কার্ড দিলাম দারোয়ানের হাতে। দারোয়ান আমাকে চেনে। তার মুখ দেখে বুঝলাম—তখনি আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে ওপরে যাওয়ার তার ইচ্ছা। তবু তাকে জোর করেই কার্ড নিয়ে ওপর থেকে খবর আনতে পাঠালাম। কারুর কাছেই, বিশেষ করে' কোনো ভদ্রমহিলার কাছে, যতই পরিচিত হই না কেন, অনিমন্ত্রিতভাবে আচম্বিতে যাওয়াটা ভদ্রোচিত নয় বলেই আমি জানি। সু এটা মানে না, আমার কিন্তু রুচিতে কেমন বাধে।

মিনিটখানেক বোধ হয় দাঁড়িয়ে আছি—কার্ডখানি হাতে নিয়ে দারোয়ানকে পেছনে ফেলে চঞ্চলা বালিকার মতই নাচতে নাচতে শো এলেন নেমে।

—কী সৌভাগ্য, কী সৌভাগ্য!

বলতে বলতে ছুটে এসে ধরলেন হাতে। পরম যত্নাদরে ওপরে নিয়ে তুললেন আমাকে। আজ আর লাইব্রেরীঘরে আমাকে বসানো হ'ল না, একেবারে বিশ্রামাগারে হ'ল স্থান।

—ব্যাপার কী বলুন তো?

বললেন শো পাশটিতে বসে:

—কাল সকালে এলেন, না-দেখা করেই গেলেন চলে! জানেন, সারা দুপুরটা কী বিশ্রীভাবে আমার কেটেছে?...গেছলেন কোথা?

—গ্রহের ফেরে নানাস্থানে।

—ব্যাপার কী!

—কিছুই না।...সাংসারিক কলহ।

—সংসারই পাতলেন না, অথচ কলহটিকে তো বাদ দিলেন না।... জীবনে কলহটাই নাকি সার সত্য?

—বোধ হয়।

বলে' হাসলাম।

—কফি খাবেন? তৈরী করি, কেমন?

—করুন!

—আমি একটু আগে খেয়েছি। তবু আপনার সঙ্গে বসে আবার একটু খাবো।

বললেন শো আত্মপুলকের উচ্ছ্বাসে:

—একটু বসুন! বলে' আসি!

শো ফিরে এলেন এক মিনিটের মধ্যেই। তারপর:

—কি আনন্দ হচ্ছে আপনাকে কাছে পেয়ে! আপনাকে একলা কাছে পাওয়া কত বড় ভাগ্যের কথা...এখনি কিন্তু চলে যাবে না তো?

একটু থেমে আবার :

—কাল সারাদিন শুধু তোমার কথাই কেবল ভেবেছি।...কত কী যে ভেবেছি।...রাত্রে একবার ফোন করলাম...সাড়া না পেয়ে ভাবলাম তখনো ফেরো নি বাড়ীতে।

—কেন, সু সন্ধ্যায় আসে নি...বলে নি কিছু ?

—কাল রাত্রে, বোধ হয় দশটা হবে, এল। তখন কি তার মাথায় ঠিক আছে ছাই।...হাউ হাউ করে কেঁদে শুধু বললে 'নি-র কাছে গেছলাম, ক্ষমা করো'। একেবারে বেহুঁস হয়ে ভুল বকতে বকতে এখান থেকে অনেক রাত্রে ফিরল। চাকরবাকরদের কাছে কী লজ্জায় সে আমাকে ফেলে বলো তো !

—আবার তাহ'লে নি-র কাছে গেছল !

—যায় তো শুনি মাঝে মাঝে। গেলেই মদ গিলে আসে। তবে মদ খেয়ে আমার কাছে কখনও আসে নি। কাল এমনভাবে না খেয়ে এলে বোধ হয় ব্যাপারটা চট করে' ধরা-ও পড়তো না।...খুব বকেছি আজ সকালে।

—সকালেই এসেছিল বুঝি !

—গুণে ঘাট নেই !

হাসলেন শো। তারপর বললেন :

—এসেছিল ক্ষমা চাইতে।...যা মনে এল তাকে বললাম। যেন ভিজে বেড়াল, শুনল মাথা নিচু করে।...চা এল, বাবু-র কী রাগ, খেলেন না। না খাবে, না খাবে। আমি গুম হয়ে বসে রইলাম। বাবু উঠলেন ! ঘর থেকে গেলেন বেরিয়ে ! একটু পরে আবার ফিরে এলেন। বললেন :

—আর এখানে আসবো না।

—তাই ভালো। নি-র কাছে যাও !

থমকে চমকে দাঁড়ালো সু। বলে' গেলাম :

—মদ যদি ছাড়তে না পারো, এখানে আর এসো না !

—× × ×

—বলো আর মদ ছোঁবে না!

বললাম একটু নরম সুরে!...হঠাৎ সু কঠিন হয়ে উঠল অপ্রত্যাশিতভাবে। বলল নীরস ভঙ্গীতে:

—তাই হবে। আমি আর আসবো না!

—বলছ মদ ছাড়বে না?

—ছাড়া উচিত নয় বলেই ছাড়বো না।

—মানে?

—মদ ছেড়ে তোমার অধীন হয়ে বাঁচার চেয়ে মদ ধরে স্বাধীন থেকে মরাই ভালো!

—এ-সব কী বলছ তুমি!

—বলছি কারুর হুকুমের আমি চাকর না।

—আমি যদি তোমার সামাজিক স্ত্রী হতাম, পারতে এ-কথা বলতে?

—আমার দুর্বলতায় আঘাত করার চেষ্টা করো না গো। আমার মদ খাওয়ার দোষেই আমার স্ত্রী মনের দুঃখে একদিন শুখিয়ে শুখিয়ে মরেছে— প্রেমিক মুহূর্তে কোন্ সময়ে নির্বোধের মত তোমাকে তা' জানিয়েছি। বলতে কি চাও, এত বড় প্রাণ তোমার, আমার জন্যে মরবে শুখিয়ে?

—আচ্ছা যাও। আর তোমাকে নিষেধ করবো না।

—× × ×

—স্বাধীন হও গে নি-র আঁচলে বাঁধা থেকে।...যাও! আর এসো না কোনদিন!

তবু সু বসে রইল অনেকক্ষণ। কী ভাবলো বসে' বসে। ধীরে ধীরে উঠল তারপর। চলে গেল ঘর থেকে।...বাইরে তার গাড়ীর ষ্টার্ট দেয়ার শব্দে চমক ভাঙলো।...একটু রূঢ় আচরণ করতে হ'লো। না করে তো উপায় নেই।...মনটা খুব বিশ্রী হয়ে আছে সেই থেকে।...সন্ধ্যার পর কেবলি ভাবছি: এই বুঝি এল।

—তোমার গাড়ীর আওয়াজে তো ভাবলাম—সু-ই বুঝি এল।

—× × ×

—এই যে এনেছিস্! বেশ ভালো করে' তৈরী করেছিস্ তো ?

শো বললেন 'বয়'কে।

ট্রে-টা টেবিলে নামিয়ে বয় চলে গেল। একটা কাপ আমার হাতে এগিয়ে দিলেন শো। তারপর :

—কফিতে আপনার...তোমার খুব লোভ না ?

—কী করে' জানলেন ?

—কী করে' আর জানবো! আমার কেবল মনে মনেই জানা।...কাছে তো পাই নে!

—× × ×

—ইচ্ছা হয়, তোমাকে কাছে-কাছে রাখি। অনেকক্ষণ, অনেকক্ষণ ধরে কথা বলি। যে-কথার শেষ নেই, সেই কথা। যে-বেদনার শেষ নেই সেই বেদনা অনুভব করি মনে মনে।

শো থামলেন। কফিতে চুমুক দিয়ে আবার :

—তা তো হবার নয়। মানুষকে নামতে হয় ঘরোয়া কলহে, ব্যতিব্যস্ত হতে হয় সাময়িক তুচ্ছতায়।...বাঁচতে সত্যি ইচ্ছা হয় না প্রিয়বন্ধু!

—সু যে কী, সত্যি বুঝতে পারি না। এই একরূপ, পরক্ষণেই অন্যরূপ। অদ্ভুত আমার এই বন্ধুটি।

—মানুষটা কিন্তু ভালো। খুব রিলায়েব্‌ল্। ভালোও বাসে।

—সেটা অবশ্য মানি।

—এই দ্যাখো না এখনি আসে বলে'।...আমাকে সে ঠেলতে পারবে না। মদ তাকে ছাড়তেই হবে।

বড় কষ্ট হল শো-র কথা শুনে, তার বিশ্বাসের গভীরতা অনুভব করে। বেচারা ভাবছে, তার ভৎর্সনায় সু বুঝি মদ ছেড়ে দেবে, নি-র আড্ডায় আর যাবে না!

অনিচ্ছাসত্ত্বেই বললাম :

—সু অবশ্য তোমাকে ঠেলতে পারবে না শো, কিন্তু তাকে যে-ভাবে দেখলাম তাতে মনে হল, মদ ত্যাগ করা তার পক্ষে অসম্ভব।...বৈঠকখানা

ঘরে মাতালদের নিয়ে মদের সভা, দেখলাম, জাঁকিয়ে বসেছে।...পালিয়ে এলাম তাই!

শো-র আনন্দসুন্দর বিশ্বাসোজ্জ্বল মুখখানি সহসা মেঘাবৃত চন্দ্রের মত নিষ্প্রভ হয়ে গেল।

নীরব হয়ে বসে রইল অনেকক্ষণ। তারপর আত্মগত ভাবে :

—তাহ'লে মদ সে ছাড়বে না?...হতভাগ্য নি তাকে বাঁচতে দেবে না?... আমি যাবো!

বলে' চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল শো। ঘরের বাইরে এল আমার কোনো সম্মতি না নিয়েই। ডাকল মথুরকে। বলল, এখনি গাড়ী বার করতে।

—গাড়ী বার করবে কেন? আমার গাড়ীতেই চলো না, যদি যেতে চাও!

—আমি একাই যাবো! একাই যাবো!

—আচ্ছা, আজ তবে উঠি!

কেমন যেন অন্যমনস্কা শ্রীমতী শো। আমার কথা বোধ হয় তার কানে গেল না।

উঠলাম। চমকে স্বপ্ন থেকে যেন জেগে উঠল শো। আমার হাতদুটি ধরল জড়িয়ে। তারপর নিতান্ত অসহায়ের সুরে :

—সেদিন বিনা অভ্যর্থনায় তোমাকে ফিরিয়েছি। আজও ফেরাচ্ছি প্রিয়বন্ধু!

—বন্ধু বলেই যখন গ্রহণ করেছ, তখন কোন বিষয়েই আর সংকোচ ক'রো না, দ্বিধা ক'রো না।

—মনটা বড় চঞ্চল হয়েছে বৃ!

— × × ×

—আবার কবে আসবে?

—বলো কবে!

—সু আমাকে বাঁচতে দেবে না প্রিয়বন্ধু। কবে যে তোমাকে সুরের সঙ্গে সুর মিলিয়ে নিবিড়ভাবে পাবো নিশ্চিন্ত হয়ে!

ডাক এল গাড়ী বার করা হয়েছে।

শো আবার আমার দিকে চাইল অসহায় বালিকার মত

—আমি তবে যাচ্ছি প্রিয়বন্ধু !

—চলো, আমি-ও যাই !

শো-র কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সরাসরি বাড়ী-ই ফিরলাম।

নানারঙের আলোয় আলোকিত আমাদের বাড়ীখানি দূর থেকে যেন ছবির মত দেখাচ্ছিল। রহস্যগম্ভীর বিষণ্ণ মন নিয়ে আলোকমালার দিকে তাকালাম—এ-আলোকসজ্জা আমারই রচনা, তবু এ-রচনায় তেমন কোনো আত্মপ্রসাদ-ই অনুভব করলাম না। মনে হল, অন্ধকার পৃথিবীর সম্মুখে এ-আলোকমালার আভিজাত্য অর্থহীন শুধু নয়, বেদনাদায়ক-ও বটে।

তবু মনকে স্থির রাখতে হয়।...বাইরের তিক্ততা, বাইরের ঝামেলা, বাইরের মোহসঞ্জাত বেদনার আর্ততা ঘরের সীমানায় আনতে নেই। নির্বোধ আমরা তা আনি বলেই ঘরের শান্তিতে থাকি বঞ্চিত, বোঝালাম গম্ভীর মনটাকে। যে-সব সম্মাননীয় ভক্তিভাজন অতিথি আজ আমাদের গৃহে, তাঁদের যথাবিহিতভাবে পূজা ও অভ্যর্থনা করতে হবে স্বচ্ছ ও অনাবিল ভাবের প্রশান্তি নিয়ে, নইলে বিচ্যুত হব অন্তর্জীবনে, বঞ্চিত হব উৎসবের আনন্দোপভোগে!

সরাসরি উঠে এলাম গুরুদেবের ঘরে। দেখলাম, মা গললগ্নী বস্ত্রা হয়ে গুরুদেবের সম্মুখে এসে দাঁড়ালেন কৃতাঞ্জলিকরপুটে।

—কৃপা করুন গুরুদেব!

বললেন মধুর নম্রতায়।

ব্যাপার কী? না, গুরুদেবের জন্য 'মহাভোগের' আয়োজন হয়েছে। মা এসেছেন তাঁকে নিয়ে যেতে।

গুরুদেব গাত্রোত্থান করলেন। আমাকে সম্মুখে দেখে কৃপা করে' আমার স্কন্ধে হাত রাখলেন। তারপর মাকে অনুসরণ করে' ভিন্ন একটি ঘরে এসে উপস্থিত হলেন।

ঘরে দেখলাম, গুরুদেবের জন্য ভোজ্যদ্রব্যাদি থরে থরে সাজানো হয়েছে। ‘মহাভোগ’ই বটে।...অভিনব রাজকীয় ভোজ্যায়োজন।

ঘরের পূর্বকোণে একটি স্বর্ণনির্মিত প্রদীপ জ্বলছে।

মধ্যস্থলে একটি মখমলের বিপুলাকার আসন। আসনের দক্ষিণপার্শ্বে স্বর্ণ-গেলাসে পুণ্যোদক। রৌপ্যাধারে তাম্বুলাদি বিচিত্র মুখশুদ্ধি।

আসনের সম্মুখে প্রায় অর্ধশতাধিক রূপার বাটিতে বিভিন্ন ব্যঞ্জন। শ্বেত-প্রস্তর নির্মিত বহু বাটি ও গেলাসে নানাপ্রকার ভোজ্য ও পানীয়। রৌপ্য ও প্রস্তর-থালিকায় সুগন্ধ ফলমূলাদি ও মিষ্টান্ন সম্ভার। মধ্যে স্বর্ণথালিকায় মিহি-চাউলের পুষ্পশুভ্র সুসিদ্ধ অন্ন।

একজন মানুষের জন্যে এত আয়োজন—এ আমি কখন-ও কল্পনা করতে পারি না। আমাদের বাড়ীতে এত সমস্ত স্বর্ণ ও রৌপ্যের বাসন আছে, এ-পর্যন্ত কখন-ও সুযোগ হয় নি দেখবার বা জানবার। বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে আমি শুধু নির্বোধের মত তাকিয়েই রইলাম।

গুরুদেব ‘নারায়ণ’ নাম উচ্চারণ করে’ নিতান্ত নিস্পৃহের মতই আসনে উপবেশন করলেন।

গুরুবন্দনা সুরু হল। মা প্রদীপহস্তে আরতি করলেন গুরুদেবের। কাসরঘণ্টা ধ্বনিত হ’ল। শঙ্খ বাজল। উলুধ্বনি শ্রুত হ’ল ঘন ঘন।

গুরুদেব ধ্যানে বসলেন।

দেখলাম, স্বচক্ষে দেখলাম, ক্রমশঃ তাঁর দেহখানি ধীরে ধীরে পাথরের মত নিস্পন্দ, নিথর হয়ে এল। সারনাথের ধ্যানী বুদ্ধমূর্তির মত নিস্তব্ধ অথচ হাস্যসুন্দর সেই অভিনব মূর্তি।

দূর থেকে সেই মূর্তির উদ্দেশ্যে নমস্কার জানিয়ে একে একে সকলে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে লাগল।...আমি তখনও ফ্যাল্‌ফেলিয়ে চেয়ে রইলাম গুরুদেবের জ্যোতির্দীপ্ত সেই নিশ্চল মূর্তির দিকে। সহসা চমক ভাঙল মা-র ডাকে:

—এখানে এখন থাকতে নেই খোকা, চলে এসো!

মন্ত্রমুগ্ধের মত চলে এলাম ঘর থেকে। মা ঘরের সমস্ত দরজা, জানালা বন্ধ করে' দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলেন। বাড়ীতে তখন লোকে লোকারণ্য—কিন্তু কারুর মুখে কোনো কথা নেই, কোনো শব্দ নেই। সকলের চোখেই ভক্তিনম্র একটি সাত্ত্বিক প্রতীক্ষা।

প্রায় তিন কোয়ার্টার কি একঘণ্টা পরে গুরুদেব ঘর থেকে এলেন বার হয়ে। আমি কৌতূহলপরবশ হয়ে তাড়াতাড়ি প্রবেশ করলাম সেই ভোজন-ঘরে। দেখলাম, ভোজ্যদ্রব্যাদি যেখানে যেমনটি ছিল তেমনটিই সাজানো আছে, গুরুদেব একটু-ও স্পর্শ করেন নি। ব্যাপার কী? না, মা বললেন, ওই তাঁর খাওয়া হয়েছে, অর্থাৎ দেবতাকে উৎসর্গ করা মানেই সন্ন্যাসীর খাওয়া।

—আর কিছু-ই খাবেন না?

—না, আবার খাবেন কেন? ওই তো খাওয়া হ'ল!

—তবে কি গুরুদেব উপবাস করেন প্রত্যহ? না, ডাঃ সচ্চিদানন্দ বললেন, লোকসমাজে যখন থাকেন, তখন সাতদিন, চোদ্দদিন, একুশদিন কি একমাস অন্তর ভক্তদের তুষ্ট করার জন্যে কিছু খান, তা-ও আবার খানিকটা দুধ, কিছু ছানা, কয়েকটা হরিতকী খানিকটা গব্যঘৃত!...যখন পাহাড়ে গুহায় থাকেন, তখন এ-সবেরও নাকি দরকার হয় না। তবে এতসব ভোজ্যদ্রব্যের আয়োজন করা কেন? না, স্বামী আত্মানন্দ বললেন, ভক্তরা প্রসাদ পাবে।...সবুর করো, তুমি-ও পাবে!

তা পেলাম—বেশ ভালোভাবেই পেলাম। গুরুদেবের শিষ্যদ্বয়ের সঙ্গে আমার-ও যত্নাদর বড় চূড়ান্ত রকমের হ'ল। দাদু সামনে বসে থেকে আমাদের খাওয়ালেন। মায়ের সঙ্গে কমলাও আমাদের পরিবেষণে এল পরম উল্লাসে। ডাঃ সচ্চিদানন্দ, দেখলাম বচনে যত পটু ভোজনে তত-পটু নন, কিন্তু সন্ন্যাসী আত্মানন্দ নির্লোভ যোগী হলে-ও ভোজনব্যাপারে অতীব সুপটু। নীরবে পরম তৃপ্তির সঙ্গে তিনি ভোজনপর্ব সমাধা করতে লাগলেন। দাদু বললেন আমাকে:

—বেশ ভক্তিভরে খাও বু! গুরুদেব তোমার ওপর কৃপা করেছেন। তোমার মধ্যে লক্ষণ দেখেছেন।

গুরুদেবের প্রতি আমার ভক্তি অবশ্য হয়েছে, কিন্তু ভক্তিভরে যে খাচ্ছি সেটা ভোজ্যদ্রব্যের অপূর্বতার জন্যেই বটে। মাকে বললাম :

—ওই যে ওই বাটিতে, ওই সাদা পাথরের মস্ত বড়ো বাটিটাতে, যা রয়েছে, আর একটু যদি—

—জিনিসটা অতীব উত্তম!

বললেন আত্মানন্দ। সচ্চিদানন্দ হাস্য করলেন। মা পরমানন্দে আমার ও স্বামীজির পাতে খানিকটা 'অতীব উত্তম' জিনিস ঢেলে দিলেন। আহা, আস্বাদটা আজ-ও যেন জিবে আছে লেগে। শুনলাম গুরুদেবের এটিই নাকি প্রিয়খাদ্য। হিমালয়প্রদেশের ভক্তরা একাধিকবার গুরুদেবকে করে' খাইয়েছে। অন্নের সঙ্গে ক্ষীর ও ছানাভাজা তৎসহ পেস্তা-বাদাম-কিসমিস ও আপেল, চিনির রস ও গব্যঘৃত দিয়ে অভিনব এ-বস্তুটি করা হয়েছে, মুখে দিলেই মনে হয় এরই নাম বুঝি অমৃত, দাদু বললেন, গুরুদেব এর নাম দিয়েছেন 'অভিনবা'—তা গুরুদেব তো একটু-ও এই 'অভিনবা' গ্রহণ করলেন না!...না, ব্রহ্মে সমর্পণ করার সঙ্গে সঙ্গে এ-সবের স্বাদ তিনি স্বতঃই পেয়ে যান, ইন্দ্রিয় দ্বারা স্বাদ গ্রহণ করতে আর হয় না!

বিচিত্র কথা। আধুনিক কালে তো একেবারে অবিশ্বাস্য কথা! কে বিশ্বাস করবে—সংসারে এখনও এমন মানুষ আছে?

—তুমি-আমি হয়তো বিশ্বাস করবো না, কিন্তু ছিলেন, আছেন, চিরকাল থাকবেন।

বললেন ডাঃ সচ্চিদানন্দ। চমকে উঠলাম। সচ্চিদানন্দকে এ-সব কথা তো জিজ্ঞাসা করি নি, মনে মনেই ভেবেছি মাত্র। অন্তর্যামী নাকি?

স্বামী আত্মানন্দ হাসলেন। পায়সের বাটিটা কোলের কাছে নিলেন টেনে।

খাওয়া স্থগিত রেখে হাত গুটিয়ে হাঁ করে আমি ডাঃ সচ্চিদানন্দের দিকে তাকালাম।

—খুবই বিস্মিত হচ্ছ ব্র ডক্টরের 'চিন্তাপাঠের' ম্যাজিকটুকু দেখে? বললেন দাদু।

—আমিও একদিন খুব বিস্মিত হয়েছিলাম।

—এ-সব কিন্তু নিতান্ত-ই তুচ্ছ ব্যাপার!

একটা সন্দেশ মুখে দিতে দিতে বললেন ডাঃ সচ্চিদানন্দ :

—সন্ন্যাসীরা এ-সবে মন দিতে চান না, দিলে সত্যসত্যই লোক প্রতিষ্ঠায় মন যায়, বাহবা পেয়ে বড়াই করতে যায় সাধ।

—তবে মাঝে মাঝে এমন করো কেন?

প্রশ্ন করলেন দাদু।

—লোকমঙ্গলের জন্যে এমন করার-ও প্রয়োজন আছে।...

—কিন্তু 'থট্-রিডিং'টায় এমন কি মঙ্গল করা সম্ভব?—বললেন স্বামী আত্মানন্দ।

—বিশেষ কিছুই নয়। কিন্তু তোমার কাছেই এটা স্বীকার করতে পারি ভ্রাতঃ, সাধারণের কাছে নয়।...সাধারণে তত্ত্ববিষয়ের সাধনা করে না, তবু অবিশ্বাস করে, দু-পাতা প্রাকৃতবিজ্ঞান পড়েই মনে করে জগৎব্রহ্মাণ্ডের সকল বিদ্যাই তার আয়ত্তাধীনে এসেছে। আধ্যাত্মিক সূক্ষ্ম আনন্দবাদিতার নিষ্কাম তত্ত্বে সাধারণে মন দিতে পারে না, সেটা তার অধিকারে-ও নেই। কিন্তু 'চিন্তাপাঠের' শক্তিদর্শনে বিস্ময়বোধ করার অধিকার তার আছে। এইটুকু বিস্ময়বোধের সূত্র ধরেই আস্তিককে আজ অগ্রসর হতে হয় নাস্তিক সমাজের হৃদয় পরিবর্তনে। সন্ন্যাসীর কাছে এটা অত্যন্ত তুচ্ছ ব্যাপার কিন্তু সন্ন্যাসসাধকদের অনেকেই এটা আয়ত্ত করেন বিশ্বমঙ্গলের উদ্দেশ্যে।

একটু থেমে একটু জল খেয়ে নিয়ে পুনর্বার :

—অবশ্য সাধক যদি নিম্নস্তরের হয় তবে সে এটুকুর সুযোগ নিয়ে মানুষ ঠকানোর কাজে-ও অনেক সময় লেগে যেতে পারে! এমন-ও যে দেখি নি তা নয়।

—অন্যের চিন্তা চকিতে পাঠ করার কৌশল কি?

জিজ্ঞাসা করলাম।

—'কৌশল' ব'লো না বৎস, বলো 'নিয়ম' কি।

বললেন স্বামী আত্মানন্দ।

—নিয়ম কি ?

—শম-দম-সত্য-সংযম।

উত্তর দিলেন স্বামিজী। তারপর মুহূর্তকাল আর নিশ্চেষ্ট না থেকে 'রাজভোগ'-এর অভিমুখে হস্ত প্রসারিত করলেন। ডাঃ সচ্চিদানন্দ বলে চললেন ঃ

—আজকের যুগে 'শম-দম'র কথা বললে আমার মত যারা বুদ্ধিমান তারা তো হেসে উঠবে। রাজনীতিকেরা বলবে 'রিয়াক্‌সনারি'। সুতরাং এ-সব কথা আমি বলবো না কোথাও। সাধনার দ্বারা শুধু হবো। হলে-ই দেখা যাবে কী হয়, কত শক্তি বাড়ে। হবো না, হতে পারবো না অথচ হওয়া যায় না, হয়ে কী হবে বলে তর্ক করবো—এটা কাজের কথা নয়। হতে না পারো সরে যাও। কিন্তু সমাজকে কলুষিত ক'রো না না-হওয়াটাকে সমর্থন করে'। আমাদের মত নাস্তিকেরা তাই করে, সমাজের ওপর সংশয়বুদ্ধির জোর ফলিয়ে স্বেচ্ছাচারিতার করে সমর্থন, সন্ন্যাসসাধকদের তাই আজ এগোতে হয় ; মনোজীবনের অনভিব্যক্ত বিদ্যার সুস্পষ্ট প্রকাশ দ্বারা মানবাত্মার মহিমা বাড়াতে হয়, স্তব্ধ করতে হয় নাস্তিকদের। যুগে যুগে এটা হয়েছে। আর এটা হয়েছে, হয়ে আসছে বলেই মানবাত্মা জড়ত্ব পেয়ে বস্তুপিণ্ড হয়ে যায় নি !

—আর কী দেব স্বামিজী ?

আত্মানন্দকে মা জিজ্ঞাসা করলেন স্নেহার্দ্র সৌজন্যে।

—জয় গুরু! যথেষ্ট হল! সংসারিদের পাল্লায় পড়ে আজ অনেক খেতে হ'ল !

কৌতুক করলেন স্বামী আত্মানন্দ।

শয়ন করতে এলাম, রাত তখন বারোটা হবে। ও-পাশের খাটে ফুল শুয়ে অঘোরে ঘুমুচ্ছে, কমলা-ও নিদারুণ পরিশ্রমের পর এল শুতে।

—মা কি করছে রে ?

জিজ্ঞাসা করলাম। শুনলাম সারাদিন উপবাসের পর মা এইমাত্র প্রসাদ পেতে বসেছেন।

—গৃহী ভক্ত হওয়ার চেয়ে সাধু সন্ন্যাসী হওয়া ঢের ভালো!

বললাম একটু চেঁচিয়ে, কমলাকে শুনিয়ে। কৌতুক করে ছড়া কাটলাম তারপর:

—ভক্ত হলে নিত্য উপবাস, সাধু হলে ভোজনে হাঁসফাস্।...স্থির করলাম, জানিস কমলা, সন্ন্যাসীই হবো!

—স্বামিজীর খাওয়া দেখে ঠাট্টা করছ বড়দা!...জানো না তো কিছু। ...মাত্র দুদিন হ'ল একটা দুরূহ যোগসাধনায় সিদ্ধ হয়ে উঠেছেন। মাটির বিশহাত তলায় সমাধিস্থ থেকে পঁয়তাল্লিশ দিন তপস্যা করেছেন।...গুরুর আদেশে ত্রিকূট থেকে লোকসমাজে এলেন কয়দিনের জন্যে। ভক্তদের খুসি করার জন্যে গুরুদেবের প্রতিনিধি হয়ে খেলেন কিছু। আবার যখন যোগে বসবেন, একেবারে দেড়মাস উপবাস।

—তা যা খেলেন, দেড় মাস লাগবে হজম করতে!

—সত্যকার সাধুদের নিয়ে ঠাট্টা ক'রো না বড়দা, ওতে তাঁদের তো কিছু ক্ষতি হবে না, কিন্তু তোমার হবে!

—কেন অভিশাপ লাগবে বুঝি?

—অভিশাপ লাগবে কেন!...শ্রদ্ধা দানের দ্বারা তুমি যে-বড়টা মনে মনে হতে পারো, সেটা ঠাট্টা করার জন্যে যদি না হও, তবে মনের দিক থেকে কি ক্ষতি হবে না?

কমলাকে আর চটালাম না। মা-র কাছে যে-মেয়ের শিক্ষা, তার বুদ্ধি বিবেচনার কাছে হেরে যাওয়া-ই আনন্দের। অন্য কথা পাড়লাম:

—মা বুঝি সারাদিন উপবাস ক'রে ছিলেন?

—'মহাভোগ' না হলে বুঝি খেতে আছে?...আমি-ও তো উপবাস ক'রে ছিলুম। ফুলটা পারল না। তিনটের সময় জল খেল।

নিস্তব্ধ হয়ে শুয়ে রইলাম। মনে পড়ল:

—কেন করো এই উপবাস!

কতবার মা-কে এ-প্রশ্ন করেছি। উত্তরে মা শুধু হেসেছেন। আজ কি জানি কেন, মনে হল, যা আমি করতে পারি না—সর্বক্ষেত্রে তাই যে অর্থহীন, তা হয়তো নয়। আধ্যাত্মিক কোনো আদর্শের অনুরোধে জীবনে যে একবারো উপবাস করে নি—উপবাসের মাহাত্ম্যটি তার পক্ষে বোঝা হয়তো সম্ভব না।...অন্নাভাবে, খেতে না-পাওয়ায় যে উপবাস—সে উপবাসের কথা বলছি নে, সে-উপবাস পাপ-ই বটে, সে আমার পাপ, তোমার পাপ, সমাজের পাপ, রাষ্ট্রের পাপ, বিশ্বের পাপ। কিন্তু সম্মুখে আছে ভোজ্যবস্তুর প্রচুর আয়োজন, তবু গ্রহণ করছি না, ক্ষুধা সংবরণ করছি ব্রতপালনের আনন্দে, নিজেকে প্রত্যক্ষ করছি না-নেয়ার পৌরুষে, ত্যাগ-ভাবের মহত্তর আদর্শে,—এ যে কী অপরিমিত অমৃত-পুলকের আস্বাদন, দিনে চারবার করে না খেলে যার চলে না, সে কি করে জানবে? মনে হ'ল কমলা যা জানে, মা-র কাছে শিখেছে, আমি তা জানি না, শিখি নি। মনে হল, উপবাস শুধু সংস্কার মাত্র না, শুধু কৃচ্ছ্র সংযম না, ব্রতাচার না, প্রকৃতিকে শাসনে রেখে ধর্মে স্থিতধী থাকার পুণ্য প্রক্রিয়ার নাম কায়িক উপবাস।

মায়ের প্রতি আমার ভক্তি তীব্রতর হল: ভারতের মেয়ে তুমি,—বললাম মনে মনে: ধর্মের নিয়ম তুমি যেমন জানো, আমরা অর্বাচীন কেমন করে' তা জানবো? তবু তোমাদের এই ধর্মকে আমরা যে কারণে-অকারণে পরিহাস করি, বিচার করি, এ আমাদের দম্ভ, আমাদের পাকামি, আমাদের অন্ধতা।

আলো নিভিয়ে দিয়ে চুপ করে শুয়ে ছিলাম। কমলা ঘুমিয়ে পড়েছে। আমার চোখে ঘুম নেই।...মা এসে ঘরে প্রবেশ করলেন। আলোটা দিলেন জ্বালিয়ে। আমি ঘুমিয়ে পড়েছি ভেবেই বোধ হয় আমাকে ডাকলেন না। আমার মশারীর চারপাশ ভালো করে' দেখে পরীক্ষা করে' নিজের বিছানার দিকে এগিয়ে গেলেন। এটা সেটা কাজ করলেন এদিকে সেদিকে গিয়ে। সহসা স্থিরভাবে দাঁড়ালেন গৃহের মধ্যস্থলে। কার উদ্দেশ্যে করজোড়ে অনেকক্ষণ ধরে' প্রণাম করলেন মাথা নত করে। আলো নিভিয়ে দিলেন তারপর।

এমন মায়ের আমি পুত্র হয়েছি কোন্ পুণ্যে—জাগল জিজ্ঞাসা। নারীর রূপমোহে কামাচ্ছন্ন আমি ঘৃণ্য কীট, বিলাসব্যসনে লুব্ধ আমি মানুষ-পশু! মনে পড়ল, বন্ধুদের পাল্লায় পড়ে খানিকটা মদ-ও খেয়েছি একদিন। বাঙালীদের মত মাছমাংস খেতাম, এখনো মাঝে মাঝে খাই বিনাদ্বিধায়। মনে পড়ল শো-কে একদিন, কী লজ্জা...ইচ্ছা কি হয় নি?...বেঁচে গেছলাম বুঝি মায়ের পুণ্যফলে...এখনও বোধ হয় সুযোগ পেলে...

—নারায়ণ!

বলে' অন্ধকারে মা একটি স্তব পাঠ করলেন। স্তবমন্ত্রের ঝংকারে অশান্ত মনটা যেন জুড়িয়ে গেল। সুরঘন আনন্দের জ্যোতিশ্চেতনা সঞ্চারিত হ'ল মনে। একখানি শুভ্র সূক্ষ্ম শান্তির উত্তরীয় কে যেন মেলে দিল সর্বাঙ্গে।

—নারায়ণ!

বললাম মনে মনে। বিচিত্র মানুষের মন, সু-কে মনে পড়ল অপ্রত্যাশিত-ভাবে। মনে মনে বললামঃ সু, আমি তোমাকে মদ খাওয়া ছাড়াবো। তোমাকে টেনে আনবো আমার মায়ের কাছেঃ আমার মায়ের সত্যকার রূপটি এখন-ও তুমি দেখতে পাও নি!...শো কি করছে? বেচারা হয়তো বসে আছে জেগে। কী মধুর ভালবাসা এই শো-র।...সাধ্য কি সু আবার মদ খায়!...সাধ্য কি যে ব্যর্থ করে' দেয় শো-র প্রেম! মধুরা শো, আমি তোমাকে সত্যসত্যই ভালবাসি। তোমাকে দুঃখ দেবে, অপমান করবে মাতাল সু, অভিমানী সু, অসহায় সু,—এ আমি কিছুতে, কিছুতে হতে দেব না!

রাত করে শুয়েছি, তবু ভোর চারটের আগেই ঘুম ভেঙে গেল বেদমন্ত্রের আবৃত্তি শুনে। কানে ভেসে এল গুরুদেবের মধুর কণ্ঠস্বর :

—কলিঃ শয়ানো ভবতি সঞ্জিহানস্তু দ্বাপরঃ
উত্তিষ্ঠংস্ত্রেতা ভবতি কৃতং সম্পদ্যতে চরংশ্চরৈবেতি ॥

শ্লোকটি আগেই আমার জানা ছিল—কিন্তু আবৃত্তির গুণে তার অর্থ ও ব্যঞ্জনা কত যে গভীর হয়, হতে পারে, আজ-ই তা' যেন নূতন করে উপলব্ধি করলাম।...গান শিখেছি শান্তিনিকেতনে, আবৃত্তি শুনেছি কত ভালো শিল্পীর, কিন্তু এমন ভাবাবেগপূর্ণ প্রাণময় আবৃত্তি কখনও তো শুনি নি।...

শয্যাত্যাগ করে ছুটে গেলাম গুরুদেবের কাছে। চক্ষু মুদ্রিত করে' পদ্মাসনে তিনি উপবিষ্ট। স্মৃতি থেকে আবৃত্তি করছেন বেদ : ঘুমন্ত জাতিকে যেন আহ্বান করছেন : ওঠো, জাগো, চলো। শুয়ে থাকে যারা, তাদের কলিতে পায়, ঘুম যাদের ভেঙেছে, দ্বাপরে আছে তারা, দাঁড়িয়েছে যারা চলার অভিপ্রায়ে, ত্রেতার আশীর্বাদ তাদের ভাগ্যে, আর সত্যযুগে যদি বাঁচতে চাও, তবে, ওঠো, জাগো, চলো...

অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম দ্বারপ্রান্তে। দেখলাম। শুনলাম। মনে মনে অনুসরণ করলাম তাঁর উচ্চারণভঙ্গী, তাঁর সুরবৈচিত্র্যের বৈশিষ্ট্য।

মনটা ভরে গেল অভিনব জ্যোতিঃসম্পদে। জীবনে ভোর বুঝি হল'। একটু পরেই সূর্য উঠবে আকাশে। প্রাচীন কোন্ বরুণদেবের শিষ্য আমি জিজ্ঞাসু ভৃগু, পাঠ নিতে জাগরিত হয়েছি অন্তরের আশ্রমে।...

স্নানাদি সেরে শুদ্ধবস্ত্র পরিহিত হয়ে পুনর্বার এলাম গুরুসন্নিধানে। মা এসেছেন ইতিপূর্বে। কৃতাঞ্জলি হয়ে বসেছেন সম্মুখে। গুরুদেব এখন গীতাপাঠ করছেন। মধ্যে মধ্যে ব্যাখ্যা করছেন।

স্থির নয়নে আমি তাঁকে নিরীক্ষণ করতে লাগলাম। গুরুদেবের কণ্ঠস্বর এবং পাঠভঙ্গীর অনন্যতা মুহূর্তের মধ্যে আমাকে সম্মোহিত করে ফেলল।...গুরুদেবের বসা, হাত-নাড়া, মুখতোলা, মাঝে মাঝে থেমে-থাকা, হঠাৎ জেগে-উঠে গীতা-গ্রন্থের পৃষ্ঠা উল্টানো—সমস্ত-ই আমার কাছে অভিনব চিত্রের মত প্রতীয়মান হ'ল।

সহসা আলমারী থেকে আমার গীতাগ্রন্থখানি বার করে' আনলাম। গুরুদেব, মায়ের আহ্লাদে, 'বিশ্বরূপদর্শন' পাঠ করছিলেন—আমি সেই অংশ তাঁর সঙ্গে সঙ্গে আবৃত্তি করতে সুরু করলাম।

গুরুদেব আমার মনোভাব বুঝলেন। করুণাপরবশ হয়ে পাঠ সম্বন্ধে দুটি-একটি উপদেশ দিলেন। যে-কয়দিন এখানে আছেন, প্রত্যহ বেলা দুটোর পর আমাকে পাঠশিক্ষা দেবেন বলে' প্রতিশ্রুতি দিলেন।

আকাশের চাঁদ যেন হাতে পেলাম।

গুরুদেব 'বিশ্বরূপদর্শন' শেষ করলেন। সমাহিত হয়ে শুনলাম সবটা।... বেলা সাতটা বাজল। গুরুদেব কথা দিয়েছেন সাতটা থেকে ন-টার মধ্যে তিনি সকলের সঙ্গে কথাবার্তা বলবেন। আত্মীয়স্বজন একটি একটি করে' আসতে সুরু করল দেখে প্রণামান্তে আমি চলে এলাম মায়ের ঘরে।

ঘরে তখন কেউ ছিল না। দরজা ভেজিয়ে দিয়ে মেজে একটা আসন পাতলাম। ঠিক গুরুদেবের বসার ভঙ্গীতে উপবেশন করলাম। ধীরে ধীরে পাঠ সুরু করলাম তারপর:

—অর্জুন বললেন: যে-তত্ত্বোপদেশ তুমি দিলে তাতে আমার মোহ বিদূরিত হ'ল। এবার, প্রভো, তোমার পরমাত্মরূপ দেখাও।

মন্যসে যদি তচ্ছক্যং ময়া দ্রষ্টুমিতি প্রভো।
যোগেশ্বর ততো মে ত্বং দর্শয়াত্মানমব্যয়ম্ ॥

—তবে দেখাও তোমার পরমাত্মরূপ, যা কেউ দেখেনি, তা' দেখাও, আমি-ও বললাম। কিন্তু দেখতে না জানলে দেখব কি করে?—প্রশ্ন জাগল। কষ্ট হ'ল। অননুভূত বেদনার ভাবরসে উত্তেজিত হ'ল অন্তরাত্মা।

এ-রস কি শিল্পভাবের রস ?

অদর্শনকে আনতে চাই দর্শনে, অরূপকে রূপচিত্রের রসরেখায়, এ কি নয় শিল্পমানসের উচ্চাভিলাষ ?

সত্য কথা বলতে কি, গুরুদেবের অনুকরণ করে অথবা গীতাদি ধর্মগ্রন্থ পাঠ করে' ধর্মবোধের চেয়ে শিল্পভাবের আনন্দটিই আস্বাদ করলাম অন্তরে! ছন্দের দিকে, বিশুদ্ধ উচ্চারণের দিকে, সুরসঙ্গতির বিজ্ঞানরীতিটির দিকেই রইল গভীর দৃষ্টি।...হঠাৎ এ-ও একবার মনে হ'ল—কোনো সিনেমা কোম্পানী আমাকে যদি সত্যকার কোনো সাধুসন্ন্যাসীর চরিত্র অভিনয় করতে দেয়, আমি রীতিমত নৈপুণ্যের সঙ্গেই তা করতে পারব!...বিচিত্র!

পাঠ করে' চললাম। পাঠের সময় গুরুদেব যেমন উদাসদৃষ্টিতে মধ্যে মধ্যে চেয়ে দেখেন, যেমনভাবে হাত নাড়েন, যেমনভাবে মৃদু মৃদু হাস্য করেন, পাঠ করার সঙ্গে সঙ্গে নিপুণভাবেই তা' অনুসরণ করতে চেষ্টা করলাম।

হঠাৎ চমক ভাঙল ফুলের ধমকানিতে। দুদ্দাড়বেগে সে ঢুকল ঘরে। তারপর:

—বড়দা ঘরে রয়েছ, ফোনটা বেজে যাচ্ছে শুনতে পাচ্ছ না ?

বলতে বলতে ছুটে এসে কানে তুলে নিল রিসিভারটা। প্রভূত উৎসাহে চেঁচিয়ে উঠল :

—হ্যালো, হ্যালো!

—× × ×

—হ্যাঁ, আছে।

—এই ঘরেই আছে। পুজো করছে।

—× × ×

—গুরুদেব এসেছে যে। বাড়ীতে সবাই পুজো করছে।

—× × ×

—আমি তার বোন। ফুল।

—× × ×

—না ছাড়বেন না। বড়দা উঠে আসছে। কথা বলুন!

—হ্যালো!

—বৃ-বাবু?

—হ্যাঁ!

—ক্ষমা করবেন আপনার পুজার ব্যাঘাত ঘটালাম।...আমি শ্রীবু, ন্যাশানাল ফিল্ম্ কোম্পানীর একজন পরিচালক।

—ও, নমস্কার! 'শকুন্তলার জন্ম' কবে থেকে সুরু করছেন?

—বোধ হয় সপ্তাহ দুই পরে।

—আচ্ছা, চিত্রনাট্যখানির নাম 'শকুন্তলার জন্ম' দিলেন কেন? শুধু 'শকুন্তলা' দিলেই তো পারতেন। ওতে তো, দেখলাম, শকুন্তলা চরিত্রটিকেই প্রাধান্য দে'য়া হয়েছে বেশি।

—আপনি যা বলছেন তা ঠিক। তবে কি জানেন, তিনমাস ধরে বিজ্ঞাপন দেয়া চলছে ওই নামে, এখন যদি হঠাৎ নাম বদলানো হয়, ব্যবসার হয়তো খানিকটা ক্ষতি হয়।

—আমার, মানে 'বিশ্বামিত্রে'র ভূমিকার জন্যে ক-টা দৃশ্য আছে বলেছিলেন?

—মোট পাঁচটা বোধ হয়। তবে আপনার অভিনয়ের ওপরেই দৃশ্যগুলির দৈর্ঘ্য নির্ভর করছে। ডায়ালগ বা ঘটনা তো এ-চরিত্রে বেশী রাখিনি, মনস্তাত্ত্বিক ভাবাভিব্যক্তির জন্যে-ই এ-চরিত্র মূল্যবান হবে। সাধে কি আপনার দ্বারস্থ হয়েছি মিঃ বৃ!

একটু থেমে:

—এগ্রিমেন্ট-এর জন্যে কবে যাবো আপনার কাছে বলুন। কখন গেলে আপনার সুবিধা হয়...

—দেখুন বাড়ীর একটা উৎসবের ব্যাপারে বড় ব্যস্ত। এলে হয়তো খানিকক্ষণ বসে কথা কইতে পারবো না!

—তাতে কি হয়েছে!

—কিছু যদি মনে না করেন তবে যে কোনদিন আসবেন।

—সকালের দিকেই তো ?

—হ্যাঁ আটটার পর হলেই ভালো হয়।

—ধন্যবাদ !

—ধন্যবাদ !...

—এর মধ্যে ছেড়ে দিলে ?

ক্ষুণ্ণ হয়ে বলল ফুল। বেচারার ইচ্ছা অনেকক্ষণ ধরে কথা বলি। হাসলাম। তারপর গম্ভীর হয়েঃ

—যা এখান থেকে !

—ক্রিং ক্রিং ক্রিং

—ওই আবার !

বলে' লাফিয়ে উঠল ফুল।

—নে, যত পারিস্ কথা বল্। বলবি দাদা ব্যস্ত। কথা কইতে পারবে না।

—হ্যালো !

—× × ×

—সু-দাদা ? আমি ফুল।

—× × ×

—বড়দা বড্ড ব্যস্ত। পুজোটুজো করছে !

—× × ×

—জানেন না বুঝি ? গুরুদেব এসেছেন।...কাল খুব খাওয়াদাওয়া হ'ল। এলেন না কেন ?

—× × ×

—আপনাকে নেমন্তন্ন করবো ? দাদাকে কেউ নেমন্তন্ন করে !

—× × ×

হঠাৎ ফুল খিল খিল করে' হেসে উঠল :

—বেশ, নেমন্তন্ন করলুম। আসুন।

—× × ×

—বড়দা' না বললে আসবেন না !...আচ্ছা বলছি !

ফুল আমার দিকে চাইল। আমি উঠে গিয়ে ফুলের হাত থেকে রিসিভারটা নিয়ে যথাস্থানে রেখে দিলাম।

—কেটে দিলে ?

বললে ফুল।

—হ্যাঁ, তুই যা এখান থেকে !

ফুল চলে গেল। গীতাপাঠে আবার মনোনিবেশ করতে যাচ্ছি—এল কমলা। হাতে চা-খাবারের ট্রে। বলল লজ্জিত সংকোচে :

—মার কাছে খুব একচোট বকুনি খেলুম বড়দা, তা' তুমিও যেন বকো না।

—কেন রে ?

—আমার ওপর আজ ভার ছিল তোমার সকালবেলাকার চা-খাবার করে' দে'য়ার।...বড্ড দেরী হল।

—এই ব্যাপার ? এ-সব আমার মনেই ছিল না, তা বকবো কি তোকে ?

—তোমার কী-ই বা ছাই মনে থাকে !

বলে' পরম আদরে চা ও খাবার আমার সামনে এনে রাখল। তারপর :

—কী যে তোমার খেয়াল, মেজে শোয়া, মেজে বসা, মেজে খাওয়া... একটা ছোট টেবিল-ও আনো নি যে খাবারটা দেবো সাজিয়ে !

—রাখ ! বেশি যত্ন আদর দেখাতে নেই সন্ন্যাসীকে—

—সন্ন্যাসীকে ?

বলে' বড় বড় চোখদুটিতে কৌতুকের আলো জ্বালিয়ে বড় মিষ্টিভাবে কমলা আমার দিকে তাকাল। তারপর পাতলা ঠোঁট দুটিকে বেঁকিয়ে ফুলিয়ে সুমধুর তাচ্ছিল্যের অভিনয় করল মনোজ্ঞ ভঙ্গীতে, বলল :

—ইস্ !...দু'পাতা গীতা পড়েই সন্ন্যাসী !

কিন্তু না, একটা বালিকার অবহেলায় আমি দমে যাবো না, বললাম চেঁচিয়ে। চা-পানের পর আবার বসলাম সন্ন্যাসীর মত পদ্মাসনে। উদাত্ত কণ্ঠে সুরু করলাম পাঠ। কমলা শুনল বসে। বলল : .

—সত্যি বড়দা, বড় সুন্দর তুমি পড়তে পারো!

এমন সময়—

মা এলেন ঘরে, এমন হন্তদন্ত হয়ে এলেন যেন সময় চুরি করে মিনিট খানেকের জন্যে এ-ঘরে একবার না এলেই নয়। বললেন:

—খেয়েছিস্ খোকা?

—হ্যাঁ মা!

—বড়দা কী সুন্দর গীতা পড়ে, একটু ব'সো না মা, শুনবে।

—পরে শুনবো মা, এখন আমার মরণের সময় নেই।

তারপর আমার দিকে চেয়ে:

—আজ-ও খেতে একটু বেলা হবে খোকা, ক্ষিদে পায় কমলাকে বলিস্, ও কিছু এনে দেবে।

বলতে বলতে বেরিয়ে গেলেন মা। বললাম কমলাকে:

—আজ-ও রান্নাঘরে রাজসূয় যজ্ঞ হচ্ছে বল্?

—এ-কদিন-ই তো দু'বেলা করে 'মহাভোগ' হবে। ভোগ তো যাকে তাকে করতে নেই। মা-ই করছে।

—এই এতলোকের আয়োজন মা করছে?

—কাল যা সব দেখলে সব-ই তো মা-র করা। রাঁধুনী মা-র তো দীক্ষা হয় নি যে ভোগ রাঁধবে!...শুনছি এবার দীক্ষা নেবে।

—গুরুদেব তো কিছুই গ্রহণ করেন না, তবু দ্যাখ্ তার জন্যে কী সব কাণ্ড!—বললাম আত্মগতভাবে। কমলা শুনতে পেল। উত্তর করল:

—গ্রহণ করেন না বলছ কেন? দেবতার সামনে নৈবেদ্য সাজিয়ে যে পুজা করো, ভাবো কি দেবতা তা' গ্রহণ করেন না?...তবে প্রসাদ হয় কি করে?

—ঠিক!

বলে' কমলার পিঠে একটা চাপড় মারলাম পরমস্নেহে। বললাম:

—এমন অপূর্ব যুক্তি নিশ্চয়ই মা-র কাছ থেকে পেয়েছিস?

—এটা যখন আমি বিশ্বাস করি, তখন এটা আর মা-রই শুধু নয়, আমারো।

—বিলকুল ঠিক! তুই আই-এ নিশ্চয়ই পাস করবি!

—ঠাট্টা করছ বড়দা! আমি কিন্তু সত্যসত্যই পাস করতে পারবো না।...কিচ্ছু হয় নি!

—তবু হবি। এগিয়ে আয়।...এই তোর মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করে দিচ্ছি: পাস হবি!

—ও তো গুরুদেব-ও বলেছেন।

—তবে? এই বুঝি ভক্তি?

—তা'বলে ভয় করে না বুঝি?

—কেন করবে? ভক্তি হলে ভয় থাকে না! আসলে মেয়েদের শরীরে ভক্তি 'নাই'। বিশ্বাস 'নাই'।

কমলা খিল খিল করে' হেসে উঠল।

—না, নাই!

বলল আমার বাচনিক ভঙ্গীর যথাযথ নকল করে'। গম্ভীর স্বরে বললাম:

—থাকলে কি তুই গুরুদেবকে ছেড়ে এখানে এসে সময় কাটাস্?

—বাব্বা, ঘর থেকে দূর করে' দেয়ার কী সভ্য কায়দা!

বলল কমলা হেসে। উঠে দাঁড়াল চলে যাওয়ার জন্যে।

—এই শোন্!

বললাম ডেকে:

—গুরুদেবের ঘর থেকে ভক্তরা সব চলে গেলে আমাকে খবর দিবি।... বুঝলি!

—আচ্ছা!

বলে চলে গেল কমলা, দরজাটা বাইরে থেকে ভেজিয়ে দিয়ে। গীতাপাঠে আবার মনোনিবেশ করলাম:

—অর্জুন বললেন: বিশ্বরূপদর্শনে উদ্বেজিত হলাম, রোমাঞ্চিত হলাম, শেষে জ্ঞানও হারালাম ভয়ার্ত হয়ে। সৌম্য মানুষ মূর্তিতে এই যে এখন

প্রকাশিত হলে, এই তো আমার কাম্য, এবার আমি প্রসন্নচিত্ত, আমি প্রকৃতিস্থ।

দৃষ্টেদং মানুষং রূপং তব সৌম্যং জনার্দন।
ইদানীমস্মি সংবৃত্তঃ সচেতাঃ প্রকৃতিং গতঃ॥

—সত্যি, রূপে যদি না পাই তবে রূপময় এই জগতে জন্মালাম কেন? বিশ্বরূপ তো আমার জন্যে নয়, ও তাত্ত্বিকদের জন্যে। বিশ্বরূপ একরকম অরূপ ছাড়া আর কী? অরূপে অবশ্য যেতে চাই—কিন্তু রূপ যে পেতে চাই ভগবন, আমি-ও বললাম।

আমার ধর্মে মতি দেখে প্রথম প্রথম মা খুবই খুসি হলেন—কিন্তু দুটো একটা দিন পরেই মনে হল ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়িটা মা-র মোটেই ভালো লাগছে না। প্রত্যহ দুপুরে গুরুদেবের কাছে বসে আমি পাঠশিক্ষা নিই, স্বামীজির কাছে তত্ত্ব বিষয়ে আলাপ আলোচনা করি, সচ্চিদানন্দের সঙ্গে সন্ন্যাস ও সমাজজীবন সম্বন্ধে তর্কবিতর্ক করি; বিশেষ করে' সন্ন্যাসধর্মে আগ্রহ দেখাই—ক্রমশঃ মনে হ'ল মা-র এ-সব তেমন পছন্দ হ'ল না।

গেল দিন। অতিবাহিত হল সপ্তাহ। কমলার কাছে শুনলাম আগামী অমাবস্যা তিথিতে ভক্তদের কয়েকজনকে দীক্ষা দিয়ে গুরুদেব এখান থেকে বিহার সফরে অগ্রসর হবেন।

গুরুর উপস্থিতিতে আমার আধ্যাত্মিক উন্নতি কিছু হল কি না জানি না, কিন্তু শিল্পজীবনের অনেক লাভ হল! বেদপাঠের প্রাচীন রীতিটি আমি বেশ ভালোভাবেই আয়ত্ত করে ফেললাম। গীতার বহু অংশ ও দেবদেবীর অনেক স্তব আমার কণ্ঠস্থ হয়ে গেল। প্রধান 'আসন'-গুলি জানা হ'ল, এখন অভ্যাস করলেই হয়। গুরুদেবের মত আমি প্রত্যহ রাত সাড়ে-তিনটেয় শয্যাত্যাগ করা অভ্যাস করলাম। শয্যাত্যাগ করার কালে স্তবপাঠ করতে লাগলাম নিয়মিত! বারান্দায় পায়চারি করতে করতে আবৃত্তি করলাম স্তবমন্ত্র। স্নান করতে করতে আবৃত্তি করলাম বেদ। প্রাতরাশ সমাপন করে' সিদ্ধাসনে আবৃত্তি করলাম গীতাবাণী। কারণে অকারণে গুরুদেবের কাছে ব্যাখ্যা চাইলাম এ-মন্ত্রের, সে-তত্ত্বের।

মা তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে এ-কয়দিন আমাকে লক্ষ্য করলেন! লক্ষ্য করলেন—এই কয়দিনের মধ্যে একবারো আমি বাড়ীর বার হই নি—এমন কি নিচের তলাতেও নামি নি।

তবু এ-সমস্ত সহ্য হয়। কিন্তু এটা কি সহ্য হয় দিনরাত 'হরি ওঁ' বলে চিৎকার, সহসা 'নমো নারায়ণায়' বলে' প্রণিপাত?...কিন্তু কেন সহ্য

হয় না? মা যা নিজে করেন, মা-র গুরুদেব এবং গুরুভাইরা যা করেন, তা-ই তো নৈষ্ঠিকভাবে আমি করতে চেষ্টা করছি—এতে তুষ্ট না হয়ে রুষ্ট কেন হন মা?

না, একটু বাড়াবাড়ি করছ যে, বলল মন। সত্যি কী যে খেয়াল হ'ল, স্নানের পর আজ শুভ্র বস্ত্র না পরে' স্বামী আত্মানন্দের মত আমি গৈরিক বসন কোমরে ধারণ করলাম। আরশীর সামনে দাঁড়িয়ে নিজের যোগিকল্প অপূর্ব চেহারাখানি দেখে সত্যসত্যই মুগ্ধ হয়ে গেলাম। বুদ্ধ, শঙ্কর, প্রভৃতি প্রাতঃস্মরণীয় নামগুলি মনে পড়ল একে একে। এদের জীবন-কথা নিয়ে আধুনিক রীতিতে নাটক লেখা যায় না?...তাঁদের জীবন-বাণী কি ঠিকমত ফুটিয়ে তোলা যায় না ছবিতে?

দর্পণের দিকে চাইতে চাইতে সহসা, এ কী চিত্তবিভ্রম, মনে হ'ল আমি-ই বুঝি সর্বার্থসিদ্ধ শ্রীগৌতম, অতুল ঐশ্বর্যের ললিত বিলাসে আমাকে বন্দী করার চেষ্টা চলেছে, কিন্তু সংসারবৈরাগ্যেই আমার অধিকার। বৃক্ষতলে আমার জন্ম, বৃক্ষতলে আমার ধর্ম, বৃক্ষতলে আমার সমাধি। অতএব—

—গৃহাশ্রমে আমার রুচি নেই ঋষিবর, পিতাকে বলবেন আমি বিবাহ করবো না।

নাটক সুরু হ'ল মনের মঞ্চে:

রাজা শুদ্ধোদন প্রেরিত ঋষি বললেন:

—চিন্তা করে' দ্যাখো বৎস, জীবজীবনে বিবাহ একটি কর্তব্য।

—সাংসারিক কর্তব্যে আমার রুচি নেই।

— × × ×

—আচ্ছা ঋষিবর সপ্তাহকাল আমাকে সময় দিন, বিষয়টি চিন্তা করে দেখি।

ছয়দিন কাটল গভীর চিন্তায়।—অরণ্যাশ্রমে ধর্ম-পালন করবো, না সংসারাশ্রমে কর্মসাধন করবো?...অরণ্য জীবন সহজ, পাপতাপ-প্রলোভন

নেই সেখানে। সংসারজীবনে নিত্য প্রলোভন, নিত্য পতনস্খলন! এ-সব কাটিয়ে ধর্মপালন বড় কঠিন। কিন্তু কঠিনকে আয়ত্ত করাই তো মানুষের ধর্ম। বিবাহ করবো?

—করবো!

—শুনে অতীব আনন্দিত হলাম বৎস। যাই, মহারাজকে সংবাদটা দিই।

—কিন্তু জাতিভেদ আমি মানি না মন্ত্রী। পিতাকে বলবেন, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র—যে কোনো জাতীয়া কন্যাই হ'ক না কেন, রূপবতী ও গুণবতী হলে-ই সে আমার বরেণ্যা।

অপরূপ লাবণ্যবতী কুমারীকন্যাদের দেশবিদেশ থেকে আনয়ন করলেন রাজা শুদ্ধোদন। একটি মহিলাসভায় তাঁরা আমন্ত্রিতা হলেন। স্থির হ'ল—কুমার সর্বার্থসিদ্ধ নিজহস্তে তাঁদের মণিরত্নাদিপূর্ণ অশোকভাণ্ড বিতরণ করবেন।...সেই সভায় যাঁকে দেখে, কথা কয়ে তাঁর মনে ধরবে, তাঁকেই বিবাহ করবেন তিনি।

কুমার অশোকভাণ্ড দান করতে সুরু করলেন। কুমারীগণ কৃতার্থ হলেন কুমারের সঙ্গে হাস্যকৌতুক ও রসালাপ করে। কুমারের প্রীতিময় প্রেমিক ব্যবহারে সকলেই আশান্বিতা হলেন, গোপনে, সুখদিবস ও শুভদিনের স্বপ্ন দেখতে দেখতে, প্রত্যাবর্তন করলেন গৃহে।

সকলের শেষে, সভা ভাঙার একটু আগে, বিনীতভাবে এলেন দণ্ডপাণির কন্যা, শ্রীমতী গোপা।

আর তো অশোকভাণ্ড নেই! হাতের কাছে নেই কোনো স্বর্ণখণ্ড, বৈদুর্যমণি কি অল্পমূল্যের-ও কোনো মণিরত্ন!

—কী তোমাকে দেব সুন্দরি, কিছুই যে নেই!

—তুমি-ও কি নেই?

চমকে উঠলেন রাজকুমার। গোপা বললেন:

—কুমার, তোমার হাতের অঙ্গুরীয়টি আমাকে দাও।

সিদ্ধার্থ গোপার পদ্মকোমল পাণিদ্বয় স্বীয় করতলে পীড়ন করলেন। পরম যত্নাদরে আপন অঙ্গুরীয়টি পরিয়ে দিলেন গোপার চম্পকনিন্দিত মোহন অনামিকায়।

সুন্দর চিত্র ; দর্পণের সামনে দাঁড়িয়ে চক্ষু মুদ্রিত করে' চুরি করেই যেন দেখলাম এ-চিত্র।...চক্ষু মুদ্রিত করে' নিজেকে দেখা অবশ্য সম্ভব নয়, কিন্তু কী দেখাতে চাই—তা তো দেখতে পাই সহজেই!...

স্বপ্নের আলোকমালায় দীপ্যমান মর্মমঞ্চে সমাসীনা, দেখলাম সুন্দরী গোপা। পরম প্রেমাদরে তার একখানি হাত হাতের মধ্যে টেনে নিলাম—আমি রাজপুত্র সিদ্ধার্থ। পরিয়ে দিলাম হীরকাঙ্গুরীয় তার আঙুলে। তারপর চমকে উঠে, এ কি—

—তুমি, গো ?

স্বপ্ন ভেঙে গেল যেন। চমকে চোখ মেললাম। নারায়ণের পূজারতি হচ্ছে বাড়ীতে, শাঁখ বাজল।

লজ্জা হল। কি বিশ্রী এই ক্লেদাকীর্ণ কুৎসিত মন। ধর্মধ্যানের মধ্যেও রূপমোহের বামন বিলাস!...ধিক আমার গৈরিক তারুণ্যে!

আচার্য শংকরের 'মোহমুদ্গর' আবৃত্তি করলাম। দর্পণের দিকে চেয়ে চেয়ে ঘুরে ফিরে—মুখের ছবিতে বেশ সাত্ত্বিক ভাব আনার চেষ্টা করে আবৃত্তি করলাম অনেকক্ষণ :

—বালস্তাবৎ ক্রীড়াসক্ত
স্তরুণস্তাবৎ তরুণীরক্তঃ
বৃদ্ধস্তাবচ্চিন্তা মগ্নঃ
পরমে ব্রহ্মণি কোঽপি ন লগ্নঃ॥

—একেবারে খাঁটি কথা লিখে গেছেন শংকর। বালকেরা থাকে খেলায় মত্ত, তরুণীতে মত্ত তরুণ দল, বিষয়চিন্তায় মগ্ন যত বৃদ্ধ, কিন্তু পরমব্রহ্মে মন দেয় না কেউ।...ঠিক, বিলকুল ঠিক!

তরুণগুরু শ্রীমৎ শংকরাচার্য বেরোলেন তাই ধর্মপ্রচারে। মুণ্ডিত মস্তক, দক্ষিণহস্তে দণ্ড, বামহস্তে কমণ্ডলু, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, অঙ্গে গৈরিক বসন... চমৎকার বেশ !...সুন্দর চিত্র !...

মানাবে না আমাকে? শিল্পের প্রয়োজনে কুঞ্চিত এই মনোহর কেশগুচ্ছের মায়া পারবো না ত্যাগ করতে?

দক্ষিণে কন্যাকুমারী থেকে উত্তরে বদরিকাশ্রম পর্যন্ত মঠ স্থাপন করে' শংকর এলেন হস্তিনাপুরে, বিজিলবিন্দু-প্রদেশে। বিজিলবিন্দুর তালবনে সাক্ষাৎ হল মহাপণ্ডিত মণ্ডনমিশ্রের সঙ্গে।

সুরু হ'ল জ্ঞানের বিচার।

স্থির হল যিনি পরাজিত হবেন তিনি জেতার ধর্মমত ও আদর্শ অবলম্বন করবেন।

জ্ঞানের বিচারে মধ্যস্থা হলেন মণ্ডনমিশ্রের পত্নী বিদুষী সারসবাণী।

পরাজিত হলেন মণ্ডন মিশ্র। সন্ন্যাস গ্রহণ করতে হল তাঁকে।

তখন সারসবাণী:

—স্বামী যখন সন্ন্যাসী হলেন তখন সংসারে থেকে কি লাভ? ব্রহ্মলোকে যাবো আমি!

—তোমাকে-ও হতে হবে সন্ন্যাসিনী!

বললেন শংকর।

—তবে এসো জ্ঞানবিচারে পরাজিত করো আমাকে!

—তথাস্তু।

সুরু হ'ল বিচার। চতুরা সারসবাণী আলাপ করতে সুরু করলেন কামশাস্ত্রের। প্রশ্ন করলেন সে-শাস্ত্রের তত্ত্ব।

সন্ন্যাসী শংকর নীরব।

—কই, উত্তর দাও সর্বজ্ঞ সন্ন্যাসী!

তখন শংকর কৃতাঞ্জলি ঃ

—মা, এ-শাস্ত্রে অজ্ঞ আমি। ছয়মাস সময় দাও শিক্ষা করে' আসি সে-শাস্ত্র।

মায়াবাদী শংকরও তবে চললেন কামবিদ্যার আহরণে! ধরতে হ'ল রাজবেশ। যেতে হ'ল বিলাসবতী রূপসী রাণীর রাজহর্ম্যে।

রাণী বললেন ঃ

—ফিরে এসেছ প্রিয়তম!...এত কি কাঁদাতে হয়?

— × × ×

—নীরব হয়ে আছ কেন?

—কী বলবো?

—কী বলবে?

রাজার কণ্ঠলগ্না হয়ে রাণী প্রেমাদরে বললেন ঃ

—তামাসা করছ?...কাব্যকোবিদ বাণীবিশারদ তুমি, তোমাকে শেখাবো—কী কথা বলবে?

— × × ×

—কী বলে' থাকো কানে কানে?

—পরম ব্রহ্ম!

—এ কী নূতন কথা!...এই কী প্রেম?

—প্রেম, প্রেম, হ্যাঁ প্রেম!

শঙ্কর হয়ে আমি রাণীকে শোনালাম ঃ

—প্রেম, প্রেম।

আরশীর দিকে তাকালাম। মুখে জাগালাম প্রেমভাবের আনন্দপূর্ণিমা। উচ্চারণ করলাম বেশ স্পষ্টস্বরে-ই ঃ

—প্রেম।...প্রেম হলে কাম-ও হয়, ব্রহ্ম-ও হয়। প্রেমকে এদিকে আনো তো কাম, সেদিকে টানো তো ব্রহ্ম।

গুণগুণিয়ে গান ধরলাম আপনমনে ঃ

—চিত্ত আমার যখন যেথায় থাকে
সাড়া যেন দেয় সে তোমার ডাকে
যত বাধা যায় টুটে যায়, যেন
প্রভু, তোমার টানে ॥

ভাবাবেশে উৎফুল্ল হ'ল যৌবন। মুখে মুখে রচনা করলাম কথা, উচ্চারণ করলাম নাটকীয় ভঙ্গীতে:

—অন্তরের সুন্দরকে বাইরে করবো প্রকাশ, শক্তি দাও আমাকে হে সুন্দর! যা লোভ, যা সন্দেহ, যা সংশয়—ভস্মীভূত হ'ক সৌন্দর্যসাধনার অগ্নিদাহনে! শুদ্ধ হবো, শুদ্ধ করো আমাকে!......

—স্নান হয়ে গেছে খোকা?

বলে'মা এলেন, হাতে চা খাবার। তারপর আমাকে দেখে চমকে থমকে দাঁড়ালেন কিছুক্ষণ। স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন মুখের দিকে। তারপর:

—এ সব আবার কী খেয়াল তোর?

কৌতুক করলাম:

—সন্ন্যাসী হবো মা!

—× × ×

—ঠিক গুরুদেবের মত দেখিয়েছে কি না বলো!

মা আমার কথার জবাব দিলেন না। চা ও খাবারের প্লেটটা আমার সামনে রেখে ঘরের এদিকে-সেদিকে দুটো-একটা খুঁটিনাটি কাজের জন্যে যাওয়া-আসা করলেন। তারপর হঠাৎ আমার দিকে ফিরে:

—হ্যাঁ রে, সু আর আসে না কেন?

—সে আজকাল একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে মা!...দিনরাত মদ খাচ্ছে। বাজে লোকদের সঙ্গে মিশছে। মাতামাতি করছে।...

—তা হ'ক তবু সে-ই তো তোর পরমবন্ধু। বাড়ীতে এ কয়দিন গুরুদেবের কৃপায় ভালো মন্দ কত কী খাওয়া-দাওয়া হচ্ছে—তাকে তো একবার ডেকে আন্‌তে হয়।

—বলো তো ফোন করে দিই।

—ফোন করা কেন! নিজে যা!...দিনরাত ঘরে বসে বসে কী যে করিস!

—দেখতেই তো পাও!

—যা না, বাইরে একটু ঘুরে-ঘেরে আয়! সু-কে ডেকে নিয়ে আয়!

একটু থেমে আবার:

—তোমাদের ছবিটবি তোলার কাজ বুঝি এখন বন্ধ?

—বন্ধ থাকবে কেন!

—তবে যে বেরুস না একবারো?

—আবার যখন কাজ পড়বে বেরুব।···আসছে মাস থেকে দেখো, হয়তো মাথার টিকিটাও আমার দেখতে পাবে না।···তখন যেন মনে মনে যা তা বলো না, কিংবা ভাবতে বসো না!

—× × ×

—তুমি তা'হলে আমার ছবি-তোলার কাজ অপছন্দ করছ না!

—তা কেন করবো খোকা! ভুল বুঝেছিলুম, ভুল ভেঙ্গে গেছে! বাবার কাছে-ও শুনেছি—এ-কাজে তুই খুব নাম করেছিস্, টাকাকড়িও উপার্জন করছিস্, অপছন্দ করবো কেন?

—পরিচিত অপরিচিত অনেক মেয়ের সঙ্গে মিলতে হয়, মিশতে হয় এ-কাজে, তা জানো?

—তুই আমার পেটের ছেলে খোকা, তোকে আমি জানি, বলে' স্নেহভরে আমার গায়ে হাত বুলিয়ে দিলেন মা।

চা-টা একচুমুকেই শেষ করলাম।

ভারি কৌতুক লাগল মা-র কথা শুনে। দিনকতক আগে পর্যন্ত মার এমনতর বিশ্বাস তো ছিল না।

বেঁচে থাক আমার সংস্কৃত শ্লোক, গুরুভক্তি এবং গৈরিক বসন! 'জয় মা' বলে মনে মনে একবার নেচে নিলাম।

তারপর:

একটা কথা বলবো মা! শুনে হয়তো রাগ করবে।...গুরুদেব কবে আছেন কবে নেই, তাঁর কাছে আমি দীক্ষা নিতে চাই, আদেশ করো, নিই!

—বুড়োমি করিস না!

মা বললেন বিরক্ত হয়ে।

—এটা বুড়োমি হ'ল?...ধর্ম করবো কি মরার বয়সে?

—যে-বয়সের যা, সে-বয়সে সেটা করাই ধর্ম খোকা!

—এ-বয়সের ধর্ম কি তবে বলে দাও!

—জানি নে বাপু!

—সু যা করছে তা-ই কি ধর্ম?

সু কী করছে, কেন করছে সব জেনে শুনে তবে তার সম্বন্ধে মন্তব্য করা সঙ্গত। তবে অসংযম তো ধর্ম নয় খোকা। সংযমকে রক্ষা করে যা করবি—ফল তার ভালো ফলবে, আজ না হয় কাল। এবং তাই-ই ধর্ম বলে জানি।

—সংযম শিখতে হলে কি সন্ন্যাস চাই না?

—যে সংযমের কথা তোরা বলিস্, তা সন্ন্যাস না-নিয়েও হয়, গেরুয়া না-পরে-ও হয়।...সামাজিক সভ্য মানুষের সংযম, কতটুকু ত্যাগের প্রয়োজন হয় তাতে?

—কি বল্‌ছ মা! আমি যে প্রতি মুহূর্তে হেরে যাচ্ছি—

মা তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে আমার দিকে তাকালেন। মায়ের চোখের ওপর চোখ মেলে বেশিক্ষণ আমি থাকতে পারলাম না। চোখ নামালাম।

মা বললেন উদাসীন ভঙ্গীতে:

—সন্ন্যাসী হওয়ার সাধ হয়েছে, তাই ভাবনা হচ্ছে: বুঝি হেরে যাচ্ছ!...মানুষ তার আদর্শটাকে যত বড় করে, ততই দুঃখ পায়, বেদনা পায়, খোকা!

তারপর স্নেহভরে আমার চোখে, মুখে, গালে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে:

—আমি বুঝেছি খোকা, তুই হেরে যাচ্ছিস্ না! তুই বেড়ে যাচ্ছিস্!...শুধু মায়ের এই কথাটা মনে রাখিস্, খেয়ালের বশবর্তী হয়ে কোনো বিষয়েই বাড়াবাড়ি করিস্ না!

মায়ের আদর পেয়ে বুড়ো খোকার কী যেন হ'ল—আবেগ উঠল উথলে:

—তোমার তো আর একটা ছেলে আছে মা, আমাকে তোমার গুরুদেবের হাতে তুলে দাও!

স্তব্ধ হয়ে গেলেন মা। মিনিটখানেক একেবারে চুপচাপ। গৃহ নিস্তব্ধ।...হঠাৎ এক প্রকার ধমক দিয়েই মা বলে' উঠলেন :

—তুই ও-কাপড় ছাড়বি কি না?

—না ছাড়ে, থাক না সন্ন্যাসী সেজে!

বলে' দাদু প্রবেশ করলেন ঘরে :

—সন্ন্যাসী যারা নয় তারাই সন্ন্যাসী সাজে, এটা কেন বুঝিস্ না বেটী!

তা চমৎকার তোকে মানিয়েছে দাদু! আরশীতে দেখেছিস্ চেহারাখানা? একেবারে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যঠাকুর। বেরুবি নাকি কীর্তন গেয়ে?

হাসলাম।

—তা চল, বেরুনো যাক সবাই মিলে। ক্যামেরা সঙ্গে নিতে হবে তো? এমনি কি 'ভাব' ফুটবে?

মা হাঁ করে দাদুর দিকে চেয়ে রইলেন। দাদু বললেন মাকে :

—তোকে বলেছে বুঝি, সন্ন্যাসী হবো?

—× × ×

—আমি দীক্ষা নেব!

—অতি উত্তম প্রস্তাব! নে না! সে তো ভালো কথাই!

—তুমিও ওই কথা বলছ বাবা?

মা বললেন একটু যেন বিরক্ত হয়ে :

—সাধে কি বলেছিলাম গুরুদেব যে-কয়দিন এখানে থাকবেন, পাগলাটাকে বাইরে কোথাও রেখো সরিয়ে।

—সন্ন্যাসী হয়ে যাবে—এই ভয়েই বুঝি বলেছিলি বেটি?

—× × ×

—আচ্ছা মা, আমি বুঝতে পারি না তোমাদের মনোভাব। গুরুদেবকে এত ভক্তি করো, দেবতাজ্ঞানে পুজো করো, কিন্তু ঘরের কেউ তাঁকে

সত্যসত্যই অনুসরণ করুক, এটা সমর্থন করতে পারো না।...এ কেমন ব্যাপার ?

—অতীব সহজ ব্যাপার !

দাদু বললেন কৌতুক করে :

—আমরা দুই গুরুর ভজনা করবো না—এই আমাদের বাসনা। অতএব তোমার পরমপুজনীয়া মাতৃদেবীর আদেশ এই : অনতিবিলম্বে এই ভয়াবহ গৈরিক বসন পরিত্যাগ করতঃ কোঁচানো কাপড় পরিধান করো, গাত্রে চন্দনলেপন পরিত্যজ্য জ্ঞানে প্যারিস-আনীত এসেন্স মাখো, স্তবমন্ত্রাদি সত্বর বিস্মৃত হয়ে থিয়েটার বা সিনেমার নাট্যবাণী আবৃত্তি করো !

মা হেসে ফেললেন :

—তুমি, বাবা, ওর মাথাটা খেলে !

—রাঁধুনী-মা ডাকছে মা-জী !

ডাক শোনা গেল যোগীন্দ্রের।

—যাই বাবা !

বলে ঘর থেকে মা নিষ্ক্রান্ত হলেন। আমার দিকে পলকহীন দৃষ্টিতে দাদু কিছুক্ষণ চেয়ে রইলেন। তারপর দাড়িতে অভ্যাসমত হাত বুলোতে বুলোতে হঠাৎ !

—খুব চতুর !

বলতে বলতে তিনি কাছে এলেন এগিয়ে। কানের কাছে মুখ এনে :

—গেরুয়াটা তা'বলে' চট্ করে ছাড়িস্ নি দাদু, বেটীকে আর একটু বেশ করে' জব্দ করতে হবে দুপুরবেলা।

বলে' ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন হাসতে হাসতে।

অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ হয়ে বসে রইলাম বটে, কিন্তু পাঠে আর মন বসল না। বেরিয়ে এলাম ঘর থেকে।

এ-সময়ে গুরুদেবের ঘরে যাওয়া বৃথা। গেলে ভিড়ের মধ্যে নীরবে শুধু বসেই থাকতে হবে।

গুরুদেবের ঘরে, আজ দেখলাম, জনকতক বিদেশী বিদেশিনীও এসেছেন। গুরুদেব ভক্তদের সঙ্গে মাঝে মাঝে দুটি একটি কথা বলেন—তারপর প্রায় পাঁচসাত মিনিট ধরে নীরব হয়ে বসে থাকেন সমাধিস্থের মত।

ভক্তদল সম্মোহিতের দৃষ্টিতে চেয়ে আছে তাঁর দিকে। মুখে কথা নেই কারোর।...এত লোক বসে আছে ঘরে, তবু নির্জন মন্দিরের মত নিস্তব্ধ, নিস্পন্দ এ গৃহ।

পাশের ঘরে গুরুদেবের শিষ্যদ্বয়ের কাছে এলাম। সেখানে-ও দু-পাঁচ-জন অপরিচিতের সমাগম হয়েছে।

আমাকে দেখে ডাঃ সচ্চিদানন্দ ইশারা করে' কাছে ডাকলেন। কাছে যেতে গৈরিকবসনের দিকে আঙুল দেখিয়ে আস্তে আস্তে বললেন:

—আদেশ পেয়েছ?

—আদেশ?

—বুঝেছি!...ভালো করো নি!

শিল্পের জন্যেই আমার সন্ন্যাসবিলাস—এটা মর্মজ্ঞ সচ্চিদানন্দ-ও বুঝতে চাইলেন না। অত্যন্ত গম্ভীরস্বরেই বললেন:

—গৈরিক বসন পরিধান করে সন্ন্যাসনামধারী ভণ্ডরা মানুষদের প্রতারণা করে, তুমি-ও আত্মপ্রতারণা করছ। গৈরিকের আধ্যাত্মিক নাম হচ্ছে পবিত্রতার প্রতিজ্ঞা—পাছে প্রতিজ্ঞাচ্যুত হয়, তাই সাধুরা অহরহ এটি স্পর্শ করে' থাকে।

—× × ×

—শক্তিমানকেই গুরু এটি গ্রহণ করতে আদেশ দেন। এটা নিয়ে কি খেলা করতে আছে বৎস!

—করুক না খেলা!

স্নেহভরে বললেন স্বামী আত্মানন্দ:

—খেলতে খেলতেই তো খেলা ছেড়ে ওঠে মানুষ!

২৫।

—সবাই কি উঠতে পারে?

—সবাই পারে ভাই, কেউ আগে কেউ পরে। পুতুলখেলা খেলতে খেলতে সব মেয়েই মাতৃস্নেহের সাধনা করে অজ্ঞাতে। শিবপুজায় তন্ময় হতে হতেই জীব শিব হয়ে যায় সমাধির আনন্দে!

—তবে আমারো কিছু আশা আছে বলুন!

—পৃথিবীতে এমন কে আছে বৎস—যার আশা নেই? কে আছে যে ব্রহ্মময়ীর সন্তান নয়?......

—তুমি-ও আছ এই ঘরে?

বলে, আজ পাঁচদিন পরে সু এল অপ্রত্যাশিত ঝড়ের মত।

আত্মানন্দ তার মুখের দিকে এক পলকের জন্যে বুঝি চেয়ে দেখলেন; তারপর চোখ বুজিয়ে শুয়ে রইলেন হাতের ওপর মাথা রেখে। সচ্চিদানন্দ সু-কে দেখে হঠাৎ কী যেন বলতে যাচ্ছিলেন, চকিতে আত্মদমন করে' উপস্থিত আগন্তুকদের দিকে দৃষ্টি ফেরালেন।

এ-কয়দিনে সু কী রকম শুকনো বিশ্রী হয়ে গেছে। যেন কতদিন খায় নি, স্নান করে নি। কিংবা যেন রোগে ভুগেছে অনেকদিন, আজ-ই বুঝি পথ্য করবে বলে' উঠে এল বিছানা ছেড়ে।

জিজ্ঞাসা করলাম:

—কী হয়েছিল? অসুখবিসুখ নাকি?

—না!

সু-কে নিয়ে ঘরের একটা কোনে গিয়ে বসলাম। তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে সু তখন আমার গৈরিকবসনখানি দেখছে। তারপর:

—এ-সব কী? সন্ন্যাসী হবে নাকি শেষ পর্যন্ত?

—শক্তি থাকলে তা-ই হতাম!

—সন্ন্যাসী হতে হলে শক্তির দরকার হয়?

ডাঃ সচ্চিদানন্দ আমাদের দিকে একবার দৃষ্টিনিক্ষেপ করলেন।

—না, দরকার হয় না।

আমি বললাম।

কিছুক্ষণ চুপচাপ। সন্ন্যাসীদের দিকে একটু উপেক্ষার দৃষ্টিতে চেয়ে বিরক্তির সুরেই সু বলল:

—এখানেই আড্ডা গেড়েছে নাকি?

—× × ×

—সর্বত্রই তো লোকে লোকারণ্য।...আচ্ছা হুজুগ যা হ'ক!...টাকার আদ্যশ্রাদ্ধ হচ্ছে তো?

—× × ×

—একটা শিক্ষিত ফ্যামিলিতে এমন কি করে হয় বুঝতে পারি না।...তোমার ঘরটায় গিয়ে দেখি নরক গুলজার...তা থাকো কোথায়? বসো কোথায়?

—মা-র ঘরে।

—একটা গোপন কথা আলোচনা করার আছে।...উঠবে?

ওঠা-ই সমীচীন মনে করলাম। ডাঃ সচ্চিদানন্দ ও স্বামিজীকে নমস্কার জানিয়ে বাইরে যাবার অনুমতি ভিক্ষা করলাম করজোড়ে।

ঘরের বাইরে এসে চোখদুটো বড় বড় করে' সু বলল:

—ও ব্বাবা!

আমার গৈরিকবসনখানিকে উপলক্ষ করে সন্ন্যাসীদের একচোট গালাগালি দিয়ে নিল সু, তারপর গম্ভীর গলায় বিবৃত করল তার 'গোপন কথা'। কথাটা এই: নি-কে সে বিবাহ করতে চায় এবং তার ধারণা নি-কে লাভ করে-ই সে সুখী হবে।

হাসি সংবরণ করতে পারলাম না।

তার প্রতি শো-র ভালবাসা যে কত গভীর--তা তার অজানা নয়, আর এর-ই জোরে—শো-র মনে ঈর্ষা জাগিয়ে তাকে জব্দ করার একটা বালকোচিত ফন্দী-ই সে আজ এঁটে এসেছে ভেবে হেসে ফেললাম:

—বুঝতে পারছি শো-র সঙ্গে এখনো কোনো মিটমাট হয়নি। তা তোমার 'গোপন কথাটি' শো-কে জানিয়ে আসতে হবে—এই তো তোমার উদ্দেশ্য ?

—জানানো হয়েছে!

—তবে তো কাজ সুরু-ই হয়ে গেছে!

হেসে বললাম:

—আমার জন্যে তো কোনো কাজ-ই বাকি রাখো নি!...

কিছুক্ষণ থেমে:

—কি যে ছেলেমানুষী করছ দিন দিন!...ভালো কথাই তো বলছে শো: মদটা ছেড়ে দাও।...কেন ও-বিষ ছোঁও! বেশ তো ছিলে—আবার কি যে হ'ল!...তা এর মধ্যে গেছলে শো-র কাছে ?

—তার ছায়া মাড়াতে চাই না আর!

একরকম হুংকার দিয়ে উঠল সু।...তারপর একটু লজ্জিত হয়েই যেন:

—আমি বোধ হয় পাগল হয়ে যাবো বু!

—হয়ে যাবো কি, হয়ে গেছ! তা নইলে শো-র মত মহিলার ওপর তুমি রাগ করো, দুর্ব্যবহার করো?...এখনো জানলে না—সে তোমাকে কী গভীরভাবে ভালবাসে!

—ভালবাসে! এমনি ভালবাসে?...কত কী করেছিলাম তার জন্যে জানো?

—ভালবেসেছ তাই করেছিলে! ভালবাসা পেয়েছ, তাই করেছিলে! এতে দম্ভের কিছু নেই সু!

সমাহিতের মত কথাগুলি শুনল সু। বলে গেলাম:

—মদ খেয়ে বৈঠকখানায় 'ভদ্রদের' নিয়ে যখন মাতলামি করছিলে— আর কেউ হলে পাগলের মত ছুটে আসতো ভাবো!

নির্বোধের মত আমার মুখের দিকে তাকাল সু।

—এমনি বেহুঁস হয়ে তুমি পড়েছিলে যে জানতে-ও পারোনি সে এসেছিল।

—× × ×

—তোমার বাড়ীতে সপ্তাহকাল আগে একটা সন্ধ্যায় হঠাৎ গিয়েছিলাম, মনে আছে?

—কেন থাকবে না?

—আমি চলে যাবার ঘণ্টাখানেক পরে-ই শো আসেনি তোমার কাছে?

—কি বলছ তুমি হে? মহারাণী আসবেন দীনের কুটিরে?

—তামাসা রাখো।...আমার সঙ্গে বাড়ী থেকে পাগলের মত বেরিয়ে এল তোমার উদ্দেশে, তোমার বাড়ীর অভিমুখে-ই গাড়ী ফেরাল—

—নিজে দেখেছ?

—না দেখে বলছি?

—× × ×

—এসেছিল, তারপর তোমার ভদ্র বন্ধুদের হৈ-হল্লা শুনে দ্বার থেকেই হয়তো ফিরে গেছে, কিংবা হয়তো দ্বার পর্যন্ত এগোয় নি, মাঝপথে এসে চলে গেছে কী মনে করে।...

নীরব থেকে আপন মনে বলল সু:

—সব ভণ্ডামী।...জানো, এই কদিন সে কী ভাবে আমাকে অপমান করেছে।...এর চেয়ে ঢের ভালো নি...

—× × ×

ফোনে ডাকলে তো সাড়া মেলে না, চাকরদের দিয়ে বলায়ঃ বাড়ী নেই। কাল দুপুরে একখানি চিঠি লিখলাম—ফেরৎ পাঠালো না-পড়ে-ই, উপরন্তু চিঠি লিখল: আমার সঙ্গে তার আর কোনো সম্বন্ধ নেই। সুতরাং আমার চিঠি গ্রহণ করতে সে অক্ষম।

—ফোন বা চিঠির দরকারটা কেন হচ্ছে...নিজেই তো যেতে পারো!

—যাই নি, কেন ভাবছ?...

—মদ খেয়ে টলতে টলতে যাও নি তো?

—মদ কি এক কথায় ছাড়া সম্ভব, বলো?

—তবে তোমার প্রস্তাব সমর্থনযোগ্য: নি-র সঙ্গে তোমার আড্ডা জমানোই সঙ্গত।

—× × ×

—দ্যাখো সু, তোমার মনের অবস্থাটা আমি অনুমান করতে পারছি। ঊনিশ-কুড়ি বছরের ছোকরা-প্রণয়ী যা' করে, যা' বলে—তাই তুমি ক'রছ বা ব'লছ দেখে মনে হচ্ছে, এমন অবস্থায় প্রবীণ বয়সের পুরুষ-ও বালকের মত নির্বোধ না হয়ে পারে না!...তা' নি-র সঙ্গে বিবাহের কথাটা পাকাপাকি হয়েছে তো?

—× ×

—তোমার মরণের আর বিলম্ব নেই।

কিছুক্ষণ নীরব থেকে গম্ভীর স্বরে:

—তোমার অদৃষ্ট সু, সত্যিই বড় মন্দ! স্বর্গলোকের তিলোত্তমার তুমি প্রেম পেয়েছ, হারাচ্ছ নিজের চরিত্রের দোষে।...এটা যে তুমি বোঝো না তা তো নয়, শুধু অর্থহীন পৌরুষপ্রভুত্বের বড়াই করতে গিয়ে সব নষ্ট করছ। যাও, মরো গে নি-র খপ্পরে গিয়ে!

—× × ×

—আর তো গিয়েইছ! চেহারা দেখে তো স্পষ্ট বুঝছি যাওয়ার আর দেরী নেই...খুব খাচ্ছ তো?

—তুমি-ও ব্ এইভাবে বলবে ?

—আমি বলেই তো বলবো। অন্যে তো বলবে না—তারা যে তোমার মদের প্রসাদ পেয়ে ধন্য !

সু আমার হাত-দুখানি নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিল। বলল ঃ

—বন্ধু, সংসারে সবাই—হয় তিরস্কারের, না-হয় তোষামোদের কথা শোনায়। মিষ্টি কথা কারুর মুখেই আর শুনি না। কেউ আসে না আপনার জন হয়ে !......

—কার গলা শুনছি রে ?...সু না ?

বলতে বলতে মা দরজা ঠেলে প্রবেশ করলেন। সু তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে মা-র পায়ে হাত দিল। মা আশীর্বাদ করলেন ঃ

—বেঁচে থাকো বাবা, অনেকদিন বাঁচবে, আজ-ই তোমার কথা বলছিলাম !...কী চেহারা তোমার হয়েছে ধন ?...এ-কয়দিন আসো নি কেন ?

—এমনিই আসি নি মা !

—আজ রাত্রে আমার এখানে এসো বাবা, গুরুদেবের প্রসাদ পাবে !

— × × ×

—সু-র গুরু-টুরুতে কোনো বিশ্বাস নেই মা !

সু আমার দিকে তাকাল, অসহায় ক্রোধ তার চোখে। মা বললেন সহজ স্নেহোচ্ছ্বাসে ঃ

—আজকালকার ছেলে কেন থাকবে !...না থাকাই ভালো। তোর মত সবাই তো আর বুড়োমি ভালবাসে না ব্ !...তুমি এসো সু ! কেমন ?

—আচ্ছা মা !

—বাড়ীতে গুরুদেব আছেন, তাঁর শিষ্য দু'জন আছেন, রাতে অনেক গণ্যমান্য অতিথি আসেন, আসবেন, সেই বুঝে খুব সাবধানে এসো সু !

বললাম নিতান্ত মর্মহীনের মত-ই। সু একটু লজ্জিত, বোধ করি মর্মাহত-ও হ'ল এ-কথায়। অসহায়ের মত সে মাথা নিচু করেই রইল। মা বললেন ঃ

—ছি ব্ ! বন্ধু-কে এমনভাবে লজ্জা দিয়ো না, দিতে নেই !

মা-র স্নেহার্দ্র ভাষা মৃতসঞ্জীবনীর কাজ করল সু-র অন্তরে। মুখ তুলল সহজ ঋজুতায়। বলল :

—বু ঠিক-ই বলেছে মা!...রাত্রে আমি ঠিক থাকি না।

—বদ্‌অভ্যাস করে ফেলেছ, তা'বলে কি নয় করে দেব তোমাকে? বু যদি ও-অভ্যাস করত, কী করতাম তাকে সু?...তুমি এসো!

—মদ খাওয়া তুমি সমর্থন করছ মা?

—সমর্থন করব কেন খোকা? যা মন্দ, তা চিরকালই মন্দ। কিন্তু আমি মন্দ বললেই কি তোরা মন্দ বলে সেটা ত্যাগ করবি ধন? আধুনিক লেখাপড়া জানারা তো এটাকে ভালোই বলে। অনেকে এটা খায় শরীর রক্ষা করছি এই ভাবে, অনেকে খায় প্রেরণা পাচ্ছি এই ধারণায়, অনেকে নাকি খায় নেশায় বুঁদ হয়ে সব ভুলে পড়ে থাকার অভিপ্রায়ে।...আমার দাদামশায়ের আমলে বি-এ, এম্-এ পাসেরা তো লোক দেখিয়ে এটা খেত, এখন সবাই লুকিয়ে খায়, সেকালে-একালে এই যা তফাৎ। আমি মন্দ বললে লোকে এটা মানবে কেন?

সু মাথা নিচু করল। মা বললেন :

—লজ্জা পেয়ো না সু, ভেবো না তিরস্কার করছি!...খেতে হয় এখান থেকে রাত্রে গিয়ে খেয়ো!...কেমন?

—× × ×

—যাই বাবা, অনেক কাজ আছে পড়ে!

বলে' মা নিষ্ক্রান্ত হলেন ঘর থেকে। সু নীরব হয়ে বসে রইল। অনেকক্ষণ কাটল। নীরবতা ভাঙবার জন্যে বললাম :

—তা'হলে রাত্রে আসছ?

—দেখি!

—দেখি মানে! মা-র কথা অমান্য করবে?

—বন্ধু, আমি এমনি পরাধীন যে এ-বিষয়ে আগে থাকতে কিছু বলা সম্ভব নয় আমার পক্ষে।

একটু থেমে :

—এক কাজ করতে পারো ব়...আমাকে তোমাদের কোনো একটা ঘরে জোর করে চাবি দিয়ে বন্দী করে' রাখতে পারো? ...রাত্রে মা-র আদেশ পালন করার পর আমাকে মুক্তি দেবে?

—আচ্ছা ব়, কয়েকদিনের জন্যে যদি কোথাও পালাই, কেমন হয়?

—মদের ভয়ে?

—না, নি-র ভয়ে!...তুমি জানো না ব়, নি আমাকে পাকে পাকে কিভাবে জড়িয়েছে! এখন ছাড়াতে ইচ্ছা করলেও বোধ হয় তা সম্ভব নয়।

—তোমার কথা ঠিক স্পষ্টভাবে বুঝছি না সু! ব্যাপার কি?

—তা শুনে তোমার মন খারাপ হবে। বোধ করি ঘৃণা-ও হবে আমার ওপর। হয়তো নির্লজ্জের মত মা-র কাছেই সব বলে বসবে।

মাথাটা ঝিম্-ঝিম্ করে উঠ্ল যেন। ব্যাপার কী?

সু বলে' চলল:

—নি-র সঙ্গে গোপনে আমার অনেক দিনের ঘনিষ্ঠতা।...তার ছবি তো তোমাদের পছন্দ হয় না, আমিও যে খুব পছন্দ করি তা নয়। কিন্তু জানো তো আমি একটা পশু। নতুন কোনো মেয়েমানুষ দেখলে চঞ্চল না হয়ে পারি না! নি জানে আমি শো-র ভক্ত, এইজন্যে শো-র ওপর তার যত ঈর্ষা—আমার ওপর তার তেমনি প্রেম, যত্ন, আদর, অভ্যর্থনা। নি-র ধারণা, শো-র বাজারে যত নাম—তা সব আমার-ই কৃতিত্বের এবং অর্থবলের ফলে। আমি-ই নাকি টাকা জলের মত খরচ করে, ভাড়াটে সমালোচকদের ঘুষ দিয়ে, সম্পাদককে মদের আসরে নিমন্ত্রণ করে, কৌশলে অপকৌশলে শো-র নাম-করার পথে সাহায্য করেছি। নি চায়, আমি তার-ও জন্যে তাই-ই করি। দুর্বল মুহূর্তে আমি যে তা করবার প্রতিশ্রুতি কোনদিন দিই নি, তা মনে ক'রো না।...কেউ জানে না, শো-কেও জানতে দিই নি—তার সঙ্গে ক্রমশঃ গোপনে কীভাবে ঘনিষ্ঠতা হ'ল গাঢ়তর। ইদানীং তোমার—ওপর সন্দেহ করে' শো-র সঙ্গে যখন যা-নয়-তাই ব্যবহার সুরু করলাম, তখন নি-ই হ'ল আমার পরম আশ্রয়। জেদে পড়ে একদিকে তার নামপ্রতিষ্ঠার জন্যে

'ভাড়াটেদের' ডেকে যা-তা সব লেখাতে এবং ছাপাতে লাগলাম, অন্যদিকে উচ্ছৃঙ্খল ভোগবৃত্তির রসাতলে নামলাম নি-কে সঙ্গে নিয়ে। শুনেছি ভদ্রঘরের মেয়ে ছিল নি, এখন তো থাকে একটা সাধারণদের ফ্ল্যাটে, দিনরাত রঙ্ মাখে, দিনরাত আহাম্মক স্তাবকদলে পরিবৃতা হ'য়ে রঙ্গ করে আর সঙ্গ দিয়ে মূল্য চায়।...তোমার ওপর সেতো হাড়ে চটা। বলে কি না—অনেকদিন আগে তুমি তাকে লোভ দেখিয়ে নষ্ট করতে গেছলে, এই তুমি হে, গৈরীকবসনপরিহিত মুরুব্বি সন্ন্যাসী!

সর্বাঙ্গ শিউরে উঠল ঘৃণায়, না ঘৃণায় নয়, কী নাম এই অস্বস্তিকর অবমানবেগের, আমি জানি না। বিকৃত মুখ করে' সু-র চোখের ওপর আমি চোখ মেললাম। সু বুঝল আমার মনোভাব। বলল:

—সব বুঝি বন্ধু, কিন্তু নীচের সঙ্গে নীচেরই তো খাপ খায়। নইলে নি-র খপ্পরে কেন যাবো, সব জেনে শুনে!...মদে পাগল করে' রেখে কত প্রতিশ্রুতি, কত টাকা, এটা-ওটা-সেটা কত কী সে আমার কাছে আদায় করে, করে' থাকে—আমি কি জানি না, বুঝি না ভাবো?...শো-র শাসনে এতদিন তো বেশ ভালোই ছিলাম, কিন্তু কী কুক্ষণে তোমার মত বন্ধুকে সন্দেহ করতে সুরু করলাম, আবার যে কে সে-ই হলাম গোপনে। এখন আর আমি মানুষ নই, আমি পশু। শো-কে ভালো লাগে না। মনে হয় ওটা বড় মিইয়ে-পড়া মেয়ে-মানুষ। জ্বলতে জানে না।...পালাব কোথায় বলতে পারো?...নি থেকে আজ দু-তিন দিন হ'ল পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছি।

—× × ×

—অবশ্য কোর্টে নি সাহস করবে না যেতে। পুলিশে তার একাধিক 'ব্যাড্ রিপোর্ট' আছে। কিন্তু বিশ্বাস তো নেই, যদি যায়, 'ভ্রষ্টানারী' প্রমাণ করে না হয় রক্ষা পাবো, কিন্তু কেলেঙ্কারীটা লুকোবো কি করে?

সমস্ত সকালটা যেন দুর্গন্ধ একটা অপবিত্র বিষবাষ্পে পূর্ণ হয়ে গেল।...কী অসঙ্গতি এই মানুষের পৃথিবীতে। ওদিকে শঙ্খ-ঘণ্টা বাজছে, পূজারতি হচ্ছে, চন্দন গুগ্গুল-ধূপধুনার সৌগন্ধে স্বপ্নমোহন হচ্ছে গৃহমন্দির, আর এদিকে

আমরা দুজন কামকীট কদর্য তরুণাত্মা উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাপনের ক্লেদাকীর্ণ তথ্যবিচারে তমসাচ্ছন্ন!

সু আমার মানসিক অবস্থাটা মুহূর্তে হৃদয়ঙ্গম করল। বুকের মধ্যে আমার একখানি হাত সবলে টেনে নিয়ে বড় কাতর কণ্ঠে বলল :

—সংসারে বন্ধুর কাছেই বন্ধু, সব কথা বলা যায়। সব বললাম। এখন ঘৃণা করতে হয় করো, কিন্তু আমাকে পথটাও দেখিয়ে দাও প্রিয়বন্ধু!

প্রিয়বন্ধু কথাটি অকস্মাৎ মন্ত্রের মত কাজ করল আমার মধ্যে। শো আমাকে প্রিয়বন্ধু বলে সম্বোধন করে। সু-র তো আমি বন্ধু বটেই, প্রিয়-ও বটে। পাপ করেছে, করছে—তার জন্য শাসন করতে পারি, কিন্তু ঘৃণা করে একেবারে দূরে সরিয়ে দিতে পারি না।

সু-র একখানি হাত হাতের মধ্যে স্নেহভরে গ্রহণ করলাম। বলল সু:

—দুটি পথ খোলা আছে : এক আত্মহত্যা, অপর নি-কে বিবাহ।

একটু দম নিয়ে :

—দুটোর একটাও কিন্তু চাই না বন্ধু! আমি বাঁচতে চাই! আর কি বাঁচার উপায় নেই?...

—উপায় কেন থাকবে না সু, আছে! বলে দেওয়াল ঘড়িটার দিকে তাকালাম। বললাম :

এইবার উঠবো।

—যাবে নাকি কোথাও?

শুধাল সু।

—হ্যাঁ, গুরুদেবের কাছে।

—হঠাৎ?

—রোজ-ই তো এই সময়টায় একবার যাই। 'প্রণাম করে' আসি।... দশটার পর লোকের ভিড় কিছু কমে।...যাবে তুমি?

—গুরুদেব বা গেরুয়া-টেরুয়া আমাকে দেখিয়ো না ভাই, ও-সবে আমার বিশ্বাস নেই!

—বিশ্বাস না থাক। কিন্তু এতবড় একজন মহাপুরুষ এসেছেন, একবার দেখা করতে-ও কি ইচ্ছা হয় না?

—মহাপুরুষ বলো কাকে?

—আচ্ছা থাক ভাই!

—লেখাপড়া শিখে-ও সাধুভজনের কুসংস্কার তোমার-ও আছে দেখে অবাক লাগে ব্র!

× × ×

—ও-সব গৈরিকধারীরা এক-একটি শয়তান!

—যেমন আমি একটি!

—তুমি পাল্লায় পড়েছ, হবে!

—গুরুদেব কিন্তু গৈরিকধারী ন'ন, তা জানো?

—দেখেছি।...পয়লা নম্বর চতুর সব। একটু সবুর করো না বন্ধু, রাশিয়া থেকে সাম্যবাদী সৈন্যদল এল বলে, সবকটাকে কঁ্যাক্-কঁ্যাক্ করে' ধরবে আর ছুঁড়ে ফেলবে বে-অফ্-বেঙ্গলে।

—তারা তোমার ব্যাংক-ব্যালেন্স-ও না ধরে ছাড়বে না!

—পরোয়া করি না। তারা আসার আগেই আমি মদের সমুদ্র শুষে নিয়ে রসাতলে আত্মগোপন করবো।

—তবে তো জীবনের পথ পেয়ে-ই আছ!

বলে' তামাসা করলাম।

গুরুদেবের ঘরে তখন লোকজন বিশেষ কেউ নেই। তাঁর কোলের কাছে গিয়ে বসলাম পায়ের ধুলো নিয়ে।

কি আশ্চর্য, সু-ও দেখি ঘরে ঢুকল। একটু তফাতে গিয়ে বসল। হঠাৎ কী মনে হ'ল তার, এগিয়ে এসে গুরুদেবের পায়ে একবার হাত-ও দিল।

গুরুদেব তার দিকে চেয়ে একবার হাসলেন। তারপর নবাগত সকলেই জিজ্ঞাসা করেন, সু-কে-ও করলেন।

—কি সমাচার বৎস?

সু এ-প্রশ্ন বোধ হয় প্রত্যাশা করে নি। কথার উত্তর দিচ্ছে না বা দিতে পারছে না দেখে আমি বললাম :

—ওকে আশীর্বাদ করুন গুরুদেব। যেন শান্তি পায়!

গুরুভক্তি সু-র এতটুকু নেই আমি জানি। কিন্তু আমার এই কথায় সু একেবারে গলে গেল যেন। কৃতজ্ঞতার আবেশময় স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে সে আমার দিকে তাকাল। তারপর বালকের সারল্য নিয়ে বলল :

—বু আমার পরম বন্ধু। ও ছাড়া জগতে আমার আর কেউ নেই। আশীর্বাদ করুন ওর বন্ধুত্বের মর্যাদা যেন রাখতে পারি!

মৃদুহাস্য করে' গুরুদেব সু-র মাথায় হাত রাখলেন। সু আর একবার প্রণাম করল গুরুদেবকে।

নিস্তব্ধতা নামল গৃহমন্দিরে। এমন নিস্তব্ধতা—একটি পিন পড়ার শব্দ-ও বুঝি শুনতে পাওয়া যায়। কী আশ্চর্য, চঞ্চল সু-ও বসে রইল নিস্পন্দ পাথরের মত।

—নারায়ণ! নারায়ণ!

নাম জপ করলেন গুরুদেব।

আর তো কোনো খোঁজ-খবরই করিনা। অনুযোগ করেছিল শো। আজ দুপুরে। সন্ধ্যার পর একবার নিচে নামলাম!

গাড়ী বার করছি, সু এল ট্যাক্সীতে। বলল:

—তাড়াতাড়ি পালিয়ে এলাম বৃ। বাড়ীতে থাকলেই হয়তো মদে পাবে, আর মদে পেলেই মা-কে হারাতে হবে, মাকে তখন তো আর মুখ দেখাতে পারবো না!

—বড় খুসী হলাম। মনের জোরে সবই হয় সু। জোর করেছ, তাই আসতে পেরেছ।

—কিন্তু কী যে কষ্ট তাতো জানো না!

—হ'ক কষ্ট। সহ্য করো।...এমন তো নয় যে মদ ছাড়ার অভিজ্ঞতা তোমার নেই।...

—গাড়ী বার করেছ, যাচ্ছ কোথায়?

—শোর কাছে। দুপুরে ফোন করেছিল। অনেক করে যেতে বলেছে। যাবে তুমি?

হঠাৎ অন্যরূপ ধারণ করল সু। নীরস কণ্ঠে বলল:

—না!

—× × ×

—অপমানিত হওয়ার জন্য আবার যাবো!

হাসলাম।

—হাসছ?

—আচ্ছা হাসবো না...ওপরে গিয়ে তবে বসো গে!...আসছি ঘুরে!

—× × ×

—যেতে ইচ্ছা হচ্ছে?

বললাম স্নেহার্দ্র মিষ্টতায়।

—তোমাকে কেউ যদি চাকর দিয়ে বাড়ীর বার করে' দেয়, যাবে তুমি তার কাছে?

—তা অবশ্য যাবো না। কিন্তু শো তোমাকে চাকর দিয়ে অপমান করেছে, এটা বিশ্বাস করতে বলো?

—বিশ্বাস হচ্ছে না?

হাসলাম:

—আচ্ছা হচ্ছে!...গিয়ে খোকাখুকীদের মানাভিমানের গল্পটা একবার শুনে আসি।

—একলা থাকবো?

—বাড়ীতে লোকে লোকারণ্য। বলছ একলা থাকবে?

—× × ×

—তার চেয়ে এসো না বাপু আমার সঙ্গে।

—আচ্ছা চলো যাই। তোমাকে পেঁাছে দিয়ে গাড়ী নিয়ে একটু ঘুরি এদিক-ওদিক।

—ঘুরতে ঘুরতে যদি মদের ডাক শোনো?

শো-র বাড়ীর দরজার কাছে আমাকে নামিয়ে দিয়ে সু বলল:

—কটায় আসবো গাড়ী নিয়ে?

—আসতে হবে না,—গাড়ী থাক, চলো!

—বাজে কথা রাখো, বলো কটায় আসবো?

—ছেলেমানুষী হচ্ছে না?

—× × ×

—নামো!

সু গাড়ীতে ষ্টার্ট দিল:

—ঠিক ন-টায় আসবো! হর্ণ শুনলেই এসো নেমে!

বলতে বলতে উধাও হয়ে গেল গাড়ী নিয়ে।

কৌতুকভরে হাসলাম।...

দারোয়ান উঠে দাঁড়িয়েছিল সেলাম দিয়ে। খবর দিতে বললাম। বলল সে, খবর দিতে হবে না, মাঈজী জানেন। আসুন...

সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শুনে শো এল বেরিয়ে। শুষ্ক, বিষণ্ণ, অসহায় তার মুখ।

আত্মীয়তার হাসি হাসলাম। বলল সে:

—না ডাকলে বুঝি আসতে নেই? এই বুঝি বন্ধু?

—শূন্য বন্ধুত্বে যে মন ওঠে না—না-আসাটাই কি তার প্রমাণ নয়, বললাম তামাসা করে।

শো সে তামাসায় কান দিল না। বলল:

—বড় ব্যস্ত আছ শুনেছি। ফুল জানিয়েছে।...কিন্তু ফোনেও কি দুটো কথা বলতে পারো না?...ফুলকে তো শিখিয়ে রেখেছ, ফোন এলেই বলতে বড়দা ব্যস্ত।...নাকি সন্ন্যাসী হয়ে যাচ্ছ?

—হতে একটু বাকী আছে!

—কী দুঃখে?

বলতে বলতে শো তার বিশ্রামাগারে আমাকে এনে বসাল। তারপর জের টানল পূর্ব কথার:

—কী দুঃখে স্যার?

—জীবনে দুঃখের কী সীমা আছে ম্যা'ম্? এ-জীবন অনন্ত দুঃখের। প্রেম আছে—প্রকাশের ভাষা নেই, গান আছে—শোনাবার মানুষ নেই, প্রাণ আছে—উপহার নেয়ার হৃদয় নেই!—জীবনের দুঃখের কী সীমা আছে ম্যাডাম্!

—নটি বয়!

বলল শো, চোখে অমিত আত্মীয়তার আলো জ্বেলে:

—পথে আসতে আসতে সেকেলে ওই পুরোণো কথাগুলো মুখস্থ করেছ নিশ্চয়?

—তা' করেছি।...মুখস্থ না থাকলে সুরে আসে না কম্‌প্লিট!... কথা শোনা ও শোনানোই যখন ভাগ্যের লিখন, শুনে ভাবতে হবে পেরেছি কি শুনিয়ে ভাবতে দিয়েছি, অথবা কথাগুলোকে সুরে দুলিয়ে একধাপ জাতে তোলায় দোষ কী বলো।

—ফের ওই সুরে কথা বলো?

বলে' শো অভিনব ভৎর্সনার মধুর বিরক্তিতে স্তব্ধ করে দিল আমাকে।

কৃত্রিম গাম্ভীর্যে মুখখানাকে খানিকটা নীরস করবার চেষ্টা করলাম। তারপর:

—আচ্ছা তামাসা থাক,

বললাম বড়দার সুপিরিয়রিটি নিয়ে:

সু-র সঙ্গে এখনো কলহ মিটলো না তো?

শো-র মুখের ছবি মুহূর্তে বদলে গেল:

—শোনো নি বোধ হয় কিছু?

—কিছু কিছু শুনেছি।...এসেছিল সু। হাসির কথা, এইমাত্র তোমার বাড়ী পর্যন্ত এসেছিল।

—বাড়ীতে ঢোকবার কি আর মুখ আছে তার?

—হ'লো কি?

—কিছু তাহ'লে শোনো নি?...

× × ×

—দিন দুই আগে নি এসেছিল আমার কাছে। যা শুনলুম তা তোমার কাছে বলা যায় না।...

—এমন-ও তো হতে পারে স্বার্থের অনুরোধে নি তোমার কাছে যা নয় তা-ই গল্প করেছে?

—বাইরের কানঘুষো শুনে এতদিন তাই তো ভেবেছিলাম।...আমার এই বাড়ীখানা নি-র নামে লিখে দেওয়ার প্রস্তাব নিয়ে গতকাল রাত্রে মদ খেয়ে তোমার বন্ধুটি হল্লা করে' হঠাৎ এল। বললাম, ঘরে ঢুকো না, এখনি বেরোও! চিৎকার করে' বলল, বাড়ী কার? বললাম, আমার নামে

বাড়ী, বাড়ী আমার! অশ্লীল একটা বিজাতীয় শব্দ উচ্চারণ করে' বলল, কার টাকায় কেনা হয়েছে এ-বাড়ী মনে নেই? রাগে অন্ধ হয়ে বললাম, না নেই!—নেই!—বলে' অগ্নিশর্মা হল। মারতেই বুঝি এগোলো বুনো মোষের মত। আমার চাকর ও দারোয়ান গোলমাল শুনে যদি ওপরে উঠে না আসতো, আজ হয়তো হাসপাতালে কিংবা যমের গৃহে থাকতে হতো।...

—× × ×

—বলে নি এ-সব?

—× × ×

—কী লজ্জার কথা বলো তো, চাকর-বাকরগুলোর সামনে একী অদ্ভুত ইতোরমি। কথায়-কথায় কখন কী সাহায্য করেছে, তার অহংকার করা, কথায়-কথায় মারতে এসে স্বামীত্ব ফলানো, কথায়-কথায় অশ্লীল কথা উচ্চারণ করে' অপমান করা, কতদিন আর এ-সব সহ্য হয় প্রিয়বন্ধু?

শো-র চোখদুটি জলে টলটল করে উঠল। সহানুভূতির সুরে বললাম:

—মদেই ওকে মেরেছে শো!

—মদ ছাড়ার কথা বলেছি অনেক। সেদিন কী বলল জানো: চিরটাকাল তোমার আঁচল ধরে অধীন হয়ে যাতে থাকি—তাই না ছাড়তে বলছ মদ?...পুরুষমানুষ আমি, মদ ছেড়ে মেয়েমানুষ হতে পারবো না।

হাসলাম।...

—হাসির কথা নয় বু! এ ভয়ংকর কথা!

—× × ×

—নি তো এসে ভয় দেখিয়ে গেল: বিয়ে করতে যদি রাজী না হয়, সে কোর্টে যাবে। বললাম, আমাকে এ-সব জানানো কেন? নি বলল, তোমার কাছে করজোড়ে দয়া ভিক্ষা করতে এসেছি। শুনে হাঁ করে নি-র মুখের দিকে তাকালাম। তখন নি: তুমি আর সু-কে প্রশ্রয় দিয়ে দুর্বল করে' দিয়ো না—এই অনুরোধ।...পা থেকে মাথা পর্যন্ত জ্বলে গেল। অনেক কষ্টে সংযত হলাম। যাবার সময় নি বলে গেল, তোমার যা' পাবার তা' তো

পেয়েছ, আশাতীতভাবে পেয়েছ।...এখন ছেড়ে দাও, প্লিজ।...কিছু মনে করো না মিস শো, এটা সু-র-ই কথা, আমার মুখে শুনছ মাত্র।

—× × ×

—বুঝতে পারছ এতদিন কাকে ভালবেসেছিলাম ?

—পারছি। কিন্তু এটা কি বিশ্বাস করো শো, নূতন প্রলোভনে পুরাতন প্রেমকে এককথায় দূরে সরিয়ে দেয়া সম্ভব ?

—তর্কে দরকার কি ? স্পষ্ট-ই তো দেখছি !

—বোধ হয় দেখছ না অভিমানে অন্ধ হয়ে। কিংবা দেখছ ঠিকই, ক্রোধাবেগে বিপরীত ভাবাপন্ন হয়ে যথার্থ কথাটি পারছ না বলতে !

—কী তুমি বলতে চাও বুঝতে পারছি না ব্র !

—বলতে চাইছি, সু চরিত্রহীন, হঠকারী, বাউণ্ডুলে, কিন্তু তবু তাকেই না হলে তোমার চলবে না, চলতে পারে না।

—× × ×

—বাইরে থেকে তোমার সু-প্রীতি দেখে মানুষ বিস্মিত হতে পারে, ভাবতে পারে—এতবড় শিল্পপ্রতিভা যার, এত রূপ, এত গুণ, এত বিদ্যা, এত যশ যে নারীর সে কেন এমনি একটা অমানুষের হাতে মার খায়, খেয়ে সহ্য করে।... কিন্তু ভেতরের কথা তুমি জানো শো,...পারো তুমি সু-কে ঠেলে ফেলতে ?

—আরো কোনো কথা নয়, পারতেই হবে !

—সু-ও এই কথা বলে, শুনে আমি হাসি।

বলে' থামলাম। একটু পরে আবার ঃ

—সেদিন সন্ধ্যায় সু-র বাড়ীতে যাওয়ার জন্যে তো বেরুলে, কিন্তু ফিরলে কেন ?

—দুর্ব্যবহারের ভয়ে।

—বোধ হয় ভুল করেছ !

—ভুল ?

—সু-কে তুমি যেমন চেনো তেমন আর কে চেনে ! তুমি যাওয়ামাত্র দেখতে সে জল হয়ে যেত।...এমনটা যে কখন-ও হয় নি, তা তো নয়।...

বয় এল প্লেটে খাবার সাজিয়ে নিয়ে।

—এ-সব কী ব্যাপার।...কথা তো ছিল না!

—কিছু খাও!

—সন্ধ্যায় খেয়ে বেরিয়েছি। আবার গিয়ে খেতে হবে। রাজকীয় ব্যাপার চলছে বাড়ীতে।

—তা তো জানি। তবু কিছু খাও আমার কাছে!...মন খারাপ, নিজের হাতে তো করতে পারি নি, দোকান থেকে যা কিনে পেয়েছে এনেছে। কোনোদিন-ই তো তোমাকে খাওয়াতে পারলাম না।

—খাওয়ানোর কি সময় গেছে!

—কি জানি!

—মানে?

—কোন্‌দিন হয় তো শুনবে...

—তোমরা দুটিতেই সমান,

বললাম বাধা দিয়ে। ক্ষীরের চপ্‌খানিতে দাঁতের কামড় দিয়ে গম্ভীরভাবে তারপর:

—আমার দৌত্যকর্ম সর্বাঙ্গীণভাবে সফল হবে জেনে আমি আশান্বিত হলাম, সু-মিত্রা!

নূতন নামোচ্চারণে পুলকিত হয়ে উঠল শো। একটু পরে কী মনে করে' হঠাৎ ঝংকার দিয়ে কিন্তু বলে' উঠল:

—চাই নে এ-নাম, ফিরিয়ে নাও!

—ভাবলাম একটা নামের অন্তরালে গোপন রাখবো আমার স্বপ্নের দুঃখ। হায় রে দুরাশা! এমন যে অবলা রমণী, সে-ও বলে' দিল, ধরা পড়েছি!

—আজ বুঝি কেবল তামাসা করতেই এসেছ?...তোমাকে এমন তো কখন-ও দেখি নি!

—ক-দিন দেখেছ সু-মিত্রা?

—ফের!

—চিন্তা ক'রো না, সব ঠিক হয়ে যাবে।...একদিন আমি এসেছিলাম

প্রচ্ছন্ন কাঁটা হয়ে, কষ্ট পেয়েছিলে, এখন নি এসেছে, কিন্তু কষ্ট পাচ্ছ।...ভয় নেই সব ঠিক হয়ে যাবে।...প্রেম কখন-ও মিথ্যা হয় না প্রিয়সখি!

—বুঝেছি গো সন্ন্যাসীঠাকুর!

—সন্ন্যাসীঠাকুর নয় সখি, বলো পথের বাউল!

—× × ×

—রাজবেশে উঠবে বিজয়ের চতুর্দোলায়। রাজপথে প্রতীক্ষায় থাকবো চেয়ে। একতারার সুর বাজাবো।...রাজকুমারীর নয়ন-লোকের কোনো স্নেহদৃষ্টি যদি উপহার পাই—পাথেয় করবো আনন্দে।

—আবার কথা বলছ সেকেলে সুরে!

—এটাই কিন্তু প্রাণের সুর প্রিয়সখি!

কথা কইতে কইতে প্লেটটা শেষ করে আনলাম:

—আজ মা-র কাছে বকুনি খাবো!

—একটু খেয়ো আমার জন্যে!

গ্লাসের জলটুকু শেষ করলাম:

—আর এটু জল!

—এনে দিই।

হাত মোছবার তোয়ালেটা এগিয়ে দিতে দিতে বলল শো:

—গুরুদেব আর ক-দিন থাকবেন?

—বোধ হয় আর দুদিন। আগামী মঙ্গলবার যাবেন দেওঘর। সেখান থেকে কয়েকদিন পরে চলে যাবেন দক্ষিণভারত সফরে।...অবশ্য সব-ই মা-র কাছে শোনা কথা বলছি।

—আচ্ছা, আমি যদি একবার তাঁকে দেখতে যাই...

—কতলোক তো যাচ্ছে...

—মা যদি...

—কিছু মনে করবেন ভাবছ?

—আমি যাবো?

—বেশ তো ?

—তোমার সঙ্গে দেখা করবো না, দূর থেকে গুরুদেবকে দেখেই চলে আসবো।

—আমার সঙ্গে দেখা করবে না মানে ?

—সমাজে তোমার কত নাম, সচ্চরিত্র সাধু বলে কত সম্মান, তোমাকে লোকে অকারণে যা-তা বলবার সুযোগ পাবে—এটা কি হতে দিতে আছে ?

—আমাকে সম্মান দিতে গিয়ে নিজেকে বড় খাটো করছ সুমিত্রা, এমন মানুষকে ভালবেসে সুর পাই না, কবিতা পাই না।

—আমি তোমার ভালবাসার যোগ্য নই প্রিয়বন্ধু, আমি মরে গেছি।—মনে হচ্ছে, কোনো দিন-ই আমার সুর ছিল না, ছিল না শিল্পের স্বপ্ন।...ভদ্রসমাজে উপেক্ষিত নগণ্য একটা মেয়েমানুষ ছাড়া আমি আর কিছু না।

বলতে বলতে শো আমার ডান হাতখানি দু'হাতে জড়িয়ে ধরল বিপুল আবেগে :

—এমনভাবে কিন্তু মরতে চাই না প্রিয়বন্ধু।...বাঁচাবে আমাকে ?

—বাঁচার জন্যেই আমাদের জন্ম ও সংগ্রাম সুমিত্রা, মরার জন্য নয়।—

শো উঠল। আলমারী থেকে একখানি খাম, কি জানি কেন, বার করল। হাতের মধ্যে রেখে আবার এসে বসল পাশে। বলল :

—গেলে বলছ, কেউ কিছু ভাববে না ?

রাস্তায় পরিচিত হর্ণ বেজে উঠল। উঠলাম :

—সু এসেছে তা'লে। কেউ যদি ভাবে, ওই সু!

—ওকে আর গ্রাহ্য করি না।

—বটে !

বলে' কৌতুকভরে আমি গাল ফোলালাম দাদুর ষ্টাইলে। শো এগিয়ে এল একেবারে বুকের কাছে। আচম্বিতে তারপর :

—কথা দাও, আবার কাল আসবে।

—গুরুদেব চলে গেলে পর, আদেশ দিও রোজ আসবো।—

—রোজ আসবে ?...তুমি ?

— × × ×

—আচ্ছা সে-'আদেশ' দেবো কি না পরে ভাববো। কাল তো এসো...! গান শোনাবো। বলো আসবে ?

—গানের লোভ দেখিয়েছ! মনে থাকে যেন!

শো সিঁড়ি দিয়ে আমার সঙ্গে নামতে নামতে একেবারে নিচের তলায় এল। তারপর :

—কাল আসবে ঠিক ?

—হ্যাঁ গো বুড়োখুকী।...তা রাস্তা পর্যন্ত আসবে না ?

—আর যাবো না।...হ্যাঁ দেখো, খামখানি তোমার বন্ধুকে দিয়ে দিয়ো।

—বন্ধু তো দ্বারপ্রান্তে। চিঠি কেন, মুখেই কথাবার্তা হ'ক না, শুনি!

—চিঠি নয় ভাই, ওটা চেক।

—চেক ?

—বাড়ী-করার সময় যে টাকা সু দিয়েছিল, বড় লজ্জা দেয় ভাই তার জন্যে, সব শোধ করে দিলাম।

হর্ণ বাজল আবার।

—এ-বাড়ী তৈরী করতে চব্বিশ হাজার টাকা খরচ হয়েছিল। চেকে ওই টাকাটাই লিখে দিয়েছি।

—বুঝলাম!

—কী বুঝলে ?

—কাল এসে বলবো!

গাড়ীতে এসে উঠলাম। সু বললে :

—ঠিক টাইমে এসেছি তো!

—জাষ্ট ইন্ টাইম! থ্যাংক ইউ!

একটু থেমে :

—অভিমানে পীড়িত হয়ে ঘুরলে তো সারা শহর ?

—শহর ঘুরলে কি রক্ষা ছিল বন্ধু ?...এতক্ষণে তোমার গাড়ীখানিকে নির্জন কোনো নর্দমায় ফেলে রেখে নি-র সভা গুলজার করে' বসতাম।

—ছিলে কোথায় ?

—নিরাপদ আশ্রয়ে। মার কাছে।...শুরুটুকু কিছু বিশ্বাস করি না বু !... মানুষ কখন-ও ভালো হয় না, যদি-বা হয়, হয় কার জন্যে জানো ?

রাস্তার একটা বাঁক ঘুরে সু বলল :

—মা-র জন্যে।

—মদ খেতে ইচ্ছা করছে না ?

—মনটা শান্তিতে থাকলে মদ বোধ হয় ছাড়তে পারি প্রিয়বন্ধু !

প্রসাদ পাওয়ার পর সু মাকে প্রণাম করে' বিদায় চাইল। মা বললেন :

—বড় আনন্দিত হয়েছি সু, প্রসাদ পেয়ে গেলে! গুরুদেব আরো তো দিন দুই থাকছেন, যদি অসুবিধা বোধ না করো, এসো মা প্রসাদ পেতে!

সু চুপ করে' আছে দেখে বললাম :

—ওর অসুবিধা হতে পারে মা!

—আচ্ছা তবে থাক!...সময় মতো মাঝে মাঝে তা'বলে এসো বাবা!

—আমি কাল-ও আসবো মা!

—প্রতিজ্ঞা করছ মা-র সামনে, রাখতে পারবে না!

—এতে প্রতিজ্ঞার কী আছে ধন, না আসতে পারো, বুঝবো কোথাও আটকে পড়েছ!

সু আর একবার মার পায়ের ধুলো নিল।

বাড়ীর বাইরে এলাম সু-র সঙ্গে। উল্লসিত হয়ে সু বলল :

—একটা বিষয় লক্ষ্য করছ ব্র, মদের কথা আমি একবারো বলি নি!

—শো-র কথা-ও বলো নি।...এই নাও!

—চিঠি?

সু-র মুখখানি আকস্মিক আশার বিদ্যুতে চিকমিকিয়ে উঠল।

—চিঠি? শো দিয়েছে?

—চিঠি নয়। চেক।...তা ভেতরে চিঠি আছে কি না জানি না!

—চেক!

শব্দটি টেনে একবার উচ্চারণ করল সু। ক্ষিপ্রহস্তে ছিঁড়ে ফেলল খামখানা।...চিঠি নেই! শুধু নীরস অর্থহীন চেক। চব্বিশ হাজার টাকার।

পাথরের মত নিস্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল সু।...বললাম :

—প্রসাদ পাওয়ার আগে দিই নি পাছে হৈ-চৈ করে' হঠাৎ চলে যাও।

—না:,

স্বপ্ন থেকে যেন সদ্য উঠে এসে উত্তর করল সু :

—না:, এতে হৈ-চৈ করার কী আছে।

একটু থেমে নিতান্ত অসহায়ের সুরে :

—মা-র উদ্দেশ্য বোধ হয় ব্যর্থ হবে বু!...শো আমাকে মদ ছাড়তে তাহ'লে দিল না।...যাই আর একবার মা-র কাছে!

সু সত্যসত্যই মা-র কাছে এল ফিরে। মা বড় ব্যস্ত অতিথি-অভ্যর্থনায়। তবু সু-কে দেখে কাছে এলেন। বললেন :

—কিছু বলছ বাবা ?

—হ্যাঁ মা, কাল হয়তো আসতে পারবো না।

—এই বলতে আবার এসেছ, পাগ্‌লাটা!

হেসে বললেন মা, স্নেহার্দ্র সুরে।

—ও একজন মেয়েকে ভালবাসে মা, তার কাছে ওকে কাল যেতেই হবে!

বললাম নির্লজ্জ সারল্যে। মা-র কাছে এমন কথা বলতে পারি সু একবারো তা কল্পনা করতে পারে নি। বিহ্বল ম্রিয়মাণতার দৃষ্টিতে আমার দিকে সে তাকাল।

মা কিন্তু, মনে হল, কিছুই মনে করলেন না। বললেন :

—বেশ তো, তার কাছেই যেয়ো সু!

× × ×

লজ্জিত হয়ে নীরব রইল সু। বললাম :

—মেয়েটিকে তা'বলে যা-তা মনে ক'রো না মা। প্রাণপণ চেষ্টা করছে সু-কে মদ ছাড়ানোর জন্যে।

—ভদ্রঘরের ভালো মেয়েরা তো তাই-ই করে বাবা!

—সত্যি সে খুব ভালো মেয়ে মা!

বললাম উৎসাহিত হয়ে :

—দেবীর মত চরিত্র। সিনেমা করে বলে' যা-তা মনে ক'রো না! লেখাপড়া জানে অনেক। ভদ্রঘরের মেয়ে!

মা একটু চুপ করে' কী ভাবলেন। তারপর :

—তা এক কাজ করো না সু, অসুবিধা না হয়, সন্ধ্যায় তাকে সঙ্গে করে' আমার এখানে আনো না কেন! সে-ও প্রসাদ পাবে।

চমকে উঠলাম আমার ভক্তিমতী গোঁড়া মায়ের আশ্চর্য ঔদার্যে। বুঝতে পারলাম না মা-র এই আকস্মিক ঔদার্যের তাৎপর্য। সিনেমার মেয়েদের সম্বন্ধে মা-র কী ধারণা, তা' তো আমার অজানা নেই—গুরুদেবের উপস্থিতিতে পাছে আমি এই সব মেয়েদের বাড়ীর মধ্যে ঢোকাই—এই ভয়ে ও কল্পনায় মা আমাকে দূরে সরিয়ে রাখবারও প্রস্তাব করেছিলেন। আজ সেই সিনেমার-ই একজন মেয়েকে সঙ্গে করে আনার প্রস্তাব তিনি নিজেই করছেন—এ কী আশ্চর্য পরিবর্তন আমার মায়ের!

সু বিস্মিত হয়ে চেয়ে রইল মা-র মুখের দিকে। আমি অবশ্য সহজ-ভাবেই বললাম :

—সে বেশ ভালো কথা মা!...তাই করো সু! শো-কে নিয়ে এসো কাল সন্ধ্যায়!

নীরবে সু চলে এল মা-র কাছ থেকে। রাস্তায় নেমে এসে বলল :

—এ আমাকে কী ফেসাদে ফেললে ব!...তুমি কি জানো না, শো-র সঙ্গে এখন আমার কেমন সদ্ভাব ?

—সদ্ভাব আবার হতে কতক্ষণ ?

—তুমি একটি বালক!

—আর তুমি যে জ্ঞানবৃদ্ধ মহাপ্রাচীন, তা জানি।...এখন ধীর শ্রদ্ধার শো-র সমীপে যাও।...আজ যেতে বলছি নে, কাল যেয়ো।...মার্জনা ভিক্ষা করে চেকটা ফেরৎ দিয়ো...ব্যস!

—তুমি জানো না শো-কে। চেক সে ফেরৎ নেবে না। বুঝছ না, সে আমাকে ত্যাগ করেছে?

—আশ্চর্য মনস্তত্ত্ববিদ্ তো তুমি!

—সত্যি ব্, আমি কিছু ভাবতে পারছি না যেন। আমার মাথাটা কেমনতর হয়ে যাচ্ছে।

—ওটা স্বর্গীয় প্রেমের-ই লক্ষণ বৎস! আজ রাত্রিটা সুখনিদ্রা দিয়ে কাল যে কোনো সময়ে যাও শো-র কাছে। ভালো ছেলেটি হয়ে থাকো তারপর। ব্যস! সকল সমস্যার সমাধান!

—নি-কে এর মধ্যে রেখে বিষয়টা ভেবে দেখছ?

সত্যি তো, নি-র কথা মনেই আসে নি। উপচিকীর্ষার সমস্ত উৎসাহবেগ মুহূর্তে মন্দীভূত হয়ে গেল।

—নি কি আমাকে সহজে ছাড়বে ভাবো? আমি মূর্খ, মাতাল, কত লোভ যে তাকে দেখিয়েছি, কত প্রতিশ্রুতি যে দিয়েছি—

—× × ×

—আমি আর কিছু ভাবতে পারছি না ব্!...শো-র কাছে অনাদর পেয়ে একবার ভাবি, নি-কে বিবাহ করলেই বুঝি সকল সমস্যার সমাধান হবে। পরক্ষণেই নি-র স্বভাব চরিত্রের কথা যখন মনে আসে, শিউরে উঠি গোপনে। এই জাতের মেয়েদের সঙ্গে সাময়িকভাবে স্ফূর্তি করা যায়, কিন্তু ঘর করা কি সম্ভব?

—× × ×

—এবার আমি শেষ হবো ব্! আর কিছু ভাবতে পারছি না!...এমন অবস্থাতে বলতে পারো, মদ না খেয়ে থাকবো কি করে?...বন্ধু, আমাকে বাড়ী পর্যন্ত তুমি কি দিয়ে আসবে? নইলে...না, নি-র কাছে নিশ্চয়ই যাবো না, কিন্তু অভিমান জানাতে গিয়ে এখনি হয়তো শো-র বাড়ীতে গিয়ে হৈ-চৈ বাধাবো মাতাল হয়ে।

—আচ্ছা, একটু অপেক্ষা করো।

গেঞ্জী গায়ে ছিল, একটা সার্ট গায়ে চড়িয়ে নেবার জন্যে বাড়ীতে এলাম পুনর্বার।

ফিরে এসে দেখি সু নেই। চলে গেছে।

মাতাল এই বন্ধুটার জন্যে সুখশান্তি আমার সব গেল। যা হয়, হ'ক, আর পারি না।

বাড়ীতে চলে এলাম ধীর পদবিক্ষেপে।

বাড়ীতে সব ঘরেই এখনো লোকজন ও আত্মীয়-স্বজনে পূর্ণ।...ছাদে উঠে একাকী ঘুরে বেড়ালাম অন্যমনস্ক। মিনিট পনের কাটল...পাশের বাড়ীর ঘড়িটায় ঢঙ্ ঢঙ্ করে এগারোটা বাজল।...আকাশপাতাল কত কী ভাবলাম।

শো-র জন্যে সহসা মনটা ব্যাকুল হয়ে উঠল। হতভাগাটা এই রাত্তিরে শো-কে গিয়ে জ্বালাতে সুরু করে নি তো?

কেমন একটা দুঃসহ অস্বস্তি অনুভব করলাম। নিচে নেমে এসে ফোন করলাম শো-র নাম্বারে। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে-ও সাড়া মিলল না। ব্যাপার কী!...

—হ্যালো!

—হ্যাঁ বলুন!

এল পুরুষ গলার গম্ভীর উত্তর।

কার গলা! সু তো নয়! শো-র বাড়ীতে শো নেই, সু নয়, এ আবার কার আবির্ভাব?

—আমি ব্ব। শো আছে?

—আছে। অসুস্থ।

—আপনি?

—ডাক্তার!

চমকে উঠলাম। চিন্তা হল। সু সত্য সত্যই কোনো অঘটন ঘটিয়ে বসে নি তো?

বেরুলাম গাড়ী নিয়ে।...শো-র বাড়ীর দ্বারদেশে এসে দেখি বেশ কতকগুলি লোক জড় হয়েছে সেখানে। আমি আসতেই কে একজন ছোকরা পেছন থেকে বলে উঠল :

—এই যে ইনি-ও এলেন।...বেশ আছেন সব!

ব্যাপার কী।

•

ব্যাপারটা অত্যন্ত স্পষ্ট বলেই মনে হল সদ্য আগত পুলিশ ভ্যানে শ্রীমতী নি-কে সমাগতা দেখে। আমাকে দেখে, যেন কিছুই হয় নি, নি চিনতে তো পারলেন-ই, হাসলেন, হাত তুলে নমস্কার-ও করলেন। যে-সেপাইটির পাশে শ্রীমতী বসেছিলেন, তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে সে আমার দিকে একবার তাকাল।

একটু পরে এ কি!...ইনেসপেকটর সাহেব সু-কে সঙ্গে নিয়ে এলেন বাইরে।

আমাকে দেখে গম্ভীরভাবে বলল সু :

—অদৃষ্টে এটা ছিল বৃ, নইলে তোমাকে ছেড়ে হঠাৎ হাঙ্গামার মধ্যে আসতে যাবো কেন? কিন্তু বিশ্বাস রেখো বাড়ীতেই প্রথমে ফিরেছিলাম। থাকতে পারলাম না, হঠাৎ গ্রহের ফেরে এলাম এখানে। কিন্তু কোনো মন্দ অভিপ্রায়ে আসি নি বৃ, মদ-ও খাই নি!

পুলিশ নি ও সু-কে 'অ্যারেষ্ট' করে নিয়ে গেল।

রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে অকারণে ছোকরাদের ঠাট্টা ও অশ্লীল ইঙ্গিত সহ্য করার চেয়ে শো-র বাড়ীর মধ্যে যাওয়া-ই ভালো।...প্রয়োজন-ও বোধ করছিলাম গভীরভাবে।

সিঁড়ি দিয়ে উঠছি—মথুর নামছে ডাক্তারের সঙ্গে। আমাকে দেখে মথুর যেন সাহস পেল, বলল :

—আপনি এসেছেন! বসুন বাবু ওপরে! আসছি!

সিঁড়ির ওপরে ঠিক সামনের ঘরটার চেহারা দেখে ব্যাপারটা আরো খানিক স্পষ্ট হ'ল। কাচের বাসনগুলো এদিকে-সেদিকে ছুঁড়ে ফেলে ভাঙা হয়েছে। চেয়ার-টেবিল ইতস্তত বিক্ষিপ্ত। দেওয়ালের দুটো তিনটে ছবির কাচ ভেঙে গেছে—কোনোটা হেলে পড়ে একটা দড়িতে ঝুলছে, এখনি বোধ হয় পড়ে যাবে!

শো-র শোওয়ার ঘরে এলাম দ্রুত। চোখ বুজিয়ে শুয়ে আছে শো। কপালটা ব্যাণ্ডেজ-করা।...নিতান্ত ক্লান্ত, অসহায় দেখাচ্ছে তাকে।

তার কোলের কাছে বসলাম পরম স্নেহ ও সহানুভূতির আবেগে। ডাকলাম:

—সুমিতা!

—তুমি এসেছ?...এমনি ছোট কাজের মধ্যে-ও তোমাকে আসতে হ'ল। আমার অদৃষ্ট!

বলে' চোখ বুজিয়ে রইল আবার।

মথুর এল মিনিট দুই পরে-ই। জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তার দিকে তাকালাম। বলল মথুর প্রায় হাঁফাতে হাঁফাতে:

—কি ভয়ানক কাণ্ড বাবু, কখন-ও দেখি নি!

শো চোখ মেলল:

—কিছু ভালো লাগছে না! তুই থাম মথুর! যা!

—এর একটা বিহিত তা'বলে করবো। আমি সাক্ষী দিয়েছি। কোর্টে গিয়ে দেব।...বাড়ী বয়ে এসে মা-কে অপমান করেছে, যা-নয়-তাই বলেছে, ধাক্কা দিয়ে মা-কে ফেলে দিয়েছে।...খুন হত আর একটু হ'লে!... ঘর-দোরের কী অবস্থা হয়েছে দেখেছেন?...আমি ছাড়বো না!

—থামবি মথুর!

ইশারা করে মথুরকে জানালাম পরে সব শুনবো। মথুর চলে গেল।

—ক-টা বাজলো র?

—সাড়ে-বারো!

—খাওয়া-দাওয়া করেছ?

—তা করেছি!

—আর থেকো না ভাই, বাড়ী যাও।...মা হয়তো তোমার ওপর কত কী ভেবে বসবেন।

—এমন অবস্থায় তোমাকে ফেলে—

—এ আমার অভ্যাস আছে ভাই!...ভেবো না, যাও!...

বেরিয়ে এলাম—বাড়ী চলে যাওয়ার জন্যে নয়, মথুরের মুখে সমস্ত ঘটনাটা শোনার উদ্দেশ্যে।

মথুর তখন ঘর-দোর পরিষ্কার করছে। একটা চেয়ার টেনে তার সামনে বসলাম।

মথুর যা বলল তার সংক্ষিপ্ত সারটা এই:

শো-র কাছ থেকে রাত ন-টায় আমি তো বিদায় নিলাম, একটু পরেই হঠাৎ সেই 'দজ্জাল' নি শো-কে ফোনে ডাকল। জানতে চাইল, সু-বাবু এসেছে কি না। শো বলল, আসে নি! নি তা বিশ্বাস করল না, 'মিথ্যা কথা' বলে' নাকি চেঁচাল। তারপর কত কথা কাটাকাটি হল। শো তো রাগ করে ফোন দিল ছেড়ে।

একটু পরে নি এল। কী চেহারা! রুক্ষু মাথা, তেল দেয় না কখনো। ফিরিঙ্গি-মেয়ে হতে সখ। লম্বাটে আট-সাঁট, শক্ত চেহারা। কপালটা বেজায় চওড়া, চোখদুটো এমনি বড় বড়। গায়ে কেমন যেন বোট্‌কা গন্ধ। সে ঘরে থাকলে এ-ঘর থেকে নাক সিঁট্‌কে ওঠে। নোখ্‌গুলো কী রকম সরু করে কাটা!...নখে আবার লাল রঙ।

শো-কে দেখে নিষ্প্রাণভাবে বলল নি:

—একবার এলাম!

—কথায় বুঝি বিশ্বাস হ'ল না?

হেসে বলল শো। নি তার কোনো জবাব দিল না। দ্রুত উঠে এল ঘরে। এ-ঘর সে-ঘর করল নির্লজ্জভাবে। যেন চোর-ধরতে এসেছে, এই ভাব।

মধুর বিনীতভাবে বলল ঃ

—সু-বাবু আজ কদিন হ'ল আর আসেন না।

—তুম্ চুপ রও!

খেঁকিয়ে উঠল নি ঃ

—তোমাকে জিজ্ঞাসা করা হয় নি!

—তা দেখা তো হয়েছে!

শো বলল নীরস গলায়।

—হুঁ!...বুঝেছি! পালিয়েছে!

ক্রুদ্ধ হ'ল শো। একটু পরে ঃ

—আমি বড় ক্লান্ত!

বলল শো।

—তা আপনি যেতে পারেন। সৌজন্য দেখিয়ে সামনে না থাকলেও চলবে!

উত্তর করল নি।

—আমরা এইবার দরজা বন্ধ করবো!

মধুর বলল।

—চুপ্ রও!

চেঁচিয়ে উঠল নি ঃ

—যত সব শয়তান!

—হঠাৎ এ-রকম গালাগাল করছেন কেন?

মধুর বলল।

—ফের কথা?

—দেখুন বাড়ী বয়ে এসে আমার কর্মচারীদের এমন ভাষায় কথা বলাটা অন্যায় হচ্ছে না কি!

—ভারী ন্যায়-অন্যায় জ্ঞান তো দেখছি!...সু-কে প্রশ্রয় দিয়ে সরিয়ে রেখার কূটকৌশলটা খুবই বুঝি ন্যায়সঙ্গত হচ্ছে?

—× × ×

—আর যে মুখে কথাটি নেই!

—আপনি অনুগ্রহ ক'রে এবার যান!

—আগে আসুক সেই 'কালপ্রিট'!...ধরে নিয়ে তবে তো যাবো!... রাত্রিকালে রোজ ষড়যন্ত্র করতে আসে, আমি শুনি নি?

—আপনি তাহ'লে যাবেন না?

—আপাততঃ এখুনি নয়।

—দারোয়ান ডাকতে বাধ্য করছেন শ্রীমতী নি—

—এমনি অভদ্র মেয়েমানুষ তুমি?

—কে অভদ্র বিচার করতে চাই নে। কিন্তু উঠবেন কি না?

—না!

—মথুর! ডাক দারোয়ানকে।

দারোয়ান এসে গেছল ইতিমধ্যেই।...গোলমাল হট্টগোল হ'ল সুরু। রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে কাচের বাসনগুলো ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলতে লাগল নি। একটা মথুরের দিকে ছুঁড়ল। চট্ করে সরে যাওয়ায় বেঁচে গেল মথুর।

মথুরের মাথায় হঠাৎ একটা বুদ্ধি খেলে গেল চকিতে। শো-র শোওয়ার ঘরে এল দ্রুত। ফোন করে' দিল পুলিশে।

ফিরে এল একটু পরেই। দারোয়ান তখনো দাঁড়িয়ে ভাবছে কি করবে।

রণচণ্ডীর মত তখন নাচতে সুরু করেছে নি। চেল্লাচ্ছে দারোয়ানের দিকে চেয়েঃ

—গায়ে যদি হাত দিয়েছ, লাথিয়ে মুখ সিধে করে' দেব শয়তান!

শো কী বলতে যাচ্ছে, এমন সময়—

—ব্যাপার কী!

বলে' সু এসে দাঁড়াল দ্বারপ্রান্তে। অপ্রত্যাশিতভাবে সু-কে আসতে দেখে পাথরের মত নিস্পন্দ হয়ে গেল শো। তারপর হাত-পা তার রাগে হ'ক কি ভয়ে হ'ক কাঁপতে লাগল ঠক ঠক করে।

—তবে যে ভান করছিলে, আসে না সু?

বলে' বাঘিনীর মত লাফিয়ে উঠল 'দজ্জাল' নি। চক্ষের পলকে এগিয়ে এল। শো-র চুলের গুচ্ছ ধরে আচম্বিতে দিল টান। তারপর ধাক্কা মেরে তাকে সবেগে ফেলে দিলে মেঝেতে। দেওয়ালে কপালটা সজোরে ঠুকে যাওয়ায় গেল কেটে। গলগলিয়ে পড়ল রক্ত।

চিৎকার করতে সুরু করল মথুর। দারোয়ান বেগে এগিয়ে এসে নি-র হাতদুটো ধরল চেপে।

সু হতভম্ভ। শো-র কোনো সাড়া নেই।

—মা অজ্ঞান হয়ে গেছে!

বলতে বলতে মথুর ছুটল ডাক্তার আনতে।

হঠাৎ সু-র সম্বিৎ বুঝি ফিরল। নি-র দিকে এগিয়ে এল গম্ভীরভাবে। তারপর নিতান্ত অপ্রত্যাশিতভাবেই পটাপট থাপ্পর মারল তার গালে।

দারোয়ানের হাত ছাড়িয়ে লাফিয়ে উঠল নি। বাঘের মতন পড়ল সু-র ঘাড়ে।

—শয়তান!

বলল চিৎকার করে'।

পুলিশ এল। গোলমাল তখন-ও পুরোদস্তুর চলছে। পুলিশের সামনে নির্ভীক নি আদেশ জারি করল গর্জন করে:

—অ্যারেষ্ট করুন শয়তানকে! মাতাল, লম্পট, ঠক! গায়ে হাত তুলেছে!

ডাক্তার এলেন হন্তদন্ত হয়ে। শো-কে ধরাধরি করে' তোলা হ'ল।... বিছানায় এসে শুইয়ে দিয়ে কপালের রক্তটা বন্ধ করবার চেষ্টা করলেন ডাক্তার।...

পুলিশের তরফ থেকে মথুরের ডাক এল। 'ষ্টেট্‌মেণ্ট' দিতে হল তাকে।

সু ও নি-কে অ্যারেষ্ট করা হল। মথুর তখন:

—সু-বাবু কিন্তু নির্দোষ!

—হোয়াট ডু ইউ মিন বাই ইট্‌?

শেয়ালের মত খেঁকিয়ে উঠল নি:

—ওঁর জন্যেই এত শাস্তি আমার, আর উনি হলেন নির্দোষ?...তা' থাকুন উনি স্ফূর্তি করতে, আর হাজত-বাস করতে যাই আমি!...শয়তান ক-টিকে তৈরী করেছ ভালো...

সু-র দিকে চেয়ে বলল নি।

—স্বীকার করছি আমি-ও দোষী—

বলল সু ধরাগলায়।

—তবু ভালো, ভালোমানুষটির মত স্বীকার করলে সত্যকথাটা। ধন্যবাদ!...তা এতরাত্রে কী করতে এসেছিলে এখানে?...ভজনপুজন করতে নিশ্চয়ই!

সু-কে দেখিয়ে ইন্‌স্‌পেক্টর সাহেব নি-কে জিজ্ঞাসা করলেন:

—আপনি এ-ভদ্রলোকের কে?

—ভাবী স্ত্রী!

ইন্‌স্‌পেক্টর সু-র দিকে তাকালেন। সু বলল:

—কথাটা সত্য!

ইন্‌স্‌পেক্টর তবু হাসলেন। নি ছট্‌ফটিয়ে উঠল ক্রোধে:

—এতে হাসির কি আছে? থানায় নিয়ে যাবেন, চলুন নিয়ে! কিন্তু হাসবেন কেন?

কাচের টুক্‌রো আবর্জনাগুলো সাফ করতে করতে মথুর বিবৃতিটা শেষ করল।

মথুরকে জিজ্ঞাসা করলাম:

—ডাক্তার কি বলে' গেল মথুর ?

—কপাল থেকে রক্ত বেরিয়ে গেছে অনেক। একটা 'ইন্‌জেক্‌সান' দিলেন। বললেন, হয়তো আরো দিতে হবে।...কাল সকালে আসবেন বাবু ? বড় ভয় করছে !

—কিছু ভয় নেই মথুর !

—আপনি আসবেন !...পুলিশ হয়তো আসবে মা-র মুখে ঘটনাটা শুনতে। আসবেন ?

—আচ্ছা—

বলে' সিঁড়ির প্রথম ধাপে পা দিয়েছি—পেছন ফিরে দেখি শো উঠে এসেছে টলতে টলতে।

—এখনো যাও নি !...কত রাত করলে বলো তো !

—তুমি উঠলে কেন ?

—চেকটা দিয়েছ ?

—দিয়েছি !

—বাঁচলুম !

শো দেওয়াল ধরে দাঁড়াল। হঠাৎ ঃ

—মথুর !

—মা !

—একটু ধর্ তো, দাঁড়াতে পারছি না !

তাড়াতাড়ি গিয়ে শো-কে ধরলাম। টলে সে আমার দেহের ওপর হেলান দিল। এ কী, গা পুড়ে যাচ্ছে জ্বরে !

বিছানায় শো-কে শুইয়ে দিয়ে মথুর-কে বললাম ঃ

—আর একবার ডাক্তারকে ডাক মথুর !...এত জ্বর হ'ল কেন ?

মথুর দ্রুত বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

বাড়ি ফিরতে খুবই রাত হ'ল। রাত যে হবে—ফোনে সে-কথা শো-র বাড়ী থেকে জানিয়ে দিয়েছিলাম। রাতে ফেরার কৈফিয়ৎটা অবশ্য ইন্দ্রাসনকে দিতেই হ'ল। বেটা সব জেনেশুনে-ও গেটের পাশে বসে বসে ঢুলছিল।

সকালে দাদুর কাছে গিয়ে রাতের ঘটনাটা সব খুলে বললাম।...দাদু নি-কে চেনেন, নি-র স্বভাবচরিত্র সম্বন্ধে অনেক কথাই তাঁর জানা আছে, সু-কে-ও অবশ্য বিশেষভাবে চেনেন, কিন্তু ভালবাসেন বলে' তার দোষ দেখেন না দৌহিত্রাসক্ত স্নেহান্ধ মাতামহের মত। সু-র জন্যে তিনি প্রত্যক্ষতঃ খানিকটা উদ্বিগ্ন হলেন।...

কলকাতা শহরে দাদুর প্রভাব সর্বত্র। বালিগঞ্জ থানায় দাদুকে দিয়ে ফোন করানোতে আশানুরূপ ফল ফলল। থানায় বিশ্বস্ত একজন লোক পাঠিয়ে শো-র বাড়ীতে এলাম নিশ্চিন্ত হয়ে।

ডাক্তার এসেছেন তখন। পরীক্ষা করছেন। সামনে গিয়ে বসলাম।

শো আমাকে দেখে একটু হাসল। মথুরকে বলল :

—চায়ের বন্দোবস্ত করতে বল মথুর!

—এইমাত্র খেয়ে আসছি!

—তা হ'ক!

—আমার জন্যে-ও একটু হ'ক তাহ'লে! আর্টিষ্টদের চা কেমন একবার টেষ্ট করে যাই!

রসিকতা করলেন ডাক্তার?

—কেমন দেখছেন ডক্টর?

—জ্বরটা সামান্য আছে। ওটা কিছু না। আজ বিকেলেই কমে যাবে।

—কপালের বাঁধনটা কবে খুলবেন?

জিজ্ঞাসা করল শো।

—খুলবো, খুলবো, অত ব্যস্ত কেন ?

একটু থেমে আবার রসিকতা করলেন :

—সুন্দর কপালটায় একটা দাগ হয়ে থাকবে কিন্তু।

—কেন, দাগ মেলানোর কি কোনো উপায় নেই চিকিৎসা-শাস্ত্রে ?

—কেন থাকবে না, আমি এমনি তামাসা করছি মিঃ ব্র।...সামান্য দাগের কথা কি বলছেন, অস্ত্রোপচারের কৌশলে আজকাল কী হয় না তাই জিজ্ঞাসা করুন।

তারপর শো-র দিকে চেয়ে :

—এখন দিন-দুই একটু ওঠা-হাঁটা কম করবেন। বড় দুর্বল হয়ে পড়েছেন।

—সপ্তাহের মধ্যে বেশ সুস্থ হবো তো ?...একটা নূতন বই-এর সুটিং সুরু হবে।

—দু-তিন দিনের মধ্যেই সুস্থ হবেন, ভয় নেই !

চা এল। চা পান করে ডাক্তার উঠলেন। আমি দাঁড়িয়ে উঠলাম তাঁর সম্মানে।

—বসুন মিঃ ব্র ! এখন চলি !

ডাক্তার চলে গেলেন।

—আমি-ও এখন তবে উঠি না ?

—এখনি ?

বলল শো :

—একটু ব'সো !...'কোকো' খাবে একটু ? আমার বয়টা খুব ভালো কোকো করতে পারে।

—বলো করতে !

—মথুর, বয়কে বলে' দু-কাপ কোকো ভালো করে' আন্ তো !

—আনি মা !

মথুর চলে গেল।

—বাড়ীতে কালকের সব কথা বলেছ তো?

—তা' বলতে হয়েছে!

—কি লজ্জার কথা!

—× × ×

—অত রাত্রে বাড়ী ফিরলে...খুব বুকনি খেয়েছ?

—গুরুদেবের আশীর্বাদে বাড়ীতে এখন আমার বিশেষ সুনাম। এখন এক ইন্দ্রাসন ছাড়া কেউ বকতে আসে না।

—ইন্দ্রাসন?

—তোমার যেমন মথুর। তবে মথুর তোমার ছেলেমানুষ ভয় করে তোমাকে। ইন্দ্রাসন আমার দাদুর দাদু, ভয় তাকে করতে হয় রীতিমতো।

বড় মিষ্টি হাসি হাসল শো। কিছুক্ষণ নীরবতা।...শো আমার একখানি হাত হাতের ওপর তুলে' নিল। বললাম:

—বাড়ীর সকলের মতে আমি এখন অতীব সাধু ব্যক্তি এবং সচ্চরিত্র যুবক।

—তুমি তা' নও?

—যদি বলি নই?

—তবে পৃথিবীতে একজন-ও সাধুব্যক্তি নেই বলে' বুঝবো প্রিয়বন্ধু!

আবার নীরবতা নামল ঘরে। শো আমার হাতখানি নিয়ে আনমনে খেলা করতে লাগল বালিকার মত। প্রতিটি আঙুল নিরীক্ষণ করে' করে' দেখতে লাগল অনেকক্ষণ ধরে। হঠাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে:

—হাতের রেখাগুলো কত কম, কত স্পষ্ট!...আমার হাতটা দ্যাখো, কী রকম হিজিবিজি। শাস্ত্রে কি বলে জানো, অনেক রেখা থাকলে অনেক দুঃখ।

—এ-সব বিদ্যে-ও আছে নাকি?

—তোমার নেই?

—না!

—নটি নয়! মিথ্যাকথা বলছ আমার কাছে। তোমার আলমারীতে গাদাখানেক 'অ্যাস্‌ট্রলজি' ও 'পামিষ্ট্রি-র' বই আমি দেখি নি বুঝি ?...

—জানো, অনেকের বাতিক আছে নানাজাতের বই কেনা, সংগ্রহ-করা, কিছু পাঠ-করা নয় ?

—বুঝেছি !...মিথ্যাবাদী কোথাকার !

—এই না বলছিলে আমি পৃথিবীর একজন বিশেষ সাধুব্যক্তি !

—সাধুব্যক্তিরা মিথ্যে বলে' বাহাদুরী-ও করে, এটা-ও বলছি।

মথুর এল কোকো নিয়ে। শো উঠে বসল। মথুরের হাত থেকে কাপদুটো দু-হাতে নিয়ে ডান হাতেরটি আমার হাতে দিল।

খাওয়া শেষ হওয়ার পর-ই ঃ

—বসতে পারছি না ! শুয়ে পড়ি !

বলল শো।

—হ্যাঁ শোও !...আমি এইবার উঠি !...শরীরটা বড় ক্লান্ত মনে হচ্ছে !

—কাল বাবু রাত আড়াইটে পর্যন্ত ছিলেন !

—রাত আড়াইটে পর্যন্ত ? এ্যাঁ ?

—তুমি তো, মা, তখন জ্বরে বেহুঁস। ডাক্তারবাবুর সঙ্গে ঠায় বসে রইলেন।

শো এ-কথার আর জবাব দিল না। চোখ বুজিয়ে পড়ে রইল নিষ্পন্দের মত।

আমি উঠলাম।...বললাম ঃ

—চলি তবে।...সন্ধ্যায় পারি আসবো !...

—× × ×

বেরিয়ে এলাম ঘর থেকে। মথুর এল সঙ্গে সঙ্গে। বলল ঃ

—পুলিশ আসবে না বাবু ? ইনস্‌পেক্‌টারবাবু যে বললেন সকালে এসে মা-র মুখে ঘটনাটা শুনবেন ?

—যাতে শুনতে না চান তার ব্যবস্থা করা-ই ভালো না ?

—শাস্তি দেয়া হবে না ?

—হবে রে হবে !

বলে' মথুরকে সান্ত্বনা দেয়ার চেষ্টা করলাম। মথুর খুব তুষ্ট হ'ল বলে' মনে হ'ল না।

বাড়ী ফিরে এসে দেখি সু এসেছে, তলায় বৈঠকখানা ঘরে মহোৎসাহে গল্প জুড়েছে ফুলের সঙ্গে।

—এখানে কেন সু ?

জিজ্ঞাসা করলাম।

—মহিমময়ী নি ওপরে উঠেছেন, এখন নিচে থাকাই সঙ্গত !

—মুস্কিল হয়েছে !

বলে' বৈঠকখানায় প্রবেশ করলাম হতাশের মত।...সু বলল :

শো কেমন আছে বু ?

—ভালো আছে !...এই মাত্র আসছ ?

—এসেছি খানিকক্ষণ আগে !...তা নি-কে-ও ওরা ছেড়ে দিল কেন ?

—তুমি ছাড়া পাবে, আর নি পাবে না ?

—ওই তো ভুল করলে বন্ধু !...ওই যে খটখটিয়ে নামছেন 'হার ম্যাজেস্‌টি' !

—থামো !...চা-টা এসে খেয়েছ ?

—তা একটু খাওয়ান তো ভালো হয় !

বলতে বলতে বৈঠকখানায় ঢুকল নি :

—ওপরে তো কোনো বন্দোবস্ত দেখলুম না !

—ফুল, ভেতরে যা ! চা দিয়ে যেতে বল !

বললাম তৎক্ষণাৎ। ফুল উঠে গেল।

—আপনার দাদুকে থ্যাঙ্কস্‌ দিতে এসেছিলাম। বৃদ্ধ বারবার আমার উপকার করছেন।...কোথায় গেছলেন ? শো-র কাছে ?

—হ্যাঁ !

—দিস্‌ ইজ্‌ লাভ্‌ আই সুড্‌ সে, তোমার সু এটা দেখে শিক্ষা করা উচিত।...তা শো-র বরাত ভালো।...খুব বুদ্ধিমতী...দেখেশুনেই পাত্র চেঞ্জ করেছে।...সু-র তুলনায় আপনি তো রাজামানুষ। বাড়ী তো নয়, রাজপ্রাসাদ, মনে আছে বাল্যকালে একবার এসেছিলাম আপনার এখানে ?

—মনে আছে।

—আপনার মাতামহের তো ছেলে নেই শুনেছি। মা-ই একমাত্র সন্তান !...তবে তো সমস্ত সম্পত্তি-ই আপনার ?

—× × ×

—আপনার ভাই-টাই আছে ?

—আছে একজন !

—ওই একটা ফ্যাসাদ। তা' এত সম্পত্তি আছে যে ভাগ করে নিলে-ও অগাধ, কী বলেন ?...শো খুবই বুদ্ধিমতী।

নির্লজ্জ এই মেয়েমানুষটার হাত থেকে রক্ষা পেলে বাঁচি !

—চা আনতে বড্ড দেরী করছে তো !

বলে উঠলাম। সু খবরের কাগজে মুখ ডুবিয়ে মনে হ'ল বেশ মজা করছে। নি বলল তাকে :

—তোমার রাগ কি এখনো পড়লো না সু ?

—× × ×

—এখন কোনদিকে যাবে ?

—এখানেই থাকবো !

—তাহলে একটা ট্যাক্সী ডেকে দাও, প্লিজ।...উঃ কাল সারারাত যম-যাতনা গেছে। এক মুহূর্ত ঘুম হয় নি।...তোমার হয়েছিল ?

—হয়েছিল !

—তুমি এখনো কালকের ঘটনা মনে রেখেছ দেখছি। লেট্‌ আস ফরগিভ্‌ এণ্ড ফরগেট্‌।...সন্ধ্যের আসছ তো ?

—না।

—না কেন ?

চা এল, তিন কাপ। ছ-স্লাইস পাঁউরুটি। বললাম :

—আমার জন্য চা আনলি কেন যোগীন্দ্র ?...এখন আর খাবো না !

—চায়ে তোমার অরুচি ?

বলল সু।

—শো-র ওখানে চা খেয়েছি ! কোকো খেয়েছি !

—শো খুব বুদ্ধিমতী !

বলল নি।...চা শেষ করে' তারপর :

—অশেষ ধন্যবাদ ! একদিন আসবেন আমার বাসায় ! নিমন্ত্রণ করে' গেলাম !

সু আমার মুখের দিকে তাকাল।

—ভয় নেই !

বলল নির্লজ্জ নি :

—শো-র কাছ থেকে আপনাকে কেড়ে নেবো না !

তারপর সু-কে :

—কই চলো, একটা ট্যাক্সী ডেকে দাও !

সু উঠছে না দেখে আমি-ই উঠলাম।

—চলুন, আমি-ই যাচ্ছি !

—মোর শিভাল্‌রাস্‌ আপনি !...ধন্যবাদ !

বিদায় নিল নি। মেয়েজাতিকে আমি শ্রদ্ধা করি, কিন্তু যে-মেয়ের ছবি দেখলাম, তাতে শ্রদ্ধা বুঝি আর থাকে না। মনে পড়ল নি-র বালিকাবয়সের সরল চঞ্চল রূপটা। কী ছিল, কী হয়েছে। বড় কষ্ট হ'ল। অত্যন্ত বিষন্ন গাম্ভীর্যে আচ্ছন্ন হ'ল মন।

বৈঠকখানায় এসে বসলাম।

—বিদায় হয়েছে পাপিষ্ঠা ?

সু বলল হাঁফ ছেড়ে।...এ-কথার কোনো জবাব না দিলে-ও চলে বলে' চুপ করেই রইলাম। সু বলল :

—কী ভাবছ হে দার্শনিক ?

—এই নি, জীবনীশক্তির কত চাঞ্চল্য এর মধ্যে, ভাবছি—একটু সংযমশিক্ষা, একটু মার্জিতরুচির আস্বাদ যদি পেত, হয়তো একজন উচ্চস্তরের সামাজিক মহিলা-ই বা হয়ে উঠত !...অনেকবার ভেবেছি, সু, শো-র ভালবাসা পেয়েও নি-র প্রতি তোমার আকর্ষণ কেন ?...নি-কে দেখে আজ তার ঠিকানা মিললো।

— × × ×

—নি-র মতই তুমি চঞ্চল, তুমি অসংযমী। শম-সাধনার আনন্দ নেই তোমার চরিত্রে। তুমি যে এটা পছন্দ করো তা নয়, কিন্তু জেনেও জানো না—যা পছন্দ করো না, তুমি নিজে তা-ই-ই। আর সেই কারণেই নি-কে একদা তোমার মনে হয়েছে বড় জীবন্ত চরিত্র, আর নি-ও তোমার মধ্যে খুঁজে পেয়েছিল বাস্তব একজন পুরুষপ্রাণকে।

—নি তাহ'লে আমার ব্যাংক ব্যালেন্সে কোনো আনন্দ খুঁজে পায় নি বলো !

—এটা জেনে-ও যে তুমি নি-র দ্বারে যাও তার কারণ শুধু শো-র ওপর অভিমান নয়, কিংবা আমার ওপর তোমার সন্দেহ নয়, সু।

—তোমার ওপর সন্দেহের কথাটা আবার তুলছ কেন ? এর জন্যে কতবার নিজেকে গুলি মারতে গেছি জানো ?

—না জানলেও অনুমান করতে পারি সু ! কিন্তু পারি কেন জানো ? ভালোবাসি বলে'।...নি-র চাঞ্চল্যে তুমি লুব্ধ, তার ভোগবিলাসের উন্মত্ত বিকারে তুমি চঞ্চল, কিন্তু ভালো বাসো নি, তাই পাপিষ্ঠা বলে' পালাতে-ও চাও, আবার বরিষ্ঠা বলে' হাত-ও বাড়াও।...বন্ধু, সংসারে নি যদি পাপিষ্ঠা, তবে তুমি-ও—

—আলবৎ পাপিষ্ঠ !

—নি-র সঙ্গে তোমার তফাৎ এইখানে—নি এটা বলে না, বোধ করি স্বীকার-ও করে না, তুমি করো, তুমি বলো-ও। কিন্তু জানো কি—এর কারণটা হচ্ছে এই : সংযত না হলে-ও সংযত জীবনের ধারণাটা তোমার

আছে, আর এ-ধারণাটা তোমার পুষ্পিত হয়েছে শো-র প্রেমে, শো-র ধৈর্যসংযমে ?

—কে অস্বীকার করছে ?

—শো-কে যে ভালবেসেছ, তার জন্যে অনেক ত্যাগ স্বীকার করেছ, তার কারণ কি এই নয়, যে, প্রেমের সাধনায় উচ্চবৃত্তিগুলি জাগিয়ে দিয়ে তোমাকে মানুষ করতে সে চেয়েছে ?

—× × ×

—বন্ধু, তোমার শো আছে, একদিন তোমার মুক্তি হবে ! কিন্তু বেচারা নি, এ-জন্মে বোধ হয় তার মুক্তি নেই !

—হঠাৎ তোমার নি-প্রীতি জেগে উঠল কেন সন্ন্যাসী ?

—শুধু নি নয় ভাই, নি-জাতীয়া সকল মেয়ের জন্যেই আমার দুঃখ।... জীবনের অপব্যয় আমি সহ্য করতে পারি নে !

—না পারো প্রবন্ধ লেখো, সাহিত্য করো—মনটা হাল্কা হয়ে যাবে ! আপাততঃ এখন তোমার এ-দুঃখতত্ত্ব থামাও !

—থামাও বললে-ই যদি থামতো, তবে তো দুঃখই ছিল না সু ! এ যেন কেবলি, কেবলি আমাকে ভাবায়, জ্বালায়, পাগল করে !

—পাগলদের কাছে তবে থেকে লাভ নেই। আপাততঃ পালাই।... তা' শো-কে বেশ ভালোই দেখে এলে তো ?

—হ্যাঁ। ইচ্ছা হয়, যাও না একবার ! দেখে এসো !

—আমি যাবো ?

—অবাক করলে !

—তুমি যদি সঙ্গে নিয়ে চলো, যাই !

—× × ×

—রাত জেগে শরীরটা ভালো নেই সু !...কাল রাত আড়াইটের ফিরেছি !...একটু ঘুমুতে পারলে—

—আরে এতক্ষণ তা বলো নি !...

সু উঠে দাঁড়াল।

—যাও, যাও !...একটু ঘুমিয়ে নাও গে !

বলে, বেরিয়ে পড়ল সু ঘর থেকে। হঠাৎ ফিরে আবার :

—গুরুটুরুর সঙ্গে এখনি যেন তত্ত্ব-ফত্ত্ব করতে যেয়ো না !...সন্ধ্যের এসে যেন শুনি একটু ঘুমিয়ে নিয়েছ !...বুঝলে ?

—হ্যাঁ !

সত্যি একটু ঘুমুনো দরকার! বড় ক্লান্ত মনে হচ্ছে। ঘরে এসে শুয়েই পড়লাম। কিন্তু ঘুম এল না। নানা চিন্তায় আন্দোলিত হ'ল মন। তামসিক এক প্রকার অস্বস্তির বেদনা অনুভব করলাম তীব্রভাবে।

ঘুমোবার চেষ্টা করলাম জোর করে'।...কিন্তু বৃথা চেষ্টা : কতক্ষণ মনকে চোখ ঠারবো? কতক্ষণ দমিয়ে রাখব হৃদয়ের তরঙ্গবেগ? ঈশ্বর জানেন, অন্তরে বাহিরে আমি বন্ধুই হতে চাই, কিন্তু 'চাওয়াটার' মত 'হওয়াটাও' যদি সহজ হ'ত !...গৃহীপুরুষের পক্ষে নারীর বন্ধু হওয়া কি সহজ? অন্তরে-বাহিরে অ-কাম অ-সংসারী যে নয়, বন্ধু-সাধনা তার পক্ষে কি কখনো সম্ভব? যত দিন যাচ্ছে, বুঝতে যেন পারছি, বন্ধুর দর্শনে 'দমন' একটা কথার কথা মাত্র, 'উচ্ছেদে'র নির্মম তপস্যাই সর্বাংশে সত্য।

হয়তো সত্য কিন্তু সহজ কি, সম্ভব কি? আর সম্ভব যা নয়, জীবনে তার মূল্যই বা কতটুকু?

ঘুম হ'ল না। উঠে এলাম গুরুদেবের ঘরে। অদৃষ্ট ভালো, লোকজন সব উঠে গেছে। শুধু মা আছেন, আছেন স্বামী আত্মানন্দ।

প্রণামান্তে গুরুদেবের পায়ের কাছে বসলাম। বললাম :

—আজ কতকগুলি প্রশ্নের উত্তর চাই গুরুদেব !

গুরুদেব আত্মানন্দের দিকে চেয়ে একটু হাসলেন।

মা বললেন :

—এই তো এতক্ষণ ধরে নানাজনে নানা প্রশ্ন করে' গুরুদেবকে জ্বালিয়ে গেল, একটু বিশ্রাম দিবি না খোকা?

আত্মানন্দ কাগজ-পেনসিল নিয়ে বসেছেন। বুঝলাম গুরুদেব আজ আমার প্রতি করুণা করেছেন। অনেক কথা বলবেন।...এ-কয়দিন লক্ষ্য করছি গুরুদেব কবে, কখন বিশেষ কিছু বলবেন স্বামীজি আগে থাকতেই কেমন করে' তা' যেন জানতে পারেন, গুরুবাণীগুলি হুবহু তুলে' নেয়ার জন্যে কাগজ পেনসিল নিয়ে তখন প্রস্তুত হয়ে বসেন।

জিজ্ঞাসা করলাম :

—পুরুষ কি যথার্থভাবে নারীর বন্ধু হতে পারে গুরুদেব ?

—হতে পারে বলছ কেন, পুরুষ-ই তো নারীর যথার্থ বন্ধু। প্রকৃতি পুরুষ ছাড়া আর কাকে বন্ধু বলে' জানে বৎস ?

বোধ হয় মনের ভাবটা বোঝাতে পারি নি। বললাম স্পষ্ট করে :

—ধরুন, সংসারজীবনে কোনো এক নারীকে বন্ধু হিসাবেই পেতে চাইলাম, মা নয়, মেয়ে নয়, বোন নয়, স্ত্রী নয়, প্রণয়িনী নয়—বন্ধু হিসাবে, এ কি সম্ভব ?

—স্বভাব থেকে,—প্রকৃতি থেকে উত্তীর্ণ হতে পারলে অবশ্যই তা' সম্ভব।

—তাহ'লে সংসারীজীবনে সম্ভব-ই নয়, এই তো বলছেন ?

—তা কেন বলবো বৎস ? সংসারীগৃহীরাই তো সাধনার বলে ক্রমশঃ সংসারের উত্তরে স্বপ্নস্বর্গে সরতে পারে, সরে-ও থাকে।...প্রকৃতির গর্ভান্ধকারে ভ্রূণরূপে পড়ে থাকা তো জন্ম নয়, মোহ-গর্ভের বেষ্টনী থেকে মুক্তি পেয়ে ভূমিষ্ঠ হওয়াই জন্ম। মা আমার মিথ্যাভূতা কখন ? যখন আমি নবচেতনায় জন্মলাভ করি নি। জন্ম যেই হল, অমনি দেখলুম—মা আমার ব্রহ্মভূতা সনাতনী। তখনি বুঝলুম, আমি প্রকৃতির সন্তান এটা একটা সাধারণবোধ্য পরিচয় বটে, কিন্তু আসলে আমি যে ব্রহ্মময়ীর সন্তান এটাই আমার সত্যকার পরিচয় !

নাঃ, গুরুদেবকে আমার সমস্যার কথা বোধ হয় বোঝাতে পারলাম না, কিংবা গুরুদেব বুঝলেন না আমাকে।

অন্য কথা উত্থাপন করলাম :

—নবচেতনায় জন্মলাভ করলে তবে তো বুঝবো আমি ব্রহ্মময়ীর সন্তান? কবে কী ভাবে সে-জন্ম লাভ করবো গুরুদেব?

মা অসহায়ভাবে আমার দিকে তাকালেন। গুরুদেব নীরব হয়ে রইলেন অনেকক্ষণ।...মায়ের দিকে চেয়ে একটু ইতস্ততঃ করে' ধীরে ধীরে বললাম:

—আমি কি দীক্ষা নেয়ার উপযুক্ত গুরুদেব?

—অবশ্যই! সর্বোত্তম পাত্র তুমি!

—আমাকে দীক্ষা দিন নবজন্মে!

—সংসারীর দীক্ষা তো?

গুরুদেবের এই আকস্মিক প্রশ্নটির অর্থোদ্ধার করতে পারলাম না। জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চেয়ে রইলাম তাঁর মুখের দিকে। বললেন তিনি আত্মগতভাবে:

—সন্ন্যাসীর দীক্ষা সংসারীরা সইতে পারে না বৎস!

কি মনে হল, হঠাৎ বলে' ফেললাম:

—সংসারী হতে আমার সাধ নেই গুরুদেব!

—রসাবেশের মোহে এটা তোমার মনে হচ্ছে বৎস!...সাধারণ গৃহীদের মত সংসারে থাকতে চাও না বলেই মনে করছ তুমি সংসারী নও!...শুনেছি তুমি শিল্পী, নামকরা শিল্পী! তোমার সংসার শিল্পের সংসার।...এ-সংসারের সংসারী হতে কি সাধ নেই?

— × × ×

—তবেই বোঝ, তোমার দীক্ষা সংসারীর দীক্ষা। সে-দীক্ষা তোমার হয়ে গেছে বৎস। এখন আদর্শে নিষ্ঠা রেখে অগ্রসর হও, জয় পাবে!

—লোকজীবনে জয় পেয়ে কী হবে গুরুদেব?

—পেয়েছ কিছু, আরো পাচ্ছ, তাই পাওয়ার আনন্দটিকে মর্যাদা দিচ্ছ না। না-পেলে বুঝতে এই জয়টুকুর জন্যেই ইহজীবন, ইহপৃথিবী!

—কিন্তু সত্যকথা বলছি গুরুদেব, কিছুতেই আমার লোভ নেই!

—ওটা-ও তোমার রসাবেশের মোহ।...আছে বৎস! নইলে আমার কাছে ছুটে-আসার কোনো প্রয়োজনই হ'ত না!

চমকে উঠলাম। লজ্জা হ'ল, গুরুদেবের কাছে নিজেরি অজ্ঞাতে আত্মগোপন করতে গেছি বলে'।...আছে, লোভ আছে, কামনা আছে, প্রতারণা আছে, আত্মপ্রতারণা আছে। ...নিত্যচঞ্চল আমার পুরুষমন অপ্রাপনীয়া নারীর অভিমুখে অহরহ যে অগ্রসর হতে চাইছে—তা কি নিষ্কাম বন্ধুপ্রেমের অহেতুক তপশ্চর্যা? তা কি চিরাচরিত সেই নারীপুরুষের গতানুগতিক হৃদয়াবেগ নয়?

গুরুদেবের মুখের দিকে ভয়ে ভয়ে তাকালাম। স্নেহমধুর সৌজন্যে হাস্য করলেন তিনি। বললেন:

—মানুষের জীবনে চাওয়া-পাওয়ার দ্বন্দ্ব থাকেই। তুমি শিল্পী, তোমার তো থাকবেই! তা যদি না থাকে তবে তো তুমি শিল্পী-ই নও!

—চিরটা কাল কি চাওয়া-পাওয়ার দ্বন্দ্ব-দোলায় দোল খাবো? মুক্তি পাবো না?

—মুক্তি কাকে বলো বৎস? শিল্পীর মুক্তি আর সন্ন্যাসীর মুক্তি এক নয়। শিল্পী চায় রূপজীবনের প্রকাশ—এই প্রকাশেই তার মুক্তি। সন্ন্যাসী চায় ব্রহ্মস্বরূপে ব্রহ্মত্ব—এই ব্রাহ্মীস্থিতিতেই তার মুক্তি। শিল্পী টলে, আর টলাতেই তাঁর প্রেরণা, সন্ন্যাসী টলে না এবং না-টলাতেই তাঁর সিদ্ধি।

—অভয় দেন তো প্রশ্ন করি গুরুদেব!

—নির্ভয়ে বলো বৎস!

—আপনি কি কিছুতেই টলেন না?

মা আমার অর্বাচীনতায় একটু বিরক্ত হলেন বলে' মনে হল। স্বামী আত্মানন্দ কিন্তু হাসলেন।

গুরুদেব বললেন:

—দেহটা প্রকৃতির অধীন, টলে। মনটা প্রকৃতির অধীন হলে টলে—আত্মার অধীন হলে টলে না।...আত্মা-ই পুরুষার্থ। পূর্ণব্রহ্ম। সন্ন্যাসীর আদর্শ এই ব্রহ্ম।

—যদি বলি ব্রহ্মে কি প্রয়োজন? ব্রহ্ম জানি বা না জানি, কী আসে যায় তাতে?

—সংসারের চলতিজীবনে, মনে হয়, যেন কিছুই আসে যায় না। বুদ্ধিমানেরা তো এই কথাই বলে'।

গুরুদেব একটু হাসলেন এই বলে'। তারপর ঃ

—প্রয়োজন সকলের সমান নয় সৌম্য। জানবার বিষয় বা ইচ্ছাও সকলের এক নয়। ধরো, 'ইথার' আছে কি নেই এ নিয়ে কার কবে কতটা মাথা ব্যথা হয়? ইথার যে আছে ক্ষুৎ-পিপাসার জীবনে তুমি-আমি নাই-বা জানলাম, যার জানবার সে কিন্তু ঠিক জানছে, জেনে নিয়ে তার জ্ঞানের সম্ভার বৃহৎসংসারের জন্যে যথাসময়ে দান করে' যাচ্ছে।...বৈজ্ঞানিকদের কাছে আজ যখন আমরা ইথারের দান দু-হাত পেতে নিচ্ছি তখন বুঝতে পাচ্ছি এটা থেকে আমাদের কী হয়েছে, এবং কী প্রয়োজন সাধিত হচ্ছে এর দ্বারা।

—× × ×

—মানুষ যেটি চায় সেটিই তার কাছে সত্য। তোমার কাছে যা সত্য, তাই তুমি জানো, তুমি মানো।...তুমি যেমন, তোমার চাওয়া তেমন, তোমার পাওয়াও কতকটা সেই ধরণের। ঈশ্বর যদি না চাও, ঈশ্বর তোমার কাছে সত্য নয়। নাস্তিক্য আর কী, তুমি যেটি বিশ্বাস করো, সেটির সমর্থনে সমস্ত কিছুকে দম্ভের সঙ্গে অস্বীকার করাটাই তো নাস্তিক্য।...পৃথিবীতে হিংসাদ্বেষ আছে, পাপ আছে, প্রবঞ্চনা আছে, সবাই জানে। কেউ যদি বলে যা আছে, যা প্রত্যক্ষ—তাই সত্য, তাহ'লে তর্ক করা কি সঙ্গত? তর্ক বৃথা। হিংসা-দ্বেষাচ্ছন্ন এই পৃথিবীতে প্রেমস্বরূপের প্রয়োজন কি, এ যদি কেউ বলে প্রেমের ব্যবহারিক সাধনার দ্বারা-ই তার উত্তর দেয়া সমীচীন। তর্কের দ্বারা নয়।

—তবে তো পথ পেলাম ঃ প্রেমের আনন্দসাধনায় নিত্য সমাধিস্থ থাকা-ই পুরুষার্থ। তাই-ই মুক্তি।

—আনন্দসাধনায় নিত্য সমাধিস্থ থাকা কর্মের পৃথিবীতে বড় সহজ কথা নয় বৎস।...তোমার আমার জীবনে এটা বড় কঠিন।

—আমার জীবনের সঙ্গে আপনার জীবনটিকে একত্র করে' এমন ভাষায় কেন কথা বলছেন গুরুদেব?

—কেন বলবো না সৌম্য? তোমার মত আমরাও কর্মী, দেশকর্মী, সমাজকর্মী। দেশের চিত্তশুদ্ধি ও সংস্কারশুদ্ধির প্রয়োজনে আমাদের জন্ম। কবি, শিল্পী ও লোকশিক্ষকদের মত আমাদেরো সংসার আছে, সন্ন্যাসীর সংসার। আমাদেরো এ-দেশ ও দেশ ঘুরতে হয়, আঘাত পেতে হয়, পতনে স্খলনে প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়, ভালোমন্দ বিচার করে চলতে হয়। সন্ন্যাস আমাদের আদর্শ, আমরা সন্ন্যাসসাধক, পূর্ণ সন্ন্যাসী নই।

—পূর্ণ সন্ন্যাসী তবে কে গুরুদেব?

—ঈশ্বর-ও নন সন্ন্যাসী। তিনি সন্ন্যাসপথের অধিযাত্রী কর্মসাধক ব্রহ্মেশ্বর। ব্রহ্মই একমাত্র সন্ন্যাসী। তিনি-ই পরম পুরুষ। পূর্ণ। অবতারেরা পূর্ণাভিমুখী চেতনসত্তা মাত্র। সংসারালোকে প্রকৃত প্রস্তাবে সন্ন্যাসী হওয়া যায় না বৎস, কর্মবন্ধন ছিন্ন করার উদ্দেশ্যে নিষ্কাম কর্মের দ্বারা সন্ন্যাস সাধনাই এখানে করা চলে। বুদ্ধ, শংকর, চৈতন্য, নানক, কবীর, দয়ানন্দ, ভাস্করানন্দ, প্রভৃতি মহাপুরুষবৃন্দ লোকসমাজে যাঁরা সন্ন্যাসী নামেই পরিচিত তাঁরাও কর্মসাধক, বিশ্বতপোবনের কর্মযজ্ঞে বিধাতৃ প্রেরিত তাঁরা মহান ঋত্বিক, বিশ্বমানসের মালিন্য মোছাতে তাঁদের আবির্ভাব!

—সমাজমানসের মালিন্য মোছানোই তবে সাধকের কর্ম!

—ঠিক ধরেছ সৌম্য।

—আমাদের সেই কর্ম দিন তবে!

—অধিকারানুসারে তুমি তা' পেয়েছ। তিনি দিয়েছেন। এখন তাঁর দানের মর্যাদা রক্ষা করো, এই আমার আশীর্বাদ।

—কিন্তু রক্ষা করতে বোধ হয় পারছি না গুরুদেব!

—দ্বন্দ্ব সুরু হয়েছে তোমার জীবনে। দ্বন্দ্বকে ভোগের পথে নামিয়ে নিস্তেজ হতে যেয়ো না, কিংবা যোগের পথে তুলে সমাজকর্ম থেকে পলাতক হতে চেয়ো না।

কথাগুলিকে স্পষ্টতর করে' নেয়ার জন্যে আরো কি যেন প্রশ্ন করতে যাচ্ছি, ফুল এল ছুটতে ছুটতে। বলল?

—বড়দা, ফোন এসেছে। সু-দাদা ডাকছে!

—তুমি ধরো গে!

—ধরেছি তো, বললে ডেকে দিতে!

—বলে দে বড় ব্যস্ত!

—বললুম তো। বললে, বড্ড দরকার!

—যাও বৎস! উপেক্ষা করো না কারুকে!

—গুরুদেবের পায়ের ধূলো নিয়ে ঘরে এলাম। সু-র কণ্ঠস্বর কানে ভেসে এল।

—বৃ এসেছ?

—হ্যাঁ!

—শো-র বাড়ী গেছলাম...এই আসছি!

—এই জানাতে এত তাড়াহুড়ো?...কৌতুক জাগল, বিরক্ত-ও হলাম যেন। মনের ভাব চেপে রেখে' হেসে বললাম:

—ভালোই করেছ! বিরোধটা মিটে গেছে তো?

—×

—কি হে!

—তুমি একবার আসবে বৃ...বড় দরকার!

—এখনি?

—তুমি বড় ক্লান্ত, আমি জানি। বোধ হয় একটু-ও শোও নি বা শুতে পারো নি!...খাওয়া হয়েছে?

—না!

—আচ্ছা খাওয়ার পর একটু বিশ্রাম করে' বৈকালের দিকেই এসো!...এসো ভাই...

—কি ব্যাপার?

—× × ×

—হ্যালো!

—হ্যাঁ!...বৃ, আমার মাথাটা কেমন করছে...কিছু বলতে পারছি না

আমি বোধ হয় আত্মহত্যা করবো!...তুমি এখনি একবার এসো ভাই। বাঁচাও আমাকে...আসবে কি?

—আসছি!

এলাম দারুণ দুশ্চিন্তা নিয়ে। ঝড়ের বেগে এসে প্রবেশ করলাম সু-র ঘরে। শুয়ে আছে সু। বিবর্ণ, বিষণ্ণ তার মুখ। আমাকে দেখেই :

—শো আমাকে সত্যসত্যই ত্যাগ করলো ব্‌!

—তুমি একটি পাগল! মতিচ্ছন্ন! তোমার পাল্লায় পড়ে আমি-ও পাগল হবো বোধ হয়!

সু্‌ আমার হাতদুখানি হাতের মধ্যে নিয়ে চোখ বুজিয়ে পড়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর অত্যন্ত অসহায় স্বরে :

—তোমার কাছ থেকে বাড়ী ফিরে শো-র চিঠিখানি পেলাম। সম্পর্ক ছিন্ন-করার চিঠি। কাল দুপুরেই চিঠিখানি আমার ঠিকানায় পোষ্ট করেছিল। চিঠিতে লিখেছে, আমার সমস্ত ঋণ সে পরিশোধ করবে, আমি যেন তাকে মুক্তি দিই।...বুঝতে পারছি, চিঠি পোষ্ট করার পর-ই সন্ধ্যায় সে তোমাকে চেকখানি দিয়েছিল।...

মনে পড়ল অসুস্থ শরীরেই উঠে এসে শো কাল রাত্রেই চেকটা দিয়েছি কি না ব্যাগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করেছিল; এবং 'দিয়েছি'—এ-কথা জানাতে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বলেছিল : বাঁচলাম!...

বলল সু্‌ :

—চিঠি পেয়ে মনটা বড় খারাপ হয়ে গেল। দেখবে সে-চিঠি?

— × × ×

—দ্যাখো!

বলে মাথার বালিসের তলা থেকে চিঠিখানি বার করল। সুদীর্ঘ চিঠি, পাঁচছয় পৃষ্ঠা ব্যাপী।

চিঠিখানি আমার হাতে দিয়ে মৃতের মত নিস্তব্ধ হয়ে শুয়ে রইল সু্‌। পড়তে সুরু করলাম :

তোমাকে এইভাবের চিঠি কোনদিন লিখতে হবে স্বপ্নে-ও কখন আমি ভাবি নি।...তোমাকে বন্ধুরূপে, প্রিয়রূপে, সহায়করূপে লাভ করে' সত্যসত্যই আমি নিশ্চিন্ত হয়েছিলাম। ভেবেছিলাম নোঙরবিহীন নৌকাখানি এতদিনে বুঝি কূল পেল অকূল-সমুদ্রে।

নানা ভাগ্যবিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে আমাকে আসতে হয়েছে, তুমি জানো!... জীবনে শান্তি চেয়েছি, মুহূর্তের জন্য-ও বোধ হয় পাই নি। সুদূর শৈশবকাল থেকেই বিনাদোষে আমি স্বামিপরিত্যক্তা, কৈশোরে তারপর ভালবেসেছিলাম আর একজনকে, সে ছিল আমার সুরের গুরু, আমার গানের মাষ্টার। ঈশ্বর তাঁকে অকালে কোলে তুলে নিলেন, তা যদি না নিতেন তবে হয়তো সিনেমার বিড়ম্বিত জীবনে আমাকে আসতেই হত না!...

প্রাণভরে ভালবাসতাম আমার সুরের গুরুকে, মনে মনে জানতাম সত্যকার বিবাহ হয়েছে আমার তাঁরি সঙ্গে। কিন্তু আমার অভিভাবকরা তা জানতেন না, পুনর্বার আমার বিবাহের উদ্যোগ করলেন। আবার একটা প্রহসনের নায়িকা হতে আমার সাধ ছিল না, গুরুর নাম নিয়ে দেশ ছেড়ে এলাম পালিয়ে।...

কেন যে এই সমস্ত পুরাতন কথা আবার ব্যাকুলভাবে আমার মনে পড়ছে, কেন-ই বা তোমাকে শোনাতে চাইছি নূতন করে'—আমি জানি না। এ-সব কথা একাধিকবার তোমাকে শুনিয়েছি, তুমি দুঃখ পেয়েছ অনেক সময়, কৌতুক-ও করেছ কখনো-বা। বলেছ, ভাগ্যে তুমি এসেছ পালিয়ে, নইলে এ-অভাগ্যের কী দশা হ'তো দ্যাখো ভেবে।...

ঈশ্বর আমাকে রূপ দিয়েছেন, গুরু দিয়েছেন সুর ও স্বপ্ন, নগণ্যের মত আমি পড়ে থাকবো না, করলাম পণ। কলকাতায় এক আত্মীয়ের বাড়ীতে কিছুদিন থাকার পর সিনেমারাজ্যে প্রবেশ-করার সুযোগ হল, বলা ভালো, সুযোগ আমি-ই করে' নিলাম নিতান্ত একটা অসহায় অবস্থা থেকে রক্ষা পাবার উদ্দেশ্যে।...সিনেমার প্রথম ছবিতেই সুনাম হল, লোকে জানল, প্রতিষ্ঠার পথে আমি অগ্রসর হলাম। কিন্তু আমি তো জানি—এ

অগ্রগতির গোপন তাৎপর্য কী। আমি তো জানি—রূপ, যৌবন ও যশের টানে বা কারা এল আমার জীবনে, আলোকলুব্ধ পতঙ্গের ছুট ফুটিয়ে মরল নিশিদিন।

অনেক পতন ও স্খলনের মধ্য দিয়ে আমাকে উঠে আসতে হ'ল। অবস্থা দুর্বিপাকে যা চাই না, তা-ও হ'ল জীবনে। এমনি এক সময়ে তুমি এলে। এলে আমার ছবির অ্যাড্‌মায়ারার হয়ে। মনে হ'ল তোমার মধ্যে দেখলাম আমার প্রেমিককে। নানাপ্রকার তিক্ত অভিজ্ঞতার ফলে আমি বুঝেছিলাম, এমন একজন মোহকঠিন শক্ত অভিভাবক পুরুষের আমার প্রয়োজন, যে আমাকে আন্তরিকভাবে ভালবাসবে, প্রেমিকের মত শাসন করবে, আপন যৌবনতেজের উদ্দীপনায় প্রতিদ্বন্দ্বিকল্প অমানুষদের দূরে হঠিয়ে দিয়ে আমাকে শান্ত নিভৃতির মধ্যে হাঁফ ছাড়বার খানিকটা অবসর দেবে। মনে হ'ল তোমার মধ্যেই পেলাম সেই অভিভাবক বন্ধুটিকে।

এতে অবশ্য লোকদৃষ্টিতে আমার ভালই হল। প্রতিদ্বন্দ্বী-মেয়েশিল্পীরা আড়ালে বলে' বেড়ালো, আমার উন্নতি-ই হ'ল। তুমি ধনীর সন্তান, অগাধ সম্পত্তির একচ্ছত্র মালিক। বিনা পরিশ্রমে একাধিক ব্যবসায়ের মোটা মুনাফা পাও ঘরে বসে'। তোমাকে হাত করে' আমি নাকি খুবই বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছি।

মেয়ে-শিল্পীদের হিংসা বা ঈর্ষাকে দোষ-ই বা দেব কেন? চাই নি কিছু-ই, তবু না-চাইতে-ও তুমি তো আমার করেছ-ও অনেক।...প্রেমের আতিশয্যে দু-হাতে তুমি আমার জন্যে টাকা খরচ করতে সুরু করলে। মানা তেমোকে কত করেছি, কেউ না জানুক, তুমি জানো।...তুমি আমার নাম ও প্রতিষ্ঠার পথে অহরহ সহায়তা করলে, আমার উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা করলে, আমার বাড়ী তৈরী করে দিলে নিজে দাঁড়িয়ে থেকে, নিজের টাকায় গাড়ী কিনেছি বলে' দুঃখ প্রকাশ করলে ছেলেমানুষের মত!

তোমাকে সত্যসত্যই, সু, বড় ভালো লাগলো। সত্যসত্যই তোমাকে ভালবাসলাম। ইতিপূর্বে মদ তুমি খেতে, আমার কথায় মদ করলে ত্যাগ, আমার শাসনের মর্যাদা রেখে যার-তার বাড়ী যাওয়া-ও করলে পরিহার।

বুঝলাম, তুমি এমন একজন পুরুষ, যে আমাকেই চায়, আমাকে মানে, আমাকে আগলাতে পারে নানা বিপদ ও বিপত্তি থেকে, শুধু তোষণে নয়, শাসনে-ও আমাকে স্তব্ধ রাখতে পারে একনিষ্ঠার সংযমে।

তখন—

কেউ না জানুক, তুমি জানো, মনে মনে তোমাকে স্বামী বলে' মানলাম। এবং মনে-ও বোধ হয় আছে তোমার, কালীঘাটের মন্ত্রপুতঃ দু-গাছি মাল্য এনে একদিন জ্যোৎস্নারাত্রে আমরা পরস্পর পরস্পরের গলায় বিনিময় করলাম আনন্দে। হেসে বললাম: গন্ধর্বমতে বিবাহটা-ও সত্যকার বিবাহ সু। শাস্ত্রে এ-বিবাহের-ও সমর্থন আছে। তুমি আমার হাত-দুখানি ধরে আবেগভরে বললে: তবে ডাকো আমাকে প্রিয় বলে!...চাঁদের দিকে চেয়ে, সাক্ষী করে তাকে, আমি তোমাকে প্রিয় নামে সম্বোধন করলাম।...মনে আছে—স্বামী বলে' পায়ে একবার হাত-ও দিয়েছিলাম?

বেশ তো ছিলাম। কেউ জানে না, সতীনারীর গৃহস্থ পবিত্রতা নিয়ে বেশ ছিলাম কিছুদিন।...এমন সময় এলেন শিল্পী বু, তাঁর ছবিতে দেখলাম আত্মার সূর্যোদয়।...আমি যে শিল্পী, শুধু নারী নয়, বু এসে আমাকে জানিয়ে দিয়ে গেলেন। জানিয়ে দিয়ে গেলেন, মানুষ শুধু সংসারী নয়, সে সরতে চায়, চলতে চায়, রচনা করতে চায়, এইজন্যে সে রচনার আনন্দ উৎসটির সন্ধানে-ও ফেরে। এই সন্ধানে যদি সফল হয়, মন তবে একটা আশ্রয়-ও পায়। তখন দুঃখে-ও শান্তি। চরম নৈরাশ্যের অন্ধকারে-ও তখন আশার সূর্য।...মনে হল, বু আমার আশার সূর্য, আমার আত্মার পুরুরবা।... তাঁকে দেখে ভোর হয় আকাশে, জেগে ওঠে মন, গান করে বিহঙ্গের আনন্দে, নৃত্য করে প্রাপ্তির বিলাসে। এই বিলাস কেড়ে নিতে পারো? কেউ পারে?

যাকে দেখে আস্বাদ করি এই ধ্যানের বিলাস, সে হয়তো নিজে-ও জানে না কী সম্পদ আহরণ করি তাঁর কাছ থেকে। বু-ই কি ইচ্ছা করলে কেড়ে নিতে পারেন এই সম্পদ?...বুদ্ধদেব কাড়তে পারেন যা পেয়েছি তাঁর স্মিতাননের সৌন্দর্যে? শ্রীচৈতন্য জানতে পারেন—কী আলো পেলাম তাঁর বাণীমহিমার

আনন্দে? জানেন রবীন্দ্রনাথ—কী তাঁর চুরি করে' আমার মত তুচ্ছ নগণ্য মেয়ে-ও আজ সুন্দর-প্রেমের পূজারিণী?...

তোমার সঙ্গে ছিলাম সংসারী মন নিয়ে—ঘর-সংসারের আরাম-আয়োজন নিয়ে, ব্র এসে জ্যোতির্ময় সূর্যের মত অন্তরগহনকে করলেন আলোকিত। ভাবোন্মত্ত পুলকে আমার শিল্প-চেতনাকে গভীরভাবে করলাম অনুভব। উদাসিনী হলাম কর্মে, কথায়, চলনে, বলনে। তুমি এটা পছন্দ করলে না। না-করারই কথা অবশ্য। তবু তোমাকে ভালবাসি, বিশ্বাস করি, তাই নির্ভয়ে তোমার কাছে ব্র-র কথা করলাম জিজ্ঞাসা, উৎসুক হলাম তাঁকে কাছে পাওয়ার জন্যে।...কিন্তু ভুল বুঝলে তুমি। সাধারণ মনস্তত্ত্বে এ-ক্ষেত্রে ভুল-বোঝাটাই অবশ্য স্বাভাবিক। তোমাকে ভালবাসা আর ব্র-কে ভালবাসা যে এক জিনিস নয়, এটা তোমাকে বোঝানো গেল না। সতী নারী তার মর্ত্যস্বামীকে ভালোবাসে, কিন্তু অমর্ত শ্যামসুন্দরকে পূজা-ও তো দেয়! দেববিগ্রহকে পূজা-দেয়ার যে আনন্দাস্বাদ—তুমি তা' কোনক্রমে অনুভব করলে না। নির্দোষ নির্মল চরিত্র বন্ধু-দেবতাকে তুমি দুঃখ দিলে, প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবলে।...

ব্র তাঁর স্বাভাবিক পবিত্রতায় উঠে এলেন আপন আসনে। কিন্তু সমস্যার এখানেই হ'ল না সমাধান। তুমি গোপনে নি-র শরণাপন্ন হলে স্বেচ্ছাচারী উত্তেজনায়। তবু এ-ও সহ্য করছিলাম সু। কিন্তু এখন দেখছি, আর সহ্য করা সমীচীন হবে না। নি এসে যা আমাকে বলে' গেল এবং গতরাত্রে মদ খেয়ে যেভাবে তুমি আমাকে অপমান করে' গেলে—তাতে বুঝলাম, আমাদের দিন ফুরিয়েছে।...এ-বাড়ী তুমি নি-কে দিতে চাও, নি-কে বিবাহ করে' সুখী হতে চাও, আমি জেনেছি। এ-বাড়ীর জন্যে যে-টাকা তুমি ব্যয় করেছ, হিসাব করে' সে-টাকা আগে তোমাকে দিয়ে দিতে চাই। তা দিয়ে দিলে এ-বাড়ী, আইনতঃ শুধু নয়, ধর্মতঃ আমার-ই হবে।...তারপর নি-কে যখন তুমি বিবাহ করবে, এ-বাড়ী তখন নি-কে আমি উপহার দিয়ে তোমাদের পথ থেকে একেবারে সরে যাবো।

ভালো একদিন বেসেছিলে, এ-জন্য আমি কৃতজ্ঞ। নিতান্ত অসহায় অবস্থায় কলকাতায় একদিন এসেছিলাম, অসহায়ভাবেই যদি ফিরে যেতে হয় কোথাও, দুঃখ করবো না যদি ঋণমুক্ত হই জীবনে। আমাকে ঋণমুক্ত কর্‌য়ো—এই কামনা জানিয়ে চিরকালের জন্যে তোমার কাছ থেকে বিদায় নিলাম।...

আমার ঋণের টাকা আজকালের মধ্যেই পাঠাবো।

ইতি—শো।

চিঠিখানি ধীরে ধীরে মুড়ে রেখে দিচ্ছি, সু চোখ মেলল। বলল অসহায় ভঙ্গীতে :

—পড়লে ?

—হুঁ।

—চিঠিখানি পেয়ে মনটা খারাপ হয়ে গেল। চেকখানা হাতে নিয়ে হন্তদন্ত হয়ে এলাম শো-র কাছে।...ইচ্ছা ছিল ভাই, হাতে না হয় পায়ে ধরে তার ক্ষমা ভিক্ষা করবো ! আর বলবো, এ-জীবনে মদ ছোঁবো না !

— × × ×

—শো, দেখলাম, শুয়ে শুয়ে কী একখানা বই পড়ছে। দরজা গোড়ায় এসে দাঁড়িয়ে একটু হাসতে গেলাম, কিন্তু তার কঠিন মুখখানা দেখে থমকে গেলাম সভয়ে।...একটু পরে চেকখানা তার হাতে দিতে এলাম এগিয়ে, ধড়-মড়িয়ে সে উঠে বসলো। বাজপাখীর মত চেকখানাকে ছোঁ মেরে নিয়ে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেললো চকিতে। বিছানা থেকে নামল অকারণে। হঠাৎ চিৎকার করে' উঠলো অস্বাভাবিক কণ্ঠে : বেরিয়ে যাও বাড়ী থেকে !

বলতে বলতে সে সোজা হয়ে দাঁড়াল একবার। থর থর করে' কাঁপতে কাঁপতে বসে পড়লো বিছানায়। মুখ ঠুকে পড়ে গেল-বিছানার ওপর।

হতভম্বের মত দাঁড়িয়ে আছি। মথুর এল ছুটে।

—দেখছেন কি, মা অজ্ঞান হয়ে গেছে !

বলতে বলতে নিচে গেল নেমে।

ডাক্তার এলেন। একটু পরেই অবশ্য জ্ঞান ফিরলো শো-র। চোখ মেলেই আমাকে দেখিয়ে বলল :

—ওকে যেতে বলো বাড়ী থেকে!

ডাক্তার তাই নির্দেশ দিলেন।...মাথা নিচু করে' ঘর থেকে এলাম বেরিয়ে।...এখন কী করবো?

সু-র চোখদুটো দেখে বড় ভয় পেলাম। পাগলের চোখের মত অর্থহীন শূন্যদৃষ্টি! স্নেহভরে তার গায়ে হাত রাখলাম। সু বলল :

—আমার ছেলেপুলে নেই, কেউ নেই সংসারে। একজন মাত্র শ্যালক আছে, প্রতিশ্রুতি দিয়েছি তার উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা করে' দেব, তাকে মানুষ করে দেব। তার জন্যে কিছু টাকা রেখে—তোমার নামে, ব্, আমার সমস্ত সম্পত্তি লিখে দিয়ে যেতে চাই। সে-সব নিয়ে ভবিষ্যতে যা ভালো বোঝো ক'রো।

—এ-সব কী বলছ সু?

—বাঁচতে আর ইচ্ছা নেই প্রিয়বন্ধু!

—একটা তুচ্ছ মেয়েমানুষের জন্যে এত অধীর হলে কি চলে সু?

—শো-কে' তুচ্ছ বলছ? তুমি?

—শো যদি তোমাকে ত্যাগ করে, তবে অবশ্যই বলবো সে তুচ্ছ নারী।... আর তোমার বহিশ্চরিত্রের সহস্র দোষ থাকা সত্বে-ও অন্তর্জীবনের প্রেম-বেদনাটি যদি সে ধরতে পারে, যদি মার্জনা করে' সহজ ভাবে তোমাকে গ্রহণ করে আবার, তবেই বুঝবো তুচ্ছ রমণী সে নয়।...

—তোমার কথা আমি বুঝতে পারছি না ব্!

—আমি জানি সু, শো নয় তুচ্ছ রমণী!...তার চিঠি পড়ে যতদূর আমার মনে হচ্ছে, ত্যাগ সে তোমাকে করতে পারবে না।...করতে চায়-ও না।...

—মিথ্যা আশা দিচ্ছ না কি?

—বন্ধু সু, শো-কে আমি ভালবাসি। ভালবাসি বলে' এত তার জানি যা সে নিজে-ও জানে না।...তুমি ভয় পেয়ো না সু! ওঠো!

বুঝতাম, স্পষ্টতর আরো বুঝলাম সু-কে শো ঠেলতে পারবে না কিছুতে। সু-র বন্ধু হিসাবে এটাই তো আমি চাই ? না গোপনে গোপনে তা' চাই না ? তামসিক একপ্রকার অসহায় বৈরাগ্য অনুভব করলাম কেন ?...

সন্ধ্যায় সু এল। সরাসরি প্রশ্ন করল :

—ভেবে দেখলাম ব্র, নি-কে সায়েস্তা করতে না পারলে শো-র সঙ্গে মিলনের আমার আশা নেই।

আশ্চর্য দুর্জ্ঞেয় আমার চরিত্র। অন্তর্জীবনে একটা বিশেষ আবেগের প্রাদুর্ভাবে অসংযত হচ্ছি গোপনে, তবু দার্শনিকের মত সু-কে উপদেশ দিলাম :

—নিজে আগে একটু সংযত ও সহজ হও না সু—ক্রমে ক্রমে সব ঠিক হয়ে যাবে।

—ওই তোমার যত সব দার্শনিক ধর্মকথা। যা বুঝতে পারি না, মানতে পারি না, অনবরত তাই শুনলে কি ভালো লাগে, না আশা জাগে ?

চুপ করে রইলাম। সু বলল :

—একটু বেরুবে না ?...যাও না একবার শো-র কাছে!

—আজ আর যাবো না!

আমার উদাসীন কণ্ঠস্বরে বিস্মিত হল সু। নিরীহের মতো বলল :

—কেমন আছে সে...

—নিশ্চয়ই ভালো আছে, খারাপ থাকলে খবর আসতো...

—এই কি বন্ধুর কথা হল ?

আবার চুপ করে রইলাম। সু বলল :

—এখন কি করবে ?

—গুরুদেবের কাছে গিয়ে একটু বসবো।...মন টানছে!

—তবে আমি আর কী করবো, চলি!

—মদের মন্দিরে নয় তো?

বললাম হেসে।

—নাঃ!

সু বলল উদাসীন সুরে।

—শো-র কাছে তো যাবে না, কিন্তু মদ খেলেই সব ভুলবে, নি-র ফ্ল্যাটে গিয়ে উঠবে হয়তো!

—নাঃ! নি-র সঙ্গে আর না! খুব শিক্ষা হয়েছে!

—তোমার শিক্ষা হয়?

—আগে নি-র বিষদাঁত ভাঙি, তারপর হয় কি না দেখবো।

একটু থেমে:

—শো বা তুমি নি-কে ক্ষমা করতে পারো, আমি পারি না!

—কি করবে তুমি নি-র?...শেষকালে খুনখারাবি করতে যাবে নাকি?

—তারো চেয়ে হীনতর কিছু করবো। ভাতে মারবো!

—বলতে লজ্জা করছে না?

—না!

—একজন মেয়েমানুষের বিরুদ্ধে যাই করো সু, গোপনে কোনো ষড়যন্ত্র করো না! পুরুষের মত স্পষ্ট হও, স্বচ্ছ হও, বীর হও ক্ষমার সাধনায়!

—এ-সব কথা ঢের শুনেছি তোমার মুখে।

—দ্যাখো, নি-কে যত দোষী-ই মনে করো, তুমি-ও যে তার সঙ্গে তুল্য দোষে দোষী—সেকথাটা মনে রেখো!...তুমি যদি ক্ষমা পেতে পারো, তবে নি-ও কেন নয় পাওয়ার যোগ্য?

সু কোনো জবাব দিল না এ-কথায়। বোধ করি ভালো করে' শুনল-ও না। উঠে চলে গেল গম্ভীর পাদবিক্ষেপে। শিউরে উঠলাম এই ভেবে: নি-র ওপর ভয়াবহ একটা কিছু সে করে বসবে!...শো-র জন্যে সে উন্মাদ!

কিন্তু আমি তো নয়!...নাকি আমি-ও?...ছি, ছি, ছি!

গুরুদেব তখন গীতার ভক্তচরিত্র ব্যাখ্যা করছিলেন, আমি ঘরের এককোণে গিয়ে ধীরভাবে তা শোনবার চেষ্টা করলাম। মনে হ'ল অন্তর্জীবনে বাঁচতে হলে গুরুর সান্নিধ্য ও আশীর্বাদ ছাড়া আর কোনো পথ নেই। কিন্তু কিছুতেই, কেন জানি না, মনটা শান্ত-ই হল না। অকারণে শো-র সেই চিঠিখানির ভাষা কেবলি মনে পড়তে লাগল।...শো আমাকে ভক্তি করে, দেবতাজ্ঞানে পুজা করে, গুরুজ্ঞানে বন্দনা গায়—এ-র চেয়ে বড় সৌভাগ্য আর কী হতে পারে? তবু কেন আমার মনটা হঠাৎ তামসিক নিশ্চেষ্টতায় পাষাণপ্রায় হয়ে গেল?...এ কী বিচিত্র মন? এ কী অভিনব রহস্য? শো-র কাছে আমি তবে কী চেয়েছি?...কেন মনের এই বিষন্নতা? কী এর তাৎপর্য?...

সু-শোর বিরোধে আমি তো একজন বাইরের লোক মাত্র, সু-শোর অশেষ করুণা আমাকে তারা স্থান দিয়েছে তাদের নিভৃত জীবনে, এ তো আমার গর্ব, আমার গৌরব। এরও চেয়ে আরো কী চাই গোপনে? সু আমার বন্ধু, কল্যাণ চাই তার; শো আমার বন্ধু—তারো চাই কল্যাণ। এই কল্যাণ চাওয়ার গৌরবে যদি তাদের প্রেম পাই, ভক্তি পাই, তবে সেই তো আমার বন্ধুহৃদয়ের পরম পাথেয়!...নাকি নয়? মন কেন টলে, বিপরীত কথা-ও বলে কেন?

গুরুদেব বলেছিলেন: দেহটা প্রকৃতির অধীন, সেটা টলে। মনটা প্রকৃতির অধীন হলে টলে, আত্মার অধীন হলে টলে না।

আত্মার অধীন হয় কি করে? প্রশ্ন জাগল বুঝি। একি! মনে-ও যে হল: গুরুদেবের এ-সব তত্ত্বকথা কাজে ফলানো অসম্ভব। বিজ্ঞ দার্শনিকদের এ-গুলি স্বভাব-অবিচ্ছিন্ন গম্ভীর কল্পকথা ছাড়া আর কিছু না। লোকে এ-গুলি বুঝতে পারে না বলেই সমীহ করে, মানতে পারে না বলেই শ্রদ্ধা দেয়।...

একী ভাব ভাবছি গুরুদেবের সামনে বসেই? একী পাপ?... গুরুদেবের ঘর থেকে উঠে গেলাম ধীরে ধীরে।

নির্জন ঘরে এসে গীতাদি ধর্ম-গ্রন্থগুলি আনমনে নাড়তে নাড়তে হঠাৎ, হায় রে কপাল, সিনেমার রঙিন পত্রিকাগুলি টেনে বার করলাম।...বোধ হয়

শিল্পীদের ছবিগুলি আর একবার দেখতে সাধ?...কিন্তু কই, একজন শিল্পীরো মুখের ছবির দিকে দৃষ্টি মেলতে ইচ্ছা হল না তো! শুধু শো-র চন্দ্রের মত সুন্দর মুখখানি—পত্রিকাপৃষ্ঠায় না দেখেও—ভেসে উঠল মনের আকাশে, আকাশে বুঝি মেঘ করল, মেঘে ঢেকে গেল মুখের চাঁদ, বিহ্বল দৃষ্টির অসহায় অভ্যর্থনা কেঁদে ফিরে এল মাটির পৃথিবীতে।

—নটি বয়, কানের পাশে ঝড় বুঝি হেঁকে গেল উদ্দাম উপহাসের বজ্র-গাম্ভীর্যে। বিদ্যুৎ জ্বলে উঠে নেচে গেল মস্তিষ্কে, হৃদয়ে।

নিজেকে অত্যন্ত নিচুস্তরের জীব বলে' মনে হল। নিজেকে নিচু বলে' জানতে পারা, অনুভব করা—এ যে কী দুর্বহ যন্ত্রণার ব্যাপার—দম্ভে দুর্বল যে উদ্ধত মানুষ, সে কখনও তা' জানবে না।...বিষণ্ণ বৈরাগ্যে নিশ্চেষ্ট হয়ে চোখ বুজিয়ে শুয়ে রইলাম অনেকক্ষণ।

গুরুদেব একবার কথায় কথায় বলেছিলেন মন যখনি নিস্তেজ হবে, শ্রেয়পথ থেকে সরে' যেতে চাইবে, পাঠ করবে ভগবান বুদ্ধের ধর্মবাণী।

জয় হ'ক গুরুদেবের, মনে মনে বললাম। উঠে বসে 'ধর্ম-পদ' গ্রন্থখানি বার করে' একবার মাথায় ঠেকালাম। তারপর আনমনে প্রবেশ করলাম বুদ্ধবাণীর শীলদর্শনে। হঠাৎ একস্থানে:

—ধ্যায় ভিক্খো প্রমাদো মা তে মা কামগুণে তে ভ্রমতু মনঃ। মা গিল প্রমত্তো লৌহগুলিং মা ক্রন্দী দহ্যমানো দুঃখী।

ধ্যান করো, উপদেশ দিচ্ছেন ভগবান, প্রমাদ যেন না হয় তোমার। প্রমত্ত তুমি নরকে গিয়ে তপ্ত লৌহগুলি গিলো না—এবং সেই কারণে দগ্ধ হয়ে দুঃখী হয়ে ক্রন্দন করো না।

—বর্ষিকা ইব পুষ্পাণি মদ্দিতানি প্রমুঞ্চতি। এবং দ্বেষাচ্চ রাগাচ্চ বিপ্রমুঞ্চত ভিক্ষবঃ।

পুষ্পতরু পরিম্লান পুষ্প করে ত্যাগ, তোমরাও যেন ত্যাগ করতে পারো রাগদ্বেষাদি হৃদয়পুষ্প।

—আমি পারছি না, কিন্তু আশীর্বাদ করো যেন পারি, কাঁদলাম মনে মনে। গুরুদেবের ঘরে এলাম পুনর্বার।

গুরুদেব তখন গীতার দ্বাদশ অধ্যায় ব্যাখ্যা শেষ করে' উপসংহারে দু'চারটি কথা বলছেন। বলছেন :

—শ্রীভগবান তো অনেক উপদেশ দিয়েছেন, কিন্তু উপদেশে কী হয়? অন্তর থেকে যতক্ষণ না সাড়া মেলে, ততক্ষণ ও-সব উপদেশের কি-ই বা মূল্য?

গুরুদেব একটু থামলেন। তারপর আবার :

—না, মূল্য কিছু-না-কিছু আছে-ই। শ্রীভগবানের উপদেশ বুঝতে পারি আর না-ই পারি, পালন করি আর না-ই করি, শুনলেও কিছু কল্যাণ হয়।... শ্রীভগবান তো বললেন, সুখে দুঃখে আশায় নৈরাশ্যে সমানভাবে সব থাকো। শুনেই যে সকলে থাকতে পারবো—এমন তো কথা নয়। কিন্তু শোনা যদি থাকে, একদিন-না-একদিন কাজে এটা লাগবে। বড় কথা 'জানা না' থাকলে বড় 'করা' কি বড় 'হওয়া' তো সম্ভব হয় না কখনো। বড় কথা শোনা থাক, জানা থাক, একদিন-না-একদিন এটি কাজে করার জন্যে এবং বাস্তবে হওয়ার জন্যে কান্না জাগবেই।...

প্রশ্ন জাগল : কান্নাটাই কি জীবনের সারবস্তু?...

গুরুদেব বলে চলেছেন :

—বড় জীবনের জন্যে যাদের কান্না জাগে, তাদের কান্নার শেষ নেই। সাধারণ জীবনে তুচ্ছ মোহ, তুচ্ছ সুখ, তুচ্ছ বিলাসব্যসন নিয়েই মানুষ তৃপ্ত হয়, খুসি হয়। এই সাধারণ জীবনের যে-কান্না, সে কান্না মিটতে-ও পারে, নাও মিটতে পারে। কিন্তু বড় জীবনের জন্যে যে-কান্না সংসারে সে-কান্না কখন-ও মেটে না।...বড় জীবনের শেষ নেই, তাই বড়-কে যে চায়, তার চলার-ও শেষ নেই, বলারও শেষ নেই, দুঃখ-বেদনারও শেষ নেই।

তবে তো বড় জীবনের জন্যে কান্নাটাই সার বস্তু। ছোটর জন্যে গোপনে কাঁদি, তাই কান্না মিটলেও থাকি ছোট। তুচ্ছ রূপমোহের আতিশয্যে অবচেতন জীবনে যে-কান্না, সে-কান্না আমাকে যদি মার্মিক অধঃপতনের তলাতলে দেয় নামিয়ে, তাতে বিস্মিত হওয়ার তো কিছু নেই।

গুরুদেবের বাণীর বিদ্যুৎছটা চাবুকের মত আমার চেতনায় এসে যেন আঘাত করল।

সোজা হয়ে বসলাম।

গুরুদেব কথা শেষ করলেন কিছুক্ষণের মধ্যে। ভক্তদল তাঁকে প্রণাম করে' একে একে উঠে যেতে লাগল। সর্বশেষে আমি তাঁর কাছে, প্রণাম করার জন্যে, এগিয়ে এলাম।

সস্নেহে আমার মাথায় হাত রাখলেন গুরুদেব।...বললাম :

—মনটা ততো ভালো নেই গুরুদেব।

গুরুদেব হাসলেন :

—মনহীঁ মরনা উপজৈ মনহীঁ মরনা খাই।...মরনের জন্ম দেয় মন, আবার মন-ই মরণকে নেয় খেয়ে। ডরো মৎ!

অপাবৃত আনন্দের দিব্যতায় প্রসন্ন হ'ল চিত্ত। অভিনব এই প্রসন্নতার স্বপ্ন আমাকে ছেয়ে রইল গভীর রাত্রি পর্যন্ত। রাত্রে সবাই যখন ঘুমিয়ে পড়ল, এমনকি মা-ও, তখনও আমি জেগে জেগে (মা অবশ্য জানে না আমি জেগে আছি) আস্বাদ করলাম আশ্চর্য সেই প্রশান্তির ভাবাবেগ।

নিজেকে বড় ভালো লাগল আবার। দু-হাত দিয়ে মনে মনে নিজেকে আলিঙ্গন করে' পড়ে রইলাম প্রেমাস্পদের পবিত্রতায়।—মরণকে খেয়ে ফেলেছি, বললাম রাজসিক রসাস্বাদের দীপ্তোচ্ছ্বাসে।

আশ্চর্য!...এই আমি কি সেই আমি, অতীতের তুচ্ছ মনোবিকারে মলিনান্ধ যার মুখ?...যে-আমি অভিন্নহৃদয় একজন বিরহার্ত বন্ধুর প্রেমসৌভাগ্যে ঈর্ষাকাতর হয়েছে গোপনে? যে-আমি বন্ধুবৎসলা একজন মহীয়সীর রূপমোহে প্রলুব্ধ হয়েছে অন্তরগহনে, বাসনাভিমানের সূক্ষ্ম বেদনায় রুক্ষ হয়েছে কাপুরুষের মত?

শো-কে আবার বড় ভালো লাগল...সংসারে যে যেখানে আছে মনে হল, সকলের আমি বন্ধু, আমি বন্ধু।...এই বন্ধু-মনটির অন্বেষণে এতকাল পথে

বিপথে আমি ঘুরেছি, যেন গুরুকৃপার নাটমন্দিরে এই বন্ধু-মনটি আমার জন্যে করছিল প্রতীক্ষা। আজ সময় হ'ল, সত্যসত্যই এল সে। এল আমার জীবনের জীবন, আমার প্রাণের প্রাণ, আমার আত্মার আনন্দ।

পরবর্তী জীবনে বন্ধুমনের এই আনন্দটিকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশেষ করে আমি দেখেছি।...পুরুষ আমি নারীর প্রতি আমার আকর্ষণ স্বাভাবিক, এটা বিচিত্র কিছু ব্যাপার নয়। কিন্তু বন্ধু-সাধনায় প্রেমজীবনকে যে শুদ্ধ করে নিতে পারে, ভারতীয় 'চার্বাকেরা' কিংবা ইউরোপীয় 'হেডোনিষ্টরা' যাই বলুন—আমি জানি, সন্ন্যাসী না হয়েও সে সদাচারী শুদ্ধাত্মা, অসংখ্য বন্ধন মাঝে থেকেও বুদ্ধকল্প সে সদামুক্ত। নারীকে সে দেবীজ্ঞানে শ্রদ্ধা করে, সহকর্মিনী জ্ঞানে সম্ভ্রম জানায়, সহমর্মিনী জ্ঞানে ভালোও বাসে, পথের সঙ্গিনী বলে' হাতে-ও দেয় হাত, কিন্তু পৌরুষ মোহকে প্রেম নামে ব্যাখ্যা করে' চিত্তবিকারকে সমর্থন করে না কখনও।...যা সমর্থন করি না, তা যে কখন-ও স্বভাবের মধ্যে জাগে না তা বলি নে, কিন্তু সমর্থন করি না বলে প্রশ্রয় দিতে লজ্জা পাই। আর এই লজ্জা-ধর্মের সজ্ঞান আনন্দবোধ-ই সত্যকার বন্ধু-হওয়ার বন্ধুর পথে সহজবেগে আমাকে টেনে নেয়।...সংসারে কোনো নারীর-ই আমি স্বামিত্ব চাই নে—এটা অবশ্য সত্য কথা নয়। কিন্তু বিপুলা পৃথ্বীর এই বিরাট কর্মক্ষেত্রে নারীপুরুষ স্ব স্ব কর্তব্যসমাপনে যখন অহরহ ব্যাপৃত, তখন ব্যক্তিগত নিভৃত স্বামিত্বমোহকে একজন মাত্র নারীর পাণি-পদ্মে সংস্থাপন করার দ্বারা তৃপ্ত রেখে' গৃহমুখীন মোহমনকে বিশ্বমুখীন প্রেমমানসে উদ্দীপ্ত করতে হয় শিল্পসাধককে।...মোহমন কিছু পেতে চায়, না পেলে সে হাহাকার করে, কিছু তাকে তাই পেতেই হয়। কিন্তু প্রেমমানস দিতেই চায় সূর্যের মত। বিশ্বের সে বন্ধু। আলো ছড়িয়েই তার আনন্দ।

এই আনন্দ আমি শো-র কাছ থেকে পেয়েছি, মোহবশে এ-আনন্দটি পাছে মলিনান্ধ করি, তাই বুঝি এলেন গুরু, আমার ধর্ম, অন্তর্জীবনে সন্ন্যাসধারণার শুচিতা সঞ্চার করে' উদ্বুদ্ধ করলেন আমাকে?...তবে বেঁচে গেলাম।

সত্যসত্যই আমি বেঁচে গিয়েছি।...বহু নারীর সঙ্গে আজ, আধুনিক সমাজে কাজ আমাকে করতে হয়। বিশেষ করে' সিনেমার রাজ্যে, কে না জানে, কত নবীনা নারীর সম্মুখীন হতে হয় আমাকে।...আমি কারুকে নিয়ে উঠি পাহাড় চূড়ায়, কেউ এসে পাশে বসে নিভৃত কুঞ্জে, শত্রু-হস্ত থেকে কারুকে বা বাঁচাতে ছুটি বিক্রুষ্ট যৌবনে, কারুকে নিয়ে বা ঝাঁপিয়ে পড়ি সাগরে।...নারী, নারী, নারী—নারী না হলে চলে না সংসার, জমে না ছবি, কাটে না কথাকাব্য, কেননা নারী ছাড়া জীবন অপূর্ণ।...কিন্তু বন্ধু-প্রেমের আনন্দসাধনায় কী যে হল—সাধারণ এই স্বভাবতত্ত্ব আমার জীবনে সত্য হয়েও সত্য বলে' মনে হ'ল না। গোপনে আমি একা, দুঃখে নয়, বিমর্ষতায় নয়, বিরহে নয়, আনন্দে আমি একা।

কিন্তু কেন এ-সব লিখছি? লিখছি কার জন্যে, কাদের জন্যে?...কে বুঝবে কী আনন্দে আমি আছি? এই কি শিল্পের আনন্দ? অথবা ধর্মের? কিংবা দর্শনধ্যানের?

কি জানি কী জাতি এই আনন্দের!...নাস্তিকেরা এ-আনন্দ হয়তো স্বীকার করবে না। কিন্তু এটা আমি ঠিক জানি, এ-আনন্দকে যে না পেয়েছে মহৎ শিল্পসৃষ্টি সম্ভব নয় তার পক্ষে।...মানুষকে জানো, জানো তার সুখদুঃখআশাআকাঙ্ক্ষাভরা গহনজীবনের বিশ্ববৈচিত্র্য, পরিচিত হও তার জীবনবেদনার সর্ববিধ লৌকিকসমস্যায়—কিন্তু সবার মূলে যদি সঞ্চারিত না করো এই তোমার বন্ধুবিলাসের আনন্দপ্রেম, এই আনন্দভক্তির ভাবসৌন্দর্য, ব্যর্থ হবে তোমার শিল্প, কেননা শিল্পে প্রকাশ পাবে না সম্ভাব্য জীবনের লোকোত্তর দিব্যলাবণ্য।...মহৎ শিল্পের প্রাণ শুধু যে পার্থিব কামক্ষুধা-ই, তা তো নয়; শতবিধ সমাজসমস্যার ঘোরতর মুক্তি-প্রার্থর্য যে, তা-ও নয়; তা আনন্দময় বন্ধুপ্রেমের বিশ্বানুভূতি, তা সেবাময় রূপসৌন্দর্যের নন্দনকান্ত শান্ত চেতনা। আজ হয়তো এ-সব কথায় আমরা তর্ক তুলব, আগামী কাল-ও দীনা বাসনার বস্তুগর্ভ যুক্তির প্রগল্‌ভতায় এ-সব তত্ত্বে পরিহাস করব, পরিত্যাগ করব, কিন্তু আজ বা কাল-ই মহাকাল

নয়। পৃথিবী বিপুলা, সে শুধু তোমার দেশটুকুর মধ্যে সীমিত নেই; এবং কালও নিরবধি, তা আমাদের 'আজ' বা তাদের 'কাল'-এর কারাগারে নয় বন্দী।...

ঢঙ্‌, ঢঙ্‌, ঢঙ্‌—তিনটে বেজে গেল দেওয়ালের ঘড়িতে!...কী হল যে আমার, স্বপ্নের আনন্দে ঘুম-ই এল না চোখে।...

রাত্রিকালে সকলেই যখন ঘুমিয়ে আছে, আমি শিল্পী, একাকী তখন জেগে আছি শিল্পানন্দের সূর্যধ্যানে।...মনে মনে বলছি, সমাজজীবনে সহৃদয় প্রেমিক হয়ে-ও অন্তর্জীবনে থাকবো সাত্ত্বিক বৈরাগী, তবে-ই হবো বন্ধু—আর যথার্থ যে বন্ধু, সেই তো শিল্পী, জীবনগহনের তত্ত্বাবিষ্কারে তারি অধিকার!

—বন্ধু হও, বু, যথার্থ বন্ধু!

শো এই কথা-ই একদিন বলেছিল বটে।

—সেই তো তোমার শিল্পজীবনের উত্তরসাধিকা!

—কে?...গুরুদেব?... আপনিও রাত্রিকালে আছেন জেগে? বুঝি থাকেন জেগে?

এ কী অভাবনীয় ব্যাপার!...মনে হল দৈববলে দিব্যদৃষ্টি লাভ করে' গুরুদেবের সঙ্গে নিজেকেও দেখলাম নয়নভরে। সিনেমাগৃহে বসে' অভিনেতা স্বয়ং তার অভিনীত চিত্র যেমন নীরবে দর্শন করে, তেমনি আমি দেখলাম, বু নামক তরুণ শিল্পীটি গুরুদেবের পায়ে এসে প্রণাম করল!

—এমন মন্ত্র আমাকে দাও ধর্মগুরু, যাতে নারীর রূপে আর মোহ না জাগে! বলল বু, আমি শুনলাম, হ্যাঁ স্পষ্ট শুনলাম। গুরু বললেন:

—শিল্পজীবনের তত্ত্ব তবে তো উপলব্ধি করো নি এখনো! আর্টিষ্ট জীবনে শুধু তো ধর্মগুরু নয়, মর্মসঙ্গিনীর-ও প্রয়োজন যে!

—সে সঙ্গিনী কি কামনার মোহে টানবে না?

—না টানলে জানবে কি করে' শিল্পযৌবনকে ? টানবে, কিন্তু ধর্মগুরু তো আছেন মর্মলোকে, ভয় কি ?

—ধর্মগুরু কি মুক্তির নির্বেগ সমাধিতে টানবে না ?

—না টানলে জানবে কি করে' লোকোত্তর জীবনকে ? টানবে, কিন্তু মর্মসঙ্গিনী তো জাগবে ধর্মের মধ্যে-ও, ভয় কি ?

গুরুদেবের সঙ্গে তর্ক করার কথা স্বপ্নে-ও ভাবতে পারি না। আজ কিছু ভাবলাম যেন। গুরুদেব কিন্তু কিছুই আমাকে বলতে দিলেন না। বলে চললেন :

—সন্ন্যাসীর নারীতে প্রয়োজন নেই কিন্তু শিল্পীর আছে বৎস। 'ময়া সিসৃক্ষুঃ' বলে' সৃষ্টিকামনায় যিনি দ্বন্দ্ব-চঞ্চল, তিনি শিল্পী, তিনি ব্রহ্মপুরুষ। আর পুরুষ ও প্রকৃতি যার মধ্যে এক, সাম্যাবস্থা পেয়ে ভেদরহিত, সমাধিস্থ, তিনি সন্ন্যাসী, তিনি ব্রহ্ম। ব্রহ্ম এক ও অদ্বিতীয়। তত্ত্বসংসারে একজন মাত্রই সন্ন্যাসী আছেন, দু-ই নেই। আর যাঁরা আছেন তাঁরা কোনো-না-কোনো কর্ম করেন, অতএব শিল্পী। এই জগৎশিল্প বিশ্বকর্মা ব্রহ্মপুরুষের অর্থাৎ ঈশ্বরের কীর্তি! ঈশ্বর-ও শিল্পী, সন্ন্যাসী নন। এইজন্য প্রকৃতিলীলা প্রাসঙ্গিক। এখন বিচার্য, কোন পথের তুমি সাধক ?...ব্রহ্ম যদি আদর্শ, তবে সন্ন্যাসাশ্রমের বৈরাগ্য, ব্রহ্মেশ্বর যদি, তবে শিল্পাশ্রমের প্রেম।...কোন্‌টা চাও ?

—শিল্পাশ্রমের প্রেম।

—তবে নারী নয় নরকের দ্বার, নারী স্বর্গযাত্রার সহচরী, নারীকে জানবে তোমার আত্মার আত্মীয়। মিথ্যা নয় প্রকৃতিলীলা, মায়া নয় তার রূপ, তার স্নেহ-দয়া-করুণা, তার সৌহার্দ্য, তার সৌজন্য।

—× × ×

—শিল্পীর জীবনটা বু, রূপপ্রকাশের লীলাক্ষেত্র। ওর উত্তরে যদি পুরুষ, যেন যোগারূঢ় মহাদেব, দক্ষিণে তবে প্রকৃতি, যেন প্রেমময়ী চপলা গৌরী। শুদ্ধমাত্র প্রকৃতিধ্যানে আছে ভোগ-চাঞ্চল্য—এইজন্যে পুরুষ-ধ্যানের যোগজীবনটি মর্মকেন্দ্রে ধরতে হয়। আবার কেবলমাত্র পুরুষধ্যান-ই

শিল্পীজীবনে নয় কার্যকরী, কেন না প্রেমচাপল্যের লাস্যলীলার সমর্থন নেই সেখানে। বুঝতে কি পারছ বাণীর তাৎপর্য?

—× × ×

—বুঝতে পারো, বেঁচে যাবে যৌবনজীবনের পিছল পথে।

বৃ, দেখলাম, নীরবে বসে রইল। বুঝল কি না বুঝল, বোঝা গেল না। ...গুরুদেব বৃ-র নিকটে কি কারণে যেন এলেন এগিয়ে। সহসা দক্ষিণহস্তের অনামিকা দ্বারা বৃ-র ভ্রূর মধ্যবর্তী স্থানটি চেপে ধরলেন। বৃ-র সর্বশরীর কাঁপতে লাগল। সর্বশরীরে বিদ্যুৎ বুঝি সঞ্চারিত হল চকিতে। মস্তিষ্ক থেকে কণ্ঠে, কণ্ঠ থেকে বক্ষে, বক্ষ থেকে নাভিস্থলে, নাভি থেকে জানুতে, জানু থেকে পদতলে বিদ্যুৎপ্রবাহ সঞ্চারিত হয়ে ধরণীতলে হল প্রবিষ্ট। মন্ত্রমুগ্ধ বৃ কাঁপতে কাঁপতে স্থির হয়ে গেল। যেন নিষ্প্রাণ, নিষ্পন্দ।

গুরুদেব পরম স্নেহাবেগে হাত বুলালেন বৃ-র সর্বাঙ্গে। বললেন গানের মত মধুর আনন্দে:

—ওঠো বৎস!...বুঝলাম মন্ত্র তুমি পেয়ে গেছ!

—আপনার কথা বুঝতে পারছি না গুরুদেব!

—এ জীবনে শিল্পে তোমার অধিকার! দৈববলে শিল্পগুরু পেয়েছ, পেয়েছ দীক্ষামন্ত্র!

—পেয়েছি? আমি জানি না আমি পেয়েছি কি না!

গুরুদেব হাসলেন।...হস্তদ্বয় উত্তোলন করে মন্ত্রবলে কাকে যেন আহ্বান করলেন। সহসা আবির্ভূত হ'ল অপূর্ব লাবণ্যময়ী স্বর্গ-শোভনা এক তরুণীপ্রতিমা। অঙ্গে তার নানা অভিনব অলংকার। বামহস্তে বীণা, দক্ষিণে পদ্মকুসুম।

অভিনব দ্যুতিময় চারু নয়ন। নয়নে অপাবৃত আনন্দ-করুণা। অধরোষ্ঠে মৃদু হাস্য।

বিস্ময়বিহ্বল কণ্ঠে চিৎকার করে উঠল বৃ:

—শো, তুমি?...তুমি এখানে?

—বলেছিলাম না, গুরুদেবের সঙ্গে একবার দেখা করতে বড় সাধ?

—পাছে কেউ কিছু মনে করে, তাই বুঝি রাত্রে এসেছ লুকিয়ে?

শো কিছু বলল না। গুরুদেবের দিকে চেয়ে বুঝি হাসতে গেল।
...কিন্তু, কই! কোথা গুরুদেব? গেলেন কোথা এর মধ্যে?

চীৎকার করে উঠল বৃ:

—গুরুদেব!

শো হাসল। ধীরে ধীরে অগ্রসর হয়ে এল বৃ-র কাছে। হস্তে তার অর্পণ করল বীণা। বলল সংগীতের সুরে:

—বাজাও!

—বাজাতে কি জানি?

—জানবে!

—পদ্মটি কিন্তু কত সুন্দর!

—ওটি তোমার জন্যে নয়!

—পদ্ম পদ্মতেই পূর্ণ। ওটি-ই আমাকে দাও শো! বীণা বাজাতে হয়, বাজিয়ে সেটি পূর্ণ করে তুলতে হয়, বীণাটি নাও ফিরিয়ে। দিয়ো আর কাউকে!

—তোমার জন্যে বীণাই। বাজাতে জানো, এটি তোমার। না জানো এটি ব্যর্থ।

—পাওয়া তবে কি রচনা-করে-পাওয়া আর পেতে পেতে নূতন করে' চাওয়ার আস্বাদ?

—তা ছাড়া আর কী প্রিয়বন্ধু!...রচনা-করে পাওয়াতেই তো শিল্পের আনন্দ।...রচনা করি নি অথচ পেলাম, তার নাম 'গ্রহণ'। পেতে গিয়ে যখন কিছু 'করি'—করার মাহাত্ম্যে কিছুটা তখন দেয়া-ও হয় সংসারে। এইজন্যে, কিছু-না-করে যা' পাই তা' যদি গ্রহণ, করে' যা পাই, তা' তবে 'দান'। দানের আনন্দে যা পাবো তার সুরেই তো ভরাবো বিশ্ববীণা!... কাঙাল চায় নিতে, ভোগে তার আসক্তি। বন্ধু চায় দিতে, শিল্পে তার আনুগত্য। ভোগের পাওয়াতেই যাদের মন, পাওয়ার মত পাওয়া তাদের জন্যে নয়। তাদের পদ্মকুসুম-ও যায় শুকিয়ে, সৌগন্ধ্য মিলায় শূন্যে।

বিপুলাবেগে ব্ব শো-র পদ্মহস্তখানি একবার জড়িয়ে ধরল। পশ্চাদপসরণ করে' নতমস্তকে দাঁড়াল কিয়ৎকাল। পুনর্বার অগ্রসর হল কৃতনিশ্চয় পাদবিক্ষেপে। বীণার সূক্ষ্ম তারে আঙুল ঠেকিয়ে বলল গম্ভীর আনন্দে:

—দাও তোমার বীণা, সুমিতা!

সুমিতা বলল:

—নিতে পারবে আমি জানি। এই ভরসাতেই তো আছি বেঁচে। নাও প্রিয়বন্ধু, আমাকে নাও! যত নেবে, ততই আমি তোমার!

—তুমি আমার, তুমি আমার!

গান ধরল ব্ব বীণার ঝংকারে:

—এই তবে বীণা উঠলো বেজে। উদারা-মুদারা-তারা ভেদ করে' উঠলো সুর। সুরের মায়ায় এবার জাগবে বৈকুণ্ঠ। বৈকুণ্ঠে আমি আনন্দ, তুমি হ্লাদিনী। আমি গান, তুমি সুর। আমি প্রাণ, তুমি প্রেরণা।

নিশ্চুপ হয়ে শুনলাম ব্ব-র গান। গাইল ভালোই। প্রেমভাবের কান্ত ধ্যানখানি মুখে-ও দেখলাম, ফুটিয়ে তুলল ভালো।

—ভালো!

বলে' হাততালি দিতে গিয়ে চমকে জেগে উঠলাম স্বপ্ন থেকে। স্বপ্ন, সত্যের চেয়ে ঢের মূল্যবান এই স্বপ্ন।

ভোরের আলো দেখা গেল আকাশে।

প্রাতঃস্নান সেরে গুরুমন্দিরে যাব ভাবছিলাম, টেলিফোনে সু উদিত হয়ে পিছু ডাকল। বলল সুঃ

—আজকের কাগজগুলো পড়েছ হে দার্শনিক?

সু-র কণ্ঠস্বরে পাশবিক উল্লাস।

—পড়ি নি এখনো!

বললাম উদাসীনভাবে।

—পড়ো! ইন্‌টারেস্‌টিং খবর আছে!

'ইন্‌টারেস্‌টিং' খবরটা যে কী, একটু পরেই তা অবশ্য জানতে পারলাম। সেদিনকার শো-নি-বিরোধের খবরটার দিকেই সু আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেয়েছে।

অধিকাংশ বিখ্যাত দৈনিকেই বেরিয়েছে খবরটা। হেডলাইন দেয়া হয়েছে 'জনপ্রিয়া শিল্পী শো শয্যাশায়িনী!'...এবং কি কারণে শো শয্যাশায়িনী, সত্য মিথ্যা নানা ঘটনার সহায়তা নিয়ে বেশ গুছিয়েই তা বর্ণনা করেছেন উদীয়মান সাংবাদিকেরা।

নারীসুলভ ঈর্ষাই যে এ-বিরোধের কারণ—এ বিষয়ে সকল পত্রিকাই, দেখলাম, একমত।...কোনো কোনো পত্রিকা বেশ স্পষ্ট ভাষাতেই লিখেছেন—নি-ই এই বিরোধের নায়িকা। মাতাল অবস্থায় হানা দিয়েছিল শো-র গৃহে, চিত্র-সংক্রান্ত ব্যাপারে সামান্য একটা কী কথা নিয়ে শো-র সঙ্গে তার বচসা হয়। মতের অমিল হওয়ায় নেশার ঘোরে অকথ্য কুকথ্য ভাষায় শো-কে সে গালাগালি দেয়। গণ্ডগোল বেশ জমে উঠলে নি শো-র ঘরের মূল্যবান কাঁচের বাসনগুলি রাগের ভরে ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলে ভাঙতে সুরু করে। শো তাতে বাধা দিতে গেলে ধাক্কা মেরে নি তাকে মাটিতে ফেলে দেয়, তারপর তার পিঠের ওপর চড়ে মুখটা ঠুকতে থাকে ঘন ঘন। শো-র কপাল দিয়ে রক্ত

বেরোয়। অজ্ঞান হয়ে যান তিনি। পুলিশ এলে তবে শো-কে নি ছেড়ে দেয়।

শো-র অবস্থা খুবই সঙ্কটজনক।

কোনো কোনো সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় স্তম্ভে এই ঘটনাটার সংক্ষিপ্ত সমালোচনা-ও প্রকাশিত হয়েছে। সুস্পষ্ট ভাষাতেই কোনো কোনো সম্পাদক লিখেছেন, নি শিল্পসমাজের একটা 'ডিস্‌গ্রেস'। শো-র মত একজন সর্বজনমান্য উচ্চশিক্ষিতা শিল্পীর সঙ্গে নি যে লজ্জাহীন দুর্ব্যবহার করেছে, তা অবগত হওয়া মাত্র জনসমাজ লজ্জায় মাথা নিচু না করে পারবে না। এই ধরণের দুর্বিনীতা ও দুশ্চরিত্রা মেয়ে-শিল্পীদের সমাজে কোনরূপ প্রশ্রয় দেয়া মোটেই সমীচীন নয়। কেউ কেউ তাই প্রস্তাব করেছেন : নি-কে আর কোনো ছবিতে যেন স্থান না দেয়া হয়। পরিচালক ও প্রযোজকগণ এ-বিষয়ে একটু অবহিত হলে সমাজের মঙ্গল হবে।

একটা কাকাতুয়াকে স্তব্ধ করতে গিয়ে শক্তিমান সাংবাদিক মহল এত বড় বড় কামান দেগেছেন দেখে সত্যসত্যই বড় কষ্ট হল। নি-র কাজ অবশ্য সমর্থনযোগ্য নয়, কিন্তু তবু নি নারী, এইজন্যে ক্ষমার যোগ্যা; এবং দুর্বিনীতা নারী, এইজন্যে করুণার পাত্রী। কাগজে তার নিন্দা রটিয়ে তাকে শাস্তি দেয়ার প্রচেষ্টার মধ্যে তেমন কোনো সুরুচি বা শোভনতার পরিচয় আছে বলে' আমার মনে হল না।

মনটা খুবই খারাপ হয়ে গেল।

ওইদিন সন্ধ্যার একটু আগে এমন আবার কতকগুলি খবর কানে এল যাতে বুঝলাম, নি-র জীবন দুর্বহ হয়ে উঠেছে। শুনলাম : শো-র 'ফ্যানেরা' দল বেঁধে আজ বৈকালে নি-র বাড়ীতে হানা দিয়েছিল, 'শো জিন্দাবাদ' বলে' নৃত্য করেছিল জাতীয় পতাকা উড়িয়ে, 'নি বরবাদ' বলে' ইঁট ছুঁড়েছিল কৃষ্ণ পতাকা দুলিয়ে।

নি-র প্রতি অহেতুক করুণায় মনটা হঠাৎ টনটনিয়ে উঠল যেন।... যাবো একবার তার কাছে? কখন-ও তো যাই নি—যাওয়া কি সঙ্গত হবে?—ভাবলাম।

সু-র ওপর রাগ হ'ল অত্যন্ত। গাড়ী বার করে সোজা এলাম সু-র বাড়ী-তে। যেন রাজ্য জয় করেছে—এমন উত্তেজনা নিয়ে সু আমাকে অভ্যর্থনা করল। বুকে জড়িয়ে আলিঙ্গন জানাল পৈশাচিক পুলকে।

—এ কী!

চমকে নিজেকে সু-র বুক থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে বললাম:

—আবার মদ খেয়েছ?

—আনন্দে বন্ধুবর! তা মাত্র দুচার ফোঁটা! মাতাল হবো না! ভয় নেই!

—× × ×

—জগতের কী খবর বলো!

—× × ×

—মাতালের সঙ্গে কথা কইতে ঘৃণা? অল রাইট্।

—আমার বাড়ী যাবে?

—ঠাট্টা করছ বৎস? মদ খেয়ে কেউ গুরুদেবের কাছে যায়?...তা কোনো কোনো গুরু মদ-ও টানেন বটে—ভয় করি নে তাই। যেতে বলো, আলবৎ যাবো।...কিন্তু মাতাল কি মা-র পা ছুঁতে সাহস করে কখনো?

—তোমার বন্ধুবান্ধবদের যে আর দেখছি নে!

—কারুকে ডাকি নে। ডাকবো-ও না। এবার থেকে আমি একা। একা থাকবো ভাবের ঘোরে!

—ভালো!

—খুবই রাগ করছ বৎস!

—তা করছি!

—করো! প্রাণভরে করো! আমি কিন্তু 'ডিটারমিণ্ড'—

—মদ খাওয়ায়?

—আলবৎ!...নি-র জন্যে বাঁচার দুঃখে মদ খেতাম, এবার শো-র জন্যে মরার আনন্দে মদ খাবো।

—আচ্ছা খাও! আমি উঠি।

—উঠছ?...আচ্ছা যাও। মাঝে মাঝে দেখে যেয়ো মরতে আমার আর কতদিন বাকি আছে!

— × × ×

—কই, বলে' তো গেলে না শো কেমন আছে?

—কাল থেকে তার খবর রাখি নি।

—একটা ফোন-ও কি করো নি প্রিয়বন্ধু? আমার জন্যে-ও তো একটু করতে হয়!

—আচ্ছা উঠি এখন!

—শো-র বাড়ীতে একবার হয়ে যাও বৃ!

—ভাবছি নি-র কাছে যাবো একবার।

—নি-র কাছে!

চমকে উঠল সুঃ

—কেন?

—এমনি-ই!

—যেতে হয় অন্যদিন যেয়ো। আজ নয়। নি-কে তুমি চেনো না। কখনও তো যাও না, আজ হঠাৎ গেলেই সে ভাববে, তাকে উপহাস করতেই তুমি গেছ।...তোমার মান সে রাখবে না।...যেয়ো না!

উঠলাম।

—যেয়ো না বৃ, আবার বলে' দিচ্ছি! তোমাকে সে অপমান করেছে যদি শুনি, হয়তো রাগ সামলাতে পারবো না, খুন-ই করে' বসবো।...যেয়ো না!

তবু এলাম নি-র কাছে। কী জানি কেন মনে হ'ল নি আমাকে দেখে তুষ্ট হবেন, হয়তো সান্ত্বনা-ও অনুভব করবেন!...

শুনেছিলাম নি সর্বদাই স্তাবকদল পরিবেষ্টিত হয়েই বসে থাকেন, আজ তাঁর গৃহ দেখলাম শূন্য।

আমি যে হঠাৎ আসব—নি এটা কল্পনা-ও কখনো বোধ করি করেন নি। অকস্মাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে আমাকে আসতে দেখে কেমন হতভম্ভ-ই যেন হয়ে গেলেন। মারমুখী দৃষ্টি নিয়েই বুঝি চেয়ে দেখলেন আপাদমস্তক। তারপর হঠাৎ কী একটা কথা মনে পড়ায় চমকে জেগে উঠলেন :

—ইয়েস্! আপনাকে সেদিন 'ইন্‌ভাইট্' করেছিলাম! ধন্যবাদ! বসুন!

বসলাম। ইউরোপীয় বেশে সাজানো-গোছানো ঘর। দেওয়ালে যত ইউরোপীয় আর্টিষ্টদের ছবি। দা ভিঞ্চির 'মোনা লিসা'। টিসিয়ানের 'লাভানিয়া'। ভেরোনিজের 'ভেনাস ও মার্স'। রুবেন্‌স্-এর 'প্যারিসের বিচার'।...ঘরের পূর্ব কোণে বেশ উঁচু একটা তে-পায়ার ওপর মাইকেলেঞ্জেলোর 'আদমের' মত সুঠাম একটি নগ্ন পুরুষের প্রস্তর মূর্তি!

—আমার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেছেন বলে' আমি কৃতজ্ঞ! বললেন নি, একটা সিগারেট 'অফার' করে'। নিজের ঠোঁটের ফাঁকে তুললেন একটা। দেশলাই জ্বেলে খাতির করে' আমার সিগারেটটা ধরিয়ে দিলেন, নিজেরটায় জ্যোতি জ্বালিয়ে আরামপ্রদ একটা টান দিলেন। স্মার্ট পুরুষের ভঙ্গীতে টানের স্ফূর্তিটা উপভোগ করলেন খানিকক্ষণ। তারপর :

—হাউ ক্যানাই অনারু মিঃ ব্র, কী খাবেন বলুন!

—কিছু না।...এই খানিকক্ষণ আগে খেয়ে আসছি!

—তাকি হয়!...বয়!

হাঁক দিলেন নি। বললাম :

—আর একদিন এসে কিছু না হয় খেয়ে যাবো মিস্ নি, আজ থাক।

—বড্ড দুঃখিত হচ্ছি কিন্তু!

—আচ্ছা শুধু এক কাপ চা!

বয় এল।

—দুটো ফ্রাই, দুখানা অমলেট, চারখানা টোষ্ট্, দুকাপ চা!

অর্ডার দিলেন নি। ব্যস্ত হয়ে বললাম :

—আপনি ভুল বুঝছেন নি, শো আমার বন্ধু!

—বন্ধু?...এ্যাব্‌সার্ড! পুরুষ কখনও মেয়েমানুষের বন্ধু হয়? কী রকম বন্ধু?

অবিশ্বাসের হাসি হাসলেন নি।

বয় এল চা-এর ট্রে সাজিয়ে।

নি-কে তাঁর দুঃসময়ে সান্ত্বনা ও সহানুভূতি দেখাবার জন্যেই হঠাৎ এসেছিলাম। এখন মনে হ'ল—পালাতে পারলেই যেন বাঁচি। আমার মুখ দেখে মনের এই ভাবটা নি বুঝলেন কি না জানি না। অবশ্য বললেন:

—যাকগে! এ-সব প্রাইভেট এ্যাফেয়ার্স নিয়ে আলোচনা না করাই ভালো!...আসুন চা পান করি!

কিছুক্ষণ কাটল নীরবে। হঠাৎ নি:

—জিজ্ঞাসা না করে পারছি না, ক্ষমা করবেন, শো-র আশা কি সত্যসত্যই ত্যাগ করছেন?

—হ্যাঁ!

বললাম স্পষ্টভাবেই।

—তবে শো-র বাড়ীতে ঘনঘন যেতেন কেন? সে-ই বা আপনার বাড়ীতে গোপনে আসতো কেন?

—× × ×

—বুঝতে পারছি লুকোচ্ছেন! কিন্তু লুকিয়ে লাভ কী, মি ব্! টেক মি এ্যাজ ইওর ফ্রেণ্ড, হ্যাঁ, আমিই কেবল আপনার বন্ধু হতে পারি, 'কজ আই ডোণ্ট্ লাভ ইউ এ্যাণ্ড ইউ টু ডোণ্ট লভ মি...নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন, ভদ্রতা আর ভালবাসা এক জিনিষ নয়?...আপনি আমার সঙ্গে ভদ্রতা করেন, আমি আপনার সঙ্গে ভদ্রতা করি—এ্যাণ্ড দেয়ারফোর উই আর ফ্রেণ্ডস্। সত্যসত্যই ফ্রেণ্ডস্, কবে থেকে বলুন তো? আমার কিন্তু এখনো মনে আছে। কী সুন্দর তখন অভিনয় করতেন।...এখন যেন একেবারে মিইয়ে গেছেন!

হাসলাম।

—আচ্ছা, ঠিক করে বলুন তো, আমার অভিনয় কেমন লাগে আপনার!

করুণা হল। বললাম:

—খুবই ভালো লাগে!

—বেশ একটু হিরোইক ভাব জাগে নাকি?

—জাগে।

—বাঙলাদেশে শো-কে নিয়ে সবাই মাতামাতি করে। কী যে শো-র অভিনয়! মিন্‌মিনে ভিজে বেরালের মত।...বড় দুঃখ হয়—এ দেশটা শক্তির পূজা করলো না। কলকাতার চেয়ে বোম্বে ঢের প্রগতিসম্পন্ন।...গেলে হয়!

—আমার বিশ্বাস বোম্বে গেলে আপনি খুবই নাম পাবেন।

—আজ সকাল থেকে কথাটা মনে হচ্ছে মিঃ বু। বোম্বের কোনো কোম্পানীর সঙ্গে আপনার জানাশোনা আছে?

—দাদুর আছে!

—গেলে হয় তাঁর কাছে।...আমি বুঝতে পারছি মিঃ বু, কলকাতায় কেউ আমাকে চিনতে পারবে না। আর নামটা এখানে খুবই খারাপ হয়ে গেছে। মাতাল মেয়ে বলেই আমাকে জেনেছে সবাই।

— × × ×

—মদ যে একেবারে খাই না, তা তো নয়। কিন্তু যে-ভাবে দেশে প্রচার হয়েছে, তাতে লোকে নিশ্চয়ই ভাবে আমি মদে-ই বুঝি ডুবে থাকি।

চা-পান শেষ করে নি আর একটা সিগারেট ধরালেন। তারপর:

—সুযোগ পেলে বোম্বে যাই।...শো-কে আপনি সু-র হাতেই ছেড়ে দিচ্ছেন—এ যদি সত্য হয়, তবে তো আমার আর কোনো আশাই নেই।... একদিন আপনার ভরসায় সু-কে আশা করছিলাম।...আপনি জানেন না, ইন্‌ডিরেক্ট্‌লি আপনি আমাকে কত সাহায্য করছিলেন।...

—সু-কে সত্যি আপনি আশা করবেন না, মিস্ নি!

বলতে বলতে আমার ভাষার স্খলত্বে আমি শিউরে গেলাম। নি-র সঙ্গে কথা কইতে কইতে তাঁর মত কথার ভঙ্গীটা কখন জানি আরম্ভ করে ফেলেছি!

—আশা করবো না?

নি বললেন দৃঢ় ভঙ্গীতে ঃ

—আশা যদি ছাড়তে হয়, সহজে তাকে ছাড়বো ভাবছেন ?...এমন কামড় তাকে দিয়ে যাবো যাতে ডাকাত মেয়ে এই নি-কে তার মনে থাকবে।...তার জন্যে আমার কী হয়েছে জানেন...বিশ্বাস করে কতটা আমি অগ্রসর হয়েছিলাম খবর রাখেন ?...শো-কে সে যদি বিবাহ-ও করে থাকে, আমাকে-ও বিবাহ করতে সে বাধ্য।...আমি করাবো।...আমি দেখতে চাই আইনতঃ তার সম্পত্তিতে আমারো অধিকার।

—× × ×

—হিপক্রিট্‌টা আজ কয়েকদিন হল পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে। দেখবো কতদিন পালিয়ে বেড়ায়! ভাবছে খবরের কাগজে নিন্দে রটিয়ে, কিংবা বাড়ীর সামনে কতকগুলো ভাড়াটে গুণ্ডা পাঠিয়ে আমাকে সে ভয় পাওয়াবে, দমিয়ে রাখবে।...হাতে যে একটা পয়সা এখন নেই, সংগ্রহ করি কিছু, তারপর দেখাবো কী করতে হয়।

—মনে হচ্ছে মিস্‌ নি, উত্তেজনাবশে ভুল পথটাকেই আপনি ঠিকপথ মনে করছেন।...সু একজন ধনী ব্যক্তি। অনেক ক্ষমতা তার। একজন স্ত্রীলোক হয়ে কী এমন তার ক্ষতি করতে পারবেন ?...শত্রুতা করে' কি পেরে উঠবেন তার সঙ্গে ?

আমার এই স্থূল কথাগুলি অকস্মাৎ মন্ত্রের মত কাজ করল।...অবিশ্বাস্য ব্যাপার ঃ হাউ হাউ করে' হঠাৎ কেঁদে ফেললেন নি। আমার হাতদুটো জড়িয়ে ধরে ককিয়ে উঠলেন অসহায় আর্তের মত।

—আমি এখন কী করবো মিঃ বৃ ?

বললেন নি ঃ

—কলকাতায় আমার সত্যিই আর স্থান হবে না! আমি বেশ বুঝছি, হবে না! কোনো পুরুষই আমাকে আর তেমন ভালো চোখে দেখে না। সু-টা আসতো বলে' মদের লোভে আসতো অনেকে। এখন সবাই সরে পড়ছে।...

—ঠিকই বলেছেন, সু-র সঙ্গে আমি পেরে উঠবো না!...কিন্তু সু কি এমনি আনগ্রেটফুল হবে?...আপনি জানেন না মিঃ বু,...আর কিছুদিন বাদে...আমি কত অসহায়! শো-র মত আমার লোকবল নেই, সু-র মত নেই অর্থবল...আমি কী করবো?

নি-কে এমন অসহায়ভাবে দেখব, কখন-ও ভাবি নি। বড় কষ্ট হল। বললাম:

—অধীর হবেন না, সব ঠিক হয়ে যাবে!

—কী আর ঠিক হবে!...যাক গে। আর ভাবতে পারি না।

একটু থেমে:

—আজ সকাল থেকে, মিঃ বু, কেন যে এত দুশ্চিন্তা জাগছে!...কি করে' শান্তি পাই বলুন তো?

—কিছু ভাববেন না, সব ঠিক হয়ে যাবে!...এখন উঠি!

—যা হ'ক আপনি এলেন, দুটো মনের কথা বলে হাল্কা হলাম!... আসবেন মাঝে মাঝে!

—চেষ্টা করবো!

বললাম সহানুভূতির সুরেই। নি বললেন:

—মনে হচ্ছে আপনি-ই আমার বন্ধু। এতদিন আপনাকে ঠিক চিনতে পারি নি!

নি আর একটা সিগারেট আমাকে অফার করলেন। মুখে সেটা তুলতেই দেশলাই জ্বেলে সেটা ধরিয়ে দিলেন ক্ষিপ্র সৌজন্যে।

সিগারেটটা আঙুলের ফাঁকে নিয়ে উঠে দাঁড়ালাম।

—চলি তবে, মিস্ নি!

নি-ও উঠে দাঁড়ালেন। আমার সঙ্গে নিচে গাড়ী পর্যন্ত এলেন। গাড়ীর দরজাটা খুলে দিয়ে:

—শো-র কাছে মাঝে মাঝে যান তো?...সত্যি খুবই লজ্জিত। বলবেন, আমি তার কাছে ক্ষমা চেয়েছি।

—বোধ হয় এখনি যাবো তাঁর কাছে। বলবো, নিশ্চয়ই বলবো।

—শো কি সত্যই অসুস্থ?

—বোধ হয় ওটা খবরের কাগজের বাড়াবাড়ি। সুস্থ-ই আছেন বোধহয়।

—আমি কি আপনার সঙ্গে একবার যেতে পারি?

কথাটা প্রত্যাশা করি নি। বিস্মিত হয়ে নি-র মুখের দিকে তাকালাম। বললেন নি:

—সত্যসত্যই আমি খুব লজ্জিত। কিন্তু বিশ্বাস করবেন, সু-কে ফিরে পাওয়ার জন্যেই এমন একটা অন্যায় কাজ আমি করে' বসেছি।...ক্ষমা চাইতে যাওয়া উচিত না?

—এখন যাওয়া বোধ হয় উচিত হবে না।

—কেন?

—সেই বিরোধের পর শো-র মন হয়তো খুব তিক্ত হয়ে আছে, আপনার উপস্থিতিটা উদার মনে হয়তো গ্রহণ করবেন না।

—তবেই দেখুন, শো-র ভক্তরা কী সব মিথ্যা রটায়। বলে, শো নাকি উদার প্রকৃতির মহিলা। কোন্ একটা পত্রিকা-ও বুঝি লিখেছে, আমার বিরুদ্ধে শো যে কোনো কেস করলো না—এটা তার উদার হৃদয়েরই পরিচয়!

—বোধ হয় কথাটা ঠিকই লিখেছে, মিস্ নি। আপনার নামে কোনো নিন্দা তাঁর মুখে আমি শুনি নি।

—ইজ্ ইট্!...আমি যাই আপনার সঙ্গে। সত্যি, সেই ঘটনার পর থেকে আমি বড়ই লজ্জা বোধ করছি!

খুবই বিব্রত বোধ করলাম! নি-কে এ-ভাবে সঙ্গে করে' নিয়ে শো-র বাড়ীতে হঠাৎ যাওয়া সত্যই আমার সঙ্গত বলে' মনে হ'ল না। শো এখন কীভাবে আছে, কোন্ 'মুডে' আছে বন্ধু হিসাবে আমার তা জানা দরকার, বোঝা দরকার। চারদিক না দেখে, না ভেবে ঔদার্যের একটা সস্তা উদাহরণ দেখানোর প্রলোভনে পড়া নির্বুদ্ধিতা ছাড়া আর কিছু না। অথচ কিছুতেই নি-কে 'অ্যাভয়েড্' করতে পারছি না বলে' অন্তরতঃ খুবই বিব্রত বোধ করলাম। বললাম আমতা-আমতা করে:

—দেখুন, আমার সঙ্গে আপনার যাওয়াটা বোধ হয় ঠিক হবে না। শো-র ধারণা হতে পারে, আপনার নিজের থেকে কোনো ইচ্ছা ছিল না, আমি-ই আপনাকে 'পারসুয়েড' করে ধরে নিয়ে গেছি।

—× × ×

—এক কাজ করুন। প্রথমে তার সঙ্গে ফোনে কথা করে মনের মালিন্যটা মুছে ফেলুন। তারপর একদিন যান, দেখাবে ভালো।

—আচ্ছা, তাই হবে!... তবে কি জানেন, আমার মনটাকে সব সময় ঠিক 'কনট্রোল' করতে পারি না। একটু পরেই হয়তো এমনি খারাপ হয়ে যাবে, শো-র কাছে যাবো কি, তাকে খুন করতে ইচ্ছা যাবে।...মনটাকে কি করে যে কনট্রোল করা যায়!

বললেন নি বিষণ্ণ ঔদাসীন্যে।...গাড়ীর মধ্যে গিয়ে বসলাম। হাত তুলে বললাম:

—আচ্ছা নমস্কার!

নি, মনে হল, নমস্কার কথাটির জন্যে যেন প্রস্তুত-ই ছিলেন না। থমকে থতমত খেয়ে, বেশ কয়েক সেকেণ্ড পরে উচ্চারণ করলেন:

—নমস্কার!

শো-কে তার বাড়ীতে এসে কিন্তু পেলাম না।

—সন্ধ্যায় গাড়ী নিয়ে কোথায় বেরিয়েছে, মথুর বলল।...যাক, ভালো আছে তাহ'লে।

—এলে বোলো, আমি এসেছিলাম! রাত-ও হ'ল, ন-টা প্রায় বাজে, এখন চলি!

—এমনি চললেই হ'লো!

বলে' শো প্রবেশ করল লাইব্রেরী-ঘরে। এখানে এসেই একটু বসেছিলাম।

—কতক্ষণ এসেছ?

আনন্দে ঝলমলিয়ে উঠে জিজ্ঞাসা করল শো। তামাসা করলাম:

—তা অনেকক্ষণ। সাড়ে তিনঘণ্টা!

—মিথ্যে কথা!...আমি বেরিয়েছি ঘণ্টা দুই হ'লো!

—উনি এইমাত্তর আসছেন মা!

বলল মথুর।

—তা-ই বলো!...চলো এ-ঘর থেকে!

বিশ্রামঘরে এসে তারপর:

—তুমি আজ বাড়ীতে থাকলে না কেন?

—তুমি-ই বা থাকো নি কেন?...দিনরাত ঘরে বসে' থাকতে ভালো লাগে?

—সে কথা ঠিক!

—এখন তাহ'লে বেশ ভালোই আছ?

—কিছুই তো হয় নি। তোমরা-ও যেমন! যা একটু দুর্বল বোধ করছি। কপালের কাটাটা, দেখছ কেমন কায়দা করে' চাপা দিয়ে রেখেছে ডাক্তার!...বোঝা যাচ্ছে?

হাসলাম। তারপর :

—গেছলে কোথা ?

—একটু আসছি, বোসো !

বলে' শো বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। খানিক পরে এল কাপড় বদলে। একেবারে কাছ ঘেষে বসে' বলল :

—বলো দেখি কোথায় গেছলাম ?

—বলবো ?

—× × ×

—বলবো ?

—বলতে তো বলছি !

—ঠোঁটে হাসি, চোখে আলো আর চরণে নৃত্য দেখে মনে হচ্ছে—স্বর্গে, নন্দনরাজ্যে।

—ঠিক। নন্দনরাজ্যেই গেছলাম !

প্রত্যাশা করি নি এই উত্তর। বিস্মিত হয়ে বললাম :

—মানে ?

—তোমার বাড়ী গেছলাম মশাই !...গুরুদেবকে দেখে এলাম !...

—× × ×

—তুমি তো বন্ধু, আর এদিক মাড়াও না ! মরেছি কি বেঁচে আছি, নাও না খবর ! যেতে হল।...তা'রপর কী যে আজ খবরের কাগজে বেরুল—সারাদিন সুরু হল লোকজনের ভিড়।...মথুর বেচারা তো ফোনে কৈফিয়ৎ দিতে দিতে মুখ-ই ব্যথা করল।...কী করবো, পালালাম বাড়ী থেকে।

—× × ×

—ভেবেছিলাম যাবো আর আসবো ! কিন্তু কী মিষ্টি গুরুদেবের কথা ! কী চেহারা ! যেন নারায়ণ !...কথা শুনতে শুনতে দু-ঘণ্টা কোথা দিয়ে কেটে গেল।...কত লোক এসেছে শুনতে।...তোমার বুঝি এ-সব শুনতে ভালো লাগে না ?

—না !

—নটি বয় ! কেবল মিথ্যে কথা বলে' বাহাদুরী করা !

—মা-র সঙ্গে দেখা হ'লো ?

শো আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল মা-র প্রসঙ্গে। বুঝলাম মা তাকে যত্নসমাদর করেছেন।...আজ-ই সকালের কাগজে শো-র কথা পাঠ ক'রে, এবং সে যে শয্যাশায়িনী—এ-সংবাদটা জেনে আমার বোনেরা খুবই উদ্বিগ্ন হয়েছিল। এই শো-ই যে সু-র ভাবী পত্নী—কথাপ্রসঙ্গে কোন সময়ে যেন মা ও বোনদের জানিয়েছিলাম। জানিয়ে যে ভালো করেছিলাম, এখন তা প্রমাণিত হল। আশ্বস্ত হলাম অন্তরে। জিজ্ঞাসা করলাম ঃ

—মা-কে দেখলে কেমন ?

—মা, মা-ই বটে। তা' আমার কি সাহস হয় দেখা করার ? ফুল সেই ভিড়ের মধ্যেই আমাকে ধরে ফেলল। নিয়ে গেল মা-র কাছে। কমলাকে-ও দেখলাম।...কী সুন্দর সংসার। নন্দনরাজ্য নয় তো কী ! মানুষ তো নয়, সব দেবতা ! কথায়, ব্যবহারে, স্নেহে, সৌজন্যে !

—কী পেলে গুরুদেবের কাছে ?

—তোমার কাছে যা পাই !

—খুব বুঝলাম !

—পাওয়ার মত যা পাই তা কি বলে' বোঝাবার ?

—একেবারে স্পষ্ট !

—তামাসা করছ ! করো গে !...কিছুদিন আগে যদি সাহস করে' তোমার বাড়ী যেতাম, আরো কিছুদিন গুরুদর্শন হ'তো। তা আর ভাগ্যে নেই। শুনলাম, কাল-ই চলে যাচ্ছেন !

—তা যাচ্ছেন !

—এটা ভেবে কষ্ট হচ্ছে না ?

—সন্ন্যাসীর আবার কষ্ট ?

—তুমি সন্ন্যাসী ? ইস্ ! হতে দিলে তো !

—নারী-ই দেখছি নরকের দ্বার !

—যতই গালাগাল দাও বন্ধু, ধরেছি যখন, আর ছাড়ছি নে!...তা সন্ধ্যায় বেরিয়েছিলে কোথায়?

—শুনলে এখনি দারোয়ান দিয়ে তাড়াবে।

—নটি বয়! ইচ্ছা করছে পিঠে একটা ঘুসি বসাই...বলো শীগগীর কোথায় গেছলে!

—সু-র বাড়ীতে।

মুহূর্তে সমস্ত আলো যেন নির্বাপিত হল শো-র মুখের আনন্দ থেকে। কৌতুক করতে গেলাম:

—দারোয়ান ডাকছ না তো?

শো কোনো জবাব-ই দিল না!

—আরো কোথায় গেছলাম জানতে চাও?

—× × ×

—নি-র কাছে!

—নি-র কাছে?

—বলছ বোধ হয় নরকে গেছলাম?

—ছি!...তা বলবো কেন?

একটু চুপ করে থেকে:

—বেচারা নি! কী অপমানটাই না পাচ্ছে!...বড় কষ্ট হয় প্রিয়বন্ধু।

—নি আসতে চাইছিল তোমার কাছে। অনুতপ্ত সে।...ক্ষমা চায়।

—× × ×

—একদিন আসবে হয়তো।...ভালোভাবে 'রিসিভ' করলে বর্তে যাবে!

—খুব দমে গেছে বেচারা!

—প্রকৃতিটা তো দমে যাওয়ার নয়। তবু মনে হল, গেছে।

—আহা!...জানো, কাগজে 'সাজেস্ট' করেছে ওকে যেন আর কোনো ছবিতে না নেয়া হয়।...এটা খুবই অন্যায়।

—নি বলছিল কলকাতা থেকে চলে যাবে। বোম্বে [illegible]।

—আমি ওকে এ-বিষয় সাহায্য করতে পারি।...তুমি-ও বোধ হয় পারো।...পারো না ?...আমার তো মনে হয় বোম্বে গেলে ও খুব 'ফ্লারিস্' করবে।

—তুমি তা'বলে এটি ওকে বলো না। ভুল বুঝতে-ও পারে। ভাবতে পারে ওকে সরিয়ে দেয়ার কৌশল করছ।

চমকে চুপ করে গেল শো।

কিছুক্ষণ কাটল নীরবে। জিজ্ঞাসা করলাম :

—'শকুন্তলা'র সুটিং তো সুরু হবে কয়েকদিন পরেই। তোমার 'ডেট্' পেয়েছ ?

—দেরী আছে। দিন পনের বাদে। ততদিনে কপালটা নিশ্চয়ই ভালো হবে।

—তোমার কপাল ভালো হয়েই আছে!

কৌতুকের পরিবেশ সৃষ্টি করতে গেলাম আবার :

—অমন কপালে কলঙ্ক সইবে না প্রকৃতি!

—কেবল তামাসা! তোমার একটু অধঃপতন হয়েছে!

—না হওয়াটাই অস্বাভাবিক!

—মানে ?

—মানে খুবই সোজা! 'বিশ্বামিত্রে'র অধঃপতনের জন্যে দায়ী কে বলো ?

—শুধু কি 'মেনকা' ?

—নয় ? বিশ্বামিত্র কি তাকে স্বর্গ থেকে ডেকে এনেছিল ?...কারা সন্ন্যাসীর তপোভঙ্গের জন্যে ষড়যন্ত্র করে ? কারা অহংকার করে' বলে : ধরেছি যখন আর ছাড়ছি নে ?

—যাই বলো বিশ্বামিত্র তোমাকে মানায় না!

—খুব মানায়! যদি দুষ্মন্তর অংশ অভিনয় করার অনুরোধ আসতো, প্রত্যাখ্যান করতাম।

—কেন ?

—তুমি যে-ছবিতে শকুন্তলা, সে-ছবিতে আমি দুষ্মন্ত হতে পারি নে!

—এতই কুরূপা আমি ?

—ওটা মুখে না বললেও লোকে জানে। কিন্তু এটাই একমাত্র কারণ নয়।

শো হাসতে লাগল পরম কৌতুকে। তারপর :

—কথার যেন ফুলঝুরি।...তা কারণটা কী মশাই ?

—যাকে মনেপ্রাণে চিনি, মন দিয়েছি, আত্মা দিয়েছি, সভাসমক্ষে বলবো, তাকে চিনি না, সে বহুচারিণী, দূর হয়ে যাক, এটা যে বলতে স্পর্ধা করে, সেই দুষ্ট দুশ্চরিত্রের অংশাভিনয় আমার দ্বারা সম্ভব না।

বললাম কৃত্রিম গাম্ভীর্যের অপরিমিত ঔদাস্যে। বুক দিয়ে হেসে উঠল শো। বলল সঙ্গে সঙ্গে :

—কিন্তু ঋষি হয়েও যে নারীরূপে মুগ্ধ হ'লো, মত্ত হ'লো, ঋষিত্ব জলাঞ্জলি দিল, তার অংশ তোমার দ্বারা সম্ভব হবে, কেমন ?

—অবশ্যই। মিতা জানে, আমার অধঃপতন সুরু হয়েছে !

—বাব্বা !

—হাসি নয় ! আত্মদহনের যে কী জ্বালা তা জানো না।...সাধে কি শাস্ত্রে বলে নারী নরকের দ্বার !

আবার হেসে উঠল শো। বলল :

—গালাগাল দিচ্ছ। বলতে চাচ্ছ যেন আমার দ্বারে এসেই...

—স্পষ্টতঃ তা বলি নে বটে ! কিন্তু মা বলতেন, ভাবতেন, বকাবকি করতেন...

—মিথ্যা কথা ! জানো, আমার সম্বন্ধে মা-র কত উচ্চ ধারণা ?

—আত্ম-অহংকারপ্রচারে মাতৃভক্তি মাতৃনিন্দার মতই ঘৃণার্হ !

বলতে বলতে আমি উঠলাম।

—উঠছ যে !

—ঘড়িতে দেখেছ ক-টা বেজেছে ?

—এ কী দশটা !

—ইন্দ্রাসন আজ নিশ্চয়ই ফাইন মকুব করবে না !

শো-ও উঠল। তারপর :

—আজ বড় রাত করে এলে। কাল সন্ধ্যার আগেই এসো। আসবে তো?

—এ-রকম মিতার বাড়ীতে না-আসাই বোধ হয় সঙ্গত।

কৌতুকদীপ্ত দুষ্ট চোখ মেলে শো তাকাল আমার দিকে। কাতরতার অভিনয় করে' বললাম:

—কী মোহে, হায়, আগমন করবো?...একখানি গান নেই, দুটো মিষ্টি কথা নেই, এমন কি এককাপ চা-ও নেই—

—ওরে পাজি লোক!...এই রাত্তিরে চা দিলে তুমি খেতে? খাবারদাবার কিছু দিলে খুসী হতে?...আমি তোমার মন জানি না?

—হায়, ভদ্রতা দেখিয়ে একবার একটু তোষামোদ করার আগ্রহ-ও নেই!

শো স্তব্ধ হয়ে দাঁড়াল কিছুক্ষণ। তারপর হঠাৎ আমার হাত ধরে জোর করে বসিয়ে দিতে গেল চেয়ারে। তখন:

—ও কি! না, না, আর বসবো না! রাত অনেক হল! ছাড়ো!

—ছাড়বো না!...কেন অমন কথা বললে? না খাইয়ে ছাড়বো না—তা বাড়ীতে বকুনি-ই খাও আর মার-ই খাও!

—× × ×

—আমি চা খাওয়াবো, কফি খাওয়াবো, কোকো খাওয়াবো, ওভালটিন খাওয়াবো...সারারাত গজ গজ করবো কানের কাছে...

—হার মানলাম, ছাড়ো!

—না ছাড়বো না! কেন অমন কথা বললে? আর বলবে?

—× × ×

—উত্তর দিলে না? বসো এইখানে। চা না খাইয়ে ছাড়বো না!

—এই রাত্রে!

—আচ্ছা চা নয়, কফি!

—রাত্রে যদি ঘুম না হয়...আমার কিন্তু!

—সে তো আমি জানি—কিন্তু এখন আর শুনতে চাই না কোনকথা! বন্ধুকে যে বোঝে না, তার এর চেয়ে কঠিনতর শাস্তি পাওয়া দরকার!...আরো দেরী করিয়ে দিয়ে জব্দ করবো...বকুনি খাওয়াবো!

—যখন শুনবে না, দাও তবে একটু চা...জলদি!

—জলদি-র নিকুচি করেছে। দাঁড়াও না, আমি গান-ও গাইবো কানের কাছে।

অবশ্য মিথ্যা ভয় দেখালো শো। আধঘণ্টার বেশি আটকাল না। মিতা সে আমার, সুমিতা, সে যদি না বুঝবে আমার সুবিধা-অসুবিধা, ভালোমন্দ—কে বুঝবে?...জানে সে, বাড়ীতে গুরুদেব এসেছেন, তাঁর কাছে আমার একটু থাকা দরকার; আত্মীয়স্বজনেরা এসেছেন—আদর অভ্যর্থনা জানানো সঙ্গত; মা রয়েছেন—যথাসময়ে খাওয়া-দাওয়া করে তাঁকে নিশ্চিন্ত করা কর্তব্য।

চা-এর কাপটা আমার হাতে দিয়ে শাসনের সুরে শো বলল:

—ফের যদি কোনদিন সাতটার পর আসো, সারারাত কিন্তু আটকে রাখবো জেনো।

—তবে তো দেখছি সাতটার পর-ই আসা বুদ্ধিমানের কাজ!

বললাম কৌতুক করে।

—তুমি থাকতে পারো সারারাত?

—এটা এমন কঠিন কাজ বলে তো মনে হচ্ছে না!

—তুমি হয় পাথর, নয় প্রতারক!

—দুটোর একটা-ও নয়। আমি বন্ধু!

—ইস্ ভারি অহংকার। ঋষিত্ব ফলানো হচ্ছে!

—ঋষিত্ব নয়! ঋষিরা ঠেকে শেখে! বলো বন্ধুত্ব! বন্ধুরা দেখে শেখে!

—তোমাকে যত দেখছি, অবাক হচ্ছি প্রিয়বন্ধু!

—নিশ্চয়ই অস্বাভাবিক কিছু দেখছ আমার মধ্যে!

—অস্বাভাবিক? সচরাচর যা দেখি—তা দেখতে না পেলেই মনে হয় বটে অস্বাভাবিক!

—কিন্তু যে-হিসাবে আমি অস্বাভাবিক, সে-হিসাবে তুমিও কি অস্বাভাবিক নও সুমিতা?

—কী তুমি বলতে চাইছ আমি বুঝতে পারছি প্রিয়বন্ধু।...বড় দুর্বল জায়গায় তুমি ঘা দিয়েছ।...নারী হয়ে জন্মগ্রহণ করে তোমার সান্নিধ্যে আত্মসম্বিত রক্ষা করা এবং বন্ধু-সাধনায় সংযত থাকা যে কত বড় কঠিন কর্ম, নারী যদি হতে, তবেই বুঝতে!

—× × ×

—বার বার তুমি স্বপ্নে আসো, বার বার আমি আচ্ছন্ন হই দুর্বহ স্বপ্নের দুঃসহ বাসনায়।...সু-র জন্যে, সু-র ভালোবাসার মর্যাদায়—গোপন জীবনে কত ত্যাগ যে আমি স্বীকার করি, সু যদি জানতো—মুহূর্তের জন্যও বিপথে যেতো না!

—× × ×

—সু-কে ভালোবাসি। আজ-ও, আজ-ও ভালবাসি। স্পষ্ট, স্থুল, কঠিন সে ভালবাসা। পাথরের মত কঠিন। নড়ানো যায় না। সরানো যায় না, তাই রক্ষা। তবু তুমি আসো, ঝর্ণার মত কলকল ছলছল করো। বুঝি টলে যাই। বুঝি গলে-ও যাই। ভাগ্যে তুমি সূর্যের মত ভাস্বর, ছোঁয়া যায় না, ধরা যায় না!

কৌতুকময় তামাসার পরিবেশটি হঠাৎ গম্ভীর রূপ ধারণ করল। শো বলে চলল আত্মগতভাবে:

—তুমি তো পাবার মানুষ নও, ভাবার মানুষ তুমি। তোমাকে নিয়ে প্রাণের মত সংসার নয়, গানের মত মুক্তি রচনা-ই সম্ভব। ভাগ্যে ঈশ্বর এ বোধটা আমাকে দিয়েছেন তাই বেঁচে গেছি, বেঁচে আছি। নইলে নোঙর-ছেঁড়া নৌকার মত আবার আমাকে ভাসতে হত। তাতে হত এই: তোমাকে-ও পেতাম না, সু-কেও হারাতাম।

শো যা বলছে আমার কাছে তা নূতন কথা নয়। বহুদিন আগেই একথা অনুভবে আমি জেনেছি। বিস্ময় জাগল না তাই।...গম্ভীর পরিবেশটাকে কৌতুক করে তরল করে আনার তাই চেষ্টা করলাম।

—দুর্ভাবনা গেল! সু-কে তাহালে সহজে এবার আনা যেতে পারে!

—আনতে হবে না, সে নিজেই আসবে, না এসে পারবে না! কিন্তু মানুষটা আসুক, অমানুষটা নয়! কষ্ট হচ্ছে খুবই, শাস্তি দিতে গিয়ে শাস্তি পাচ্ছি চতুর্গুণ, তবু তো বাঁচতে হবে প্রেমের জন্যে, কল্যাণের প্রতীক্ষায়?...নারী হয়েও তোমার মত পুরুষকে বন্ধুরূপে বরণ করায় কী অস্বাভাবিক ধৈর্যের সাধনা আমাকে করতে হচ্ছে, আজও হচ্ছে—সু যখন স্পষ্টতঃ জানবে, আমি স্থির জানি, মানুষ না হয়ে সে তখন পারবে না।

স্বপ্ন-সম্মোহিতের মত শো এগিয়ে এল আমার সামনে। আমার হাতদুখানি হাতের মধ্যে নিয়েঃ

—প্রকাশ করে ফেললাম সব!

—না করলেও কোনো ক্ষতি ছিল না সুমিতা! এ আমি জানতাম।

—বন্ধু তুমি, তুমি অন্তর্যামী! জানবেই তো সব। আর আমার লুকোনো কিছু নেই! আমি মুক্ত!

—আমিই কেবল মুক্ত নয় সুমিতা! আমার সব কথা তোমাকে জানানো হয় নি!

—না জানালেও আমি জানি প্রিয়বন্ধু! ভালো যে বেসেছি, জানবো না কেন? আমার বেদনা দিয়ে তোমার বেদনা আমি যে অহরহ অনুভব করি! কিন্তু কী অদ্ভুত তুমি!...আমার তবু সু আছে, বেঁধে রাখতে পারি নিজেকে। তোমার কে আছে?

—গুরু আছে মিতা!...বীণা তো নিয়েছি তাঁর হাত থেকেই!

সুমিতা আমার কথাগুলির আলংকারিক অর্থটুকুই গ্রহণ করল।...সহসা কি জানি কেন তার পদ্মসুন্দর নয়নদুটি জলে টলটল করে উঠল। আমার বুকে মাথা রাখল বালিকার মত। বলল আর্তকণ্ঠেঃ

—ক্ষমা করো প্রিয়বন্ধু! আমি বড় দুর্বল! গুরুবীণা আমি পাই নি! তুমি হও আমার গুরু! সুরের আগুনে পুড়িয়ে দাও আমার দৌর্বল্য!

গুরুদেব আজ কলকাতা ছেড়ে চলে যাবেন, সকাল থেকে সকলেই বড় ব্যস্ত, বড় বিষণ্ণ।...প্রাতঃকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত আমি তো সিংহের মত পরিশ্রম করলাম।

শো-কে মা আজ আসতে বলেছিলেন।...বেলা ন-টা নাগাদ শো এল। আমি তখন নিচে বৈঠকখানায় বসে নানা কাজের পরিকল্পনায় ব্যস্ত। তাকে দেখে দূর থেকে একটু সৌজন্যের হাসি হাসলাম! তারপর একবারো ডাকতে পারলাম না কাছে, বলতে পারলাম না দুটো কথা।

গুরুদেবের পক্ষকালীন যজ্ঞ সমাপ্ত হল। কয়েকজন ভক্তকে তিনি আজ দীক্ষা দিলেন। যজ্ঞকালে তিনি প্রত্যহ বেরিয়ে আসতেন বার-বাড়াতে। শহরের সর্বসাধারণ তাতে যোগদান করত সহজে। আজ খুব ধুম করেই যজ্ঞ সমাপ্ত হল। সর্বসাধারণের ললাটে যজ্ঞের ফোঁটা দেয়া হল।... গুরুদেব তারপর বক্তৃতামঞ্চে আরোহণ করে গার্হস্থ্য ধর্ম সম্বন্ধে কিছুক্ষণ উপদেশ দিলেন। উপদেশ দেয়ার সময় একবার গুরুদেবের সামনে আসার ফুরসৎ হল। এসে দেখলাম: ফুল ও কমলার মাঝখানে বসে চোখ বুজিয়ে কথা শুনছে শো। গুরুদত্ত যজ্ঞতিলক তার ললাটে—দেখে মনে হল, শো-র ভেতরের রূপটা আজই যেন প্রত্যক্ষ করলাম।

দ্বিপ্রহরে প্রসাদ পাওয়ার সমারোহ। এই পনের দিনের মধ্যে গুরুদেবকে তেমন কিছুই খেতে দেখি নি। হয়তো কিছু জল, কিছু ফল, কিছু দুধ বা ছানা খেয়েই তিনি থাকতেন, কিংবা হয়তো তা-ও খেতেন না। আজ বুঝলাম কেন তাঁর এই উপবাস ব্রত।...শুনলাম দীক্ষা দিতে হলে শিষ্যের সঙ্গে গুরুকে-ও কৃচ্ছ্র সাধন করতে হয়, নিয়ম-নীতি পালন করতে হয় নৈষ্ঠিকভাবে।

দুপুরে সবার সঙ্গে এক পংক্তিতে গুরুদেব ভোজন করলেন। বাড়ীর কর্মচারীরা-ও বসল তাঁর সঙ্গে। স্নেহভরে তিনি আমাকে স্বামী আত্মানন্দের

পাশে বসিয়ে নিলেন। খেলেন যৎসামান্য কিন্তু কেবলি অনুযোগ করলেন, আমরা তেমন কিছু খাচ্ছি না বলে'।...

আহারের পর-ই যাওয়ার ব্যবস্থা করতে হল। আজকের সমস্ত ব্যবস্থাপনার কর্তা হতে হয়েছে আমাকে। দাদুর নির্দেশ। মার ইচ্ছা।

•

গুরুদেবের শিষ্যদ্বয়কে নিয়ে দাদু মোটার যোগে আগেই হাওড়া রওনা হয়ে গেলেন।...

আমার পরিকল্পনানুসারে—

সুসজ্জিত একটি হস্তীর পৃষ্ঠে মণিমুক্তামাণিক্যখচিত একটি মূল্যবান সিংহাসন স্থাপিত হ'ল। 'নারায়ণ' নাম উচ্চারণ করে গুরুদেব সেটির ওপরে গিয়ে বসলেন। তাঁর পশ্চাতে সম্রাটের মত বেশভূষায় সজ্জিত হয়ে ইন্দ্রাসন বসল গুরুদেবের মাথায় স্বর্ণরৌপ্যপ্রবালখচিত সুদৃশ্য ছত্রখানি ধারণ করে'। হস্তীর চলার তালে-তালে সম্মুখে একদল ভক্ত অগ্রসর হ'ল শ্বেত-পতাকা উত্তোলন করে। তাদেরো অগ্রবর্তী হয়ে চলল গৈরিক পরিহিত বেদগাথকবৃন্দ। গুরু-বাহনের বামে ও দক্ষিণে পদব্রজে চলল অসংখ্য ভক্তপ্রাণ—তাদের মধ্যে আমি-ও একজন।...দাদু বলেছিলেন : অতটা পথ হাঁটতে পারবে দাদু? বলেছিলাম : আমার গাড়ী তো যাচ্ছে সঙ্গে, না পারি উঠে পড়বো!...

আমার গাড়ীতে—মার আদেশে স্থান পেয়েছিল ফুল, কমলা ও শো। আমার গাড়ীর পশ্চাতে আসছিল প্রায় চল্লিশখানি গাড়ী।...

ষ্টেশন পর্যন্ত পদব্রজেই আসতে পারলাম। বিপুল সমারোহে নামালাম গুরুদেবকে। সহস্র লোক তাঁকে বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে দেখল। প্রণাম করল দূর থেকে।

প্রথম শ্রেণীর কামরাখানি দাদু ফুলে ফুলে ভরিয়ে রেখেছিলেন, 'নারায়ণ' বলে' গুরুদেব প্রবেশ করলেন কামরায়। দাদু তাঁকে প্রণাম করলেন। সচ্চিদানন্দ ও স্বামিজীকে আলিঙ্গন করলেন আবেগাপ্লুত হৃদয়ে।

মা এলেন। প্রণাম করলেন সকলকে।

শো কামরার সামনে এসে দাঁড়াল। কামরার ভেতর থেকে তাকে দেখতে পেলাম। ভিড়ের মধ্যে সংকোচে সে জানাতে পারছিল না—গুরুদেবের কাছে সে একবার আসতে চায়। ফুল সেটা জানল কি করে। শো-র হাত ধরে গুরুদেবের কাছে এল ভিড় ঠেলে। গুরুদেবের সম্মুখে নম্রনেত্রে দাঁড়াল শো। গুরুদেব তার দিকে তাকালেন।

প্রণাম করল শো। গুরুদেব তার মাথায় হাত রাখলেন। বললেন: এসেছিস্?...সুখী হ' বেটী!

শো কী যেন বলতে গেল। বলতে পারল না। ঠোঁট দুটি শুধু কাঁপল একবার। আমার দিকে চেয়ে রইল অসহায়ের মত।

হয়তো শো-র মনের কথা বুঝলাম, কিংবা ঠিক বুঝলাম না। বললাম:

—আশীর্বাদ করুন, ওর ভাবী স্বামীকে মনের মত করে' যেন ও ফিরে পায়।

গুরুদেব আবার একবার শো-র মাথায় হাত রাখলেন। বললেন:

—প্রীত্ ন টুটে অন মিলে
উত্তম মনকী লাগ।
শতযুগ পানীমেঁ রহে
মিটে না চকমক আগ॥—

সুজনের প্রীতি—সে তো চকমকির আগুন! শতযুগ জলে পড়ে থাকলে-ও চকমকি থেকে আগুন হয় না স্খলিত, বহুকালের বিচ্ছেদে-ও সুজনের প্রীতি হয় না তিরোহিত!

নিবিষ্ট চিত্তে শুনল শো। নিস্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল পাথরের মত। একটু পরে আমার দিকে করুণ দৃষ্টিতে একবার তাকাল। তারপর কামরা থেকে ধীরে ধীরে বাইরে বেরিয়ে গিয়ে দাঁড়াল।...কিছুক্ষণ পরে ভিড়ের মধ্যে আর তাকে দেখতে পাওয়া গেল না।...

মনটা কেমন উদাস হয়ে গেল কিছুক্ষণের জন্যে।...ট্রেণ ছাড়ার সময় হল।...গুরুদেব নামজপ করতে বসেছেন। স্বামীজীর দিকে বড় কাতর

দৃষ্টিতে তাকালাম। আমার হাতদুটি পরমস্নেহে তিনি চেপে ধরলেন। ডাঃ সচ্চিদানন্দ বললেন :

—তোমার পথ-ও ঠিক পথ।...নিষ্কাম বন্ধু-ই সত্যকার সন্ন্যাসী, বৎস!... দ্বিধা ক'রো না!...এগিয়ে যাও!...

এবার আর চমকে উঠলাম না ডাঃ সচ্চিদানন্দের অন্তর্যামিত্বে। মনটা উৎফুল্ল হয়ে উঠল। মা-র হাত ধরে' ধীরে ধীরে নেমে এলাম কামরা থেকে।

—গুরুজীকি জয়, উঠল ধ্বনি।

ট্রেণ ছেড়ে দিল।...

গৃহে প্রত্যাগত হলাম ক্লান্ত দেহ আর ভারাক্রান্ত মন নিয়ে। আমাদের গৃহে গুরুদেব কী ছিলেন, তাঁর অনুপস্থিতিতে আরো তীব্র ভাবে যেন অনুভব করলাম। কয়েকঘণ্টা আগে যে-বাড়ীখানি উৎসবমুখর ছিল, এখন তা যেন নিস্তব্ধ রাত্রির মত নির্বাক হয়ে গেল। যেন 'মেইন ফিউজ' হয়ে যাওয়ায় আলোয় আলোময় রাজপ্রাসাদটি অন্ধকারে ডুবে গেল আচম্বিতে।

বাড়ীর সকলেই ক্লান্ত, নিঃসহায়ের মত নিঃসঙ্গ। সদাহাস্যময় দাদুকে-ও দেখলাম বিষণ্ণ, গম্ভীর।...মা-র চরিত্র কিন্তু কী অদ্ভুত, যেন কিছুই হয় নি—এমন সহজ স্বাভাবিক তাঁর আচরণ।...গৃহে ফিরেই সহজভাবেই তিনি গৃহকর্মে ব্যাপৃত হলেন। কাকে কী করতে হবে নির্দেশ দিলেন। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই যে-ঘরে গুরুদেব ছিলেন সে-ঘরে আবার আমার চেয়ার-টেবিল ও খাটখানি সাজিয়ে দেয়া হল—আসবাব পত্র যেখানে যেমনটি ছিল রাখা হ'ল সন্তর্পণে। একটু হেসে তাই বললাম :

—আজ-ই তোমার কাছ থেকে সরিয়ে দিচ্ছো! আজ কিন্তু একা থাকা, বিশেষ করে' গুরুদেবের শূন্য ঘরে থাকা আমার পক্ষে বোধ হয় সহজ হবে না।

—ঘরটাতো সাজিয়ে দিই, আজ না থাকিস্, কাল থাকবি!...কিন্তু অমন করে' মেঝের ওপর কি আর শোয় খোকা?...

বুঝলাম, মা-র এত তাড়াতাড়ির কারণ।...এ-ঘরে আজ থেকেই

রয়ে গেলাম। বিছানা পাতা আর ঘর সাজানো হয়ে গেলে আমি হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়লাম।

মা ধীরে ধীরে বাইরে বেরিয়ে গেলেন, দরজা ভেজিয়ে দিয়ে বাইরে থেকে।

নিস্তব্ধ হয়ে পড়ে রইলাম চোখ বুজিয়ে। গুরুদেবকে কেবলি মনে পড়ল।...নাস্তিকেরা তর্ক তোলে—সাধু-সন্ন্যাসীরা সংসারের কী ছাই করে? কী যে করে, তা, তারা জানবে কী করে, যারা কেবল অবিশ্বাসীদেরি আত্মীয়বন্ধু বলে' জানে! সত্যকারের সাধু-সন্ন্যাসী যারা দেখে নি, পথের ধারে ভণ্ড জটাধারীদেরি শুধু দেখেছে, কিংবা শুনেছে মঠমন্দিরের সাধুবেশী প্রতারকদের ইতিহাস—সাধু সম্বন্ধে তাদের ধারণা কতটুকু?...এ আমার গৌরব, সত্যকারের সাধু আমি দেখেছি, যাকে দেখে তাপ ঝরে যায়, পাপ সরে যায়, নূতন চেতনার আনন্দে উত্তেজিত হয় অন্তর্লোক।...মনের জগতে এই সব দেবমানবের আশীর্বাদ আজ-ও কিছুটা আছে, তাই হিংসাদ্বেষাচ্ছন্ন বাস্তব এই পৃথ্বীভূমি একেবারে বিজিগীষু পশুদের আবাসভূমি হয়ে যায় নি। 'শান্তির ললিতবাণী' এখানে ওখানে আজ-ও তাই শুনি, 'সর্বে লোকাঃ সুখিনো ভবন্তু—'এ-বাণীর মহিমায় আস্থা আনি!...

আচ্ছন্নের মত পড়ে থেকে গুরুদেবের মূর্তিখানি স্মরণ করতে লাগলাম। ধ্যানগম্ভীর নিত্যপ্রসন্ন মানুষটি, না—না, দেববিগ্রহটি, হাত তুলে আবার যেন আমাকে আশীর্বাদ করলেন। মনে মনে বললাম:

—তোমার আশীর্বাদ যেন বহন করতে পারি জীবনে। নাই-বা আমি সন্ন্যাসী হতে পারলাম, সত্যকার সামাজিক হওয়া-ও তো কম কথা নয়।...আমি দেশ চাই, সমাজ চাই, মানুষ চাই, মানুষের প্রেম চাই—নানা চাওয়ার নিত্য বন্ধনে আমি বন্দী, সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী হওয়ার অধিকার-ই আমার নেই...সন্ন্যাসের দীক্ষা আমি এ-জীবনে পেলাম না,

জানি, কিন্তু সন্ন্যাসের শিক্ষা যেন মর্যাদা পায় আমার জীবনে।... আমি সত্য বলবো, ধর্ম মানবো, কুশল জানবো, রক্ষা করবো 'প্রবচন', বিচ্যুত হবো না স্বাধ্যায়ের সাধনা থেকে। মাতৃদেবীর সেবা করবো, গৌরব বাড়াবো পিতৃদেবের, আচার্যদেবের রাখবো মান, অতিথিদেবকে জানবো নারায়ণ বলে'।...এই যে সামাজিক জীবনের দৈনন্দিন সাধারণ গৃহাদর্শ, এই আদর্শ পালন-ই তো আমার ভারতধর্মের আনন্দতপস্যা। কী হবে আমার সন্ন্যাসী হয়ে যদি এগুলি সহজভাবেই পালন করতে পারি বাস্তবজীবনে?

সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল।...শো-র কথা মনে পড়ল। প্রতিশ্রুতি ছিল আজ সন্ধ্যাতে-ও তার কাছে যাব। ষ্টেশন থেকে শো না-দেখা করে-ই ফিরে গেছে—একবার তার সঙ্গে দেখা করে' কথাবার্তা বলার আগ্রহটা খুবই উদগ্র হল। কিন্তু শরীর ও মন যেমন—তাতে বিছানা থেকে উঠে একটা ফোন-ই মাত্র করা যায়, বাইরে বেরুনো যায় না। ফোনে সে কথা তাকে জানালাম। ব্যস্ত হয়ে শো বলল:

—না না তোমাকে আজ আর বেরুতে হবে না।...অতটা পথ হেঁটে গেলে—এখন শরীর সত্যসত্যই না খারাপ হয়!

—গুরুদেবের আশীর্বাদ পেয়েছি। কিছু হবে না!

—তোমার মত বিশ্বাসের জোর যদি আমার থাকতো!

—নেই বুঝি?

—সত্যিই নেই ভাই! বোধ হয় ভক্তি-ও নেই, ভালবাসা-ও নেই!

—তবে তো ভাবনার কথা হ'ল। এতদিন কী দিয়ে তবে মন ভুলিয়েছ?

—বোধ হয় ছলনা!

—নারীর প্রেম মানেই তো ছলনা। এ আর নূতন কথা কী?... এতে দুঃখ কেন?

—তামাসা করছ?

—আমার কথায় কেবল তামাসা-ই দেখবে, তত্ত্ব দেখবে না?...তা মর্মের সত্যবাক্যটি হঠাৎ প্রকাশ করার জন্যে এত ব্যগ্রতা কেন?

—মনের অশান্তি আর সহ্য করতে পারছি না প্রিয়বন্ধু!...গুরুদেবের উপদেশটুকু শোনা অবধি মনের অশান্তি যেন আরো বাড়ল।...আচ্ছা, তুমি তো আমাকে সত্যসত্যই ভালোবাসো?

—ছলনা-ও হতে পারে।

—ছলনা? ছলনা হলে তো বাঁচতাম। দুঃখ থাকত না।...ছলনা করে' তোমার লাভ? মানুষ তো ছলনা করে' কিছু পাওয়ার আশায়। তুমি তো কিছু চাও না!

—তুমি-ই বা কী চাও ছলনাময়ী?

—কী চাই?...আগে ভাবতাম, চাই বুঝি শিল্পীজীবনের প্রেরণা, দিব্যকল্যাণের আনন্দচেতনা, অনির্বচনীয় ভাবতত্ত্বের সুগভীর রহস্যোপলব্ধি; —আজ কিন্তু ভাবছি, কেন যে ভাবছি, ও-সব বুঝি আত্মার ছলনা মাত্র, ও-সব কিছুই আমি চাই নি, যা চেয়েছি...শুনতে পাচ্ছ?

—পাচ্ছি বৈ কি!

—বলতে পারো কেন আজ আমার মনে হচ্ছে—তোমাকে তোমার জন্যে কোনদিনই চাই নি, সু-কে গভীরতর ভাবে চাই বলেই তোমাকে চাই বলে' মনে করেছি।

—তুমি যে নারী সুমিতা! নারী মাত্রেরই সু-পুরুষে প্রয়োজন! কিন্তু তুমি কি সাধারণ নারী? নারীত্ব ছাড়া-ও বড় তত্ত্ব যে আছে তোমার মধ্যে!

—ভাবতাম আছে! সত্যি কিন্তু নেই! বু, বু, আমি নারী মাত্র! ভালবাসতে জানি, কিন্তু বাসি নি! ছলনা করেছি তোমার সঙ্গে!

—তোমার মন আজ চঞ্চল হয়েছে সুমিতা!

বললাম একটু গম্ভীর স্বরে:

—সু-র সঙ্গে ছলনা করো না!...

ফোন ছেড়ে দিল শো।...অকথিত একটা জটিল ভাব-বেদনায় রহস্য-গম্ভীর হ'ল মন। নিতান্ত অবসন্ন মনে হ'ল নিজেকে। হৃদয়ের অন্তঃস্থল

থেকে যৌবনাবেগের একটা আর্ত উদ্বেগ দীর্ঘনিঃশ্বাস হয়ে বেরুল আচম্বিতে।

বিছানায় এসে বসলাম। কী যে ভাবলাম আবোল-তাবোল, ছাই-ভস্ম। ভাবনার আতিশয্যে মাথাটা বুঝি ধরে এল।

শুতে যাচ্ছি। ফোন বেজে উঠল। আবার কে?

—কে?...শো?

—× × ×

গলা শুনে বুঝেছি শো। শো প্রথমটা কথাই কইতে বুঝি পারল না। বললাম:

—হঠাৎ ফোন ছেড়ে দিলে যে!

—কী যে সব যা তা তোমাকে হঠাৎ বললাম। আমি বড় দুর্বল, বড় দুর্বল, প্রিয়বন্ধু!...না জানি কী সব ভাবছ!

মনটা সহজে স্বাভাবিক হতে পারল না। চুপ করে রইলাম।

—কথা বলছ না কেন?

—আমি তোমার বন্ধু, সুমিতা, ভালবেসে বলেছ প্রিয়বন্ধু। বন্ধুর ভালবাসা আমি পেয়েছি।...আমি কৃতার্থ!...

—× × ×

—সুমিতা! শো!

—আমাকে ক্ষমা করো, প্রিয়বন্ধু! আমার পতন হয়েছে!

—হয় নি! হতে দেব না! হলে, কার মুখের স্বর্গ দেখে আমি প্রেরণা লাভ করবো সুমিতা?...মিতা আমার, আমাকে নাও, স্বর্গের আলো দেখাও!...আমাকে ত্যাগ করো না!...

—× × ×

—সুমিতা!

—আশীর্বাদ করো যেন তোমার মত ভালবাসা আমি পাই। আর কোনদিন তা যেন নষ্ট না হয়!

—গুরুবাণীতে আস্থা রেখো মিতা, 'উত্তম মনের প্রীতি' নষ্ট হয় না কখন-ও।

—কেন যে আমি গুরুদেবের কাছে গেলাম, আর কেন যে তুমি তাঁকে আশীর্বাদ দিতে বললে "অমন ভাষায়"! মনে হচ্ছে উত্তম মন আমি নই।...যদি না হই, তবু বলো আমাকে ছাড়বে না? তোমার যোগ্য করে' নেবে?

—নিয়েই তো আছি! আরো নেবো! যত নেবো, ততই বাজবে সুর!...

—বুঝতে পারি না, কী করে, কী পেয়ে এমন মিষ্টি কথা তুমি বলো! কী দিয়েছি আমি তোমাকে?

—বীণা!

—বীণা?...কাল-ও একবার গুরুবীণার কথা তুলেছিলে! কী তুমি বলতে চাও এই 'বীণা'-র?

উত্তর দিলাম না এ-প্রশ্নের।

আদর্শের কথা উত্থাপন করি, সমর্থন করি, কিন্তু স্বভাবজীবনে সকল সময়েই যদি তা' মানতে পারতাম!...শো-র সাময়িক চাঞ্চল্য আমার যৌবনগহনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বেদনাবোধকে কি রোমাঞ্চিত করল না? বেশ ছিলাম মনোময় জীবনের ভাব-প্রশান্তির আনন্দে। আচম্বিতে দক্ষিণ থেকে এল উতলবসন্তের অশান্ত মন্ত্রধ্বনি, দেহময় যৌবনের রহস্যবাসনায় স্বপ্ন হল জটিলচঞ্চল।

ধিক্কার দিলাম যৌবনবিভ্রমের আর্ত চাপল্যকে। বুদ্ধিকে বোঝালাম শুদ্ধজীবনের তত্ত্বাদর্শ। গাইলাম প্রার্থনামন্ত্র : অসৎ থেকে সতে নিয়ে চলো। অন্ধকার থেকে আলোকে চলো যাই। মৃত্যু থেকে অমৃতে নাও আমাকে।

সংগ্রাম সুরু হ'ল নিজের সঙ্গে। বুঝতে পারলাম—নারীর বন্ধু হওয়া সহজ কিন্তু বন্ধুত্ব রক্ষা করা সুকঠিন।...সকাল-দুপুর বিকাল-সন্ধ্যা নিমজ্জিত রইলাম ধর্মগ্রন্থের অতল সমুদ্রে—বাইরের জগতের সঙ্গে সম্পর্ক প্রায় ছিন্ন করলাম সম্পূর্ণ স্বেচ্ছায়।...

মা বোধ করি শঙ্কিত হলেন। ভাবলেন, গুরুর প্রভাবে সত্যসত্যই বুঝি সন্ন্যাসী হলাম আমি। এমন কি আমার রকমসকম দেখে দাদুর- বুঝি সন্দেহ হল!

বলা বাহুল্য, পুনর্বার গৈরিক বসন তুললাম অঙ্গে। বাইরে থেকে কেউ দেখা করতে এলে বিরক্ত হলাম স্পষ্টতঃ। নামজপ, প্রাণায়াম ও আসন অভ্যাসে দিলাম মন। গভীর রাত্রে উঠে আবৃত্তি করলাম শঙ্করের 'মোহমুদ্গর'।

এইভাবে কেটে গেল বোধ হয় পনেরো-কুড়ি দিন।

তারপর—

হঠাৎ একদিন সকালবেলায় বাড়ীর সবাই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল এই দেখে, যে, গৈরিক বসন ত্যাগ করে' আবার আমি সাদাধুতি ও পাঞ্জাবী পরেছি।

ফুল কিন্তু বলল :

—গেরুয়া পরলে বড়দাকে খুব ভালো দেখায় !

—খুব বলেছিস !

বলল কমলা :

—এখন কেমন দেখাচ্ছে দেখ দিকি !

—যাবি নাকি কোথাও ?

বললেন মা, একটু বিমর্ষভাবে।

—হ্যাঁ মা, ষ্টুডিও-তে ! ছবিতোলার কাযে !...ফুল যাবি নাকি দেখতে ?

—যাবো বড়দা !

লাফিয়ে উঠল ফুল।

—কমলা ?

কমলা জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে মা-র মুখের দিকে তাকাল।

—আচ্ছা তোদের দুজনকেই একবার ষ্টুডিও দেখিয়ে নিয়ে আসবো !...

মা, কি আশ্চর্য, একটু-ও আপত্তি জানালেন না।

'শকুন্তলার জন্ম' নাটকের সুটিং আরম্ভ হল। 'বিশ্বামিত্র' ভূমিকার জন্যে কয়েকদিন আমাকে ঘর-বার করতে হল।

বিশ্বামিত্রের তপস্যার অভিনয় দেখে সাধারণ দর্শক থেকে পরিচালক বু পর্যন্ত সকলেই মুগ্ধ হলেন। আমার ওঠা-হাঁটা-চলা-চাউনি, আমার বেদপাঠ ও যজ্ঞকর্ম, আমার আসনে বসার শিল্পকৌশল—সকলেই একবাক্যে প্রশংসা করলেন।...

শো, আলোচ্য নাটকের 'শকুন্তলা'—একদিন দেখতে এল সুটিং। প্রায় কুড়ি-পঁচিশদিন তার সঙ্গে আমার দেখা হয় নি—হঠাৎ আজ তাকে সামনে

দেখে উৎসাহ জাগল অন্তরে। শিল্পসৃষ্টির ভাবাবেগ প্রখরতর হল যৌবনে।... শো-কে দেখিয়ে শ্রীযুক্ত বু-কে বললাম প্রবীনজনের গুরুগাম্ভীর্যে:

—এই সেই বালিকা যার জন্মের জন্যে আমার মৃত্যু!

বু হেসে উঠলেন! শো এ-রসিকতায় যোগ দিল না। বলল—অনেকদিন 'আপনাদের' কোনো খবর নিতে পারি নি। মা ও বোনেরা ভালো আছেন সব!

—আছেন।...'আপনি' ভালো?

—হ্যাঁ!

'মেক-আপ রুম' থেকে বেরিয়ে কাজ সুরু করলাম তারপর।

তপোভঙ্গে বিশ্বামিত্রের অনুতাপচিত্রের অভিনয় করলাম সেদিন। চিত্ত-বিক্ষেপের পর আত্মসম্বিত ফিরেছে বিশ্বামিত্রের, অধঃপতনের স্মৃতি তখন তাকে পাগল করে' তুলেছে।...দৃশ্যটিতে কথা বিশেষ কিছু নেই, শুধু ভাবের অভিব্যক্তির সাহায্যে আত্মযন্ত্রণা, মনোবেদনা এবং আত্মহত্যা করার ভাবাবেগ প্রকাশ করতে হল। 'ক্যামেরা-ম্যান' শ্রীনু, নানাদিক থেকে আমার অভি-ব্যক্তিগুলি যত্ন ও ধৈর্যসহকারে গ্রহণ করলেন।...আমার চোখ ও কপালের ছবি তুললেন বেশ কয়েক সেকেণ্ড ধরে'। উঠে দাঁড়াচ্ছি কেমন কৌশলে, হাঁটার ভঙ্গীতে কী ভাবে প্রকাশ করছি আত্মক্ষোভের তীব্রজ্বালা, পা মুড়ে পাহাড়ের তলায় বসার নৈপুণ্যে কোন্ 'এ্যাংগেলে' প্রকাশ পেল গভীর ক্লান্তি—তীক্ষ্ণদৃষ্টি নু তা সমস্ত দেখলেন, গ্রহণ করলেন।...অবশেষে 'ভদ্রাসনে' বসলাম নূতন তপস্যায়। নু নিখুঁতভাবে তুললেন সে-আসন-নৈপুণ্য:

দেহ ও মেরুদণ্ড সরল করে' গুল্‌ফদুটি বিপরীতভাবে স্থাপন করে' বাঁ হাত দিয়ে পিঠ পার হয়ে বাঁ-পায়ের বুড়ো আঙুল এবং ডান হাতের দ্বারা ঠিক ঐ ভাবে ডান-পায়ের বুড়ো আঙুল আমি ধারণ করলাম। কণ্ঠ সংকোচ করে' বুকের ওপর চিবুক রেখে দুচক্ষু দিয়ে নাকের অগ্রভাগ দেখতে দেখতে প্রাণায়াম করে' পরমব্রহ্মের চিন্তা করলাম।

সমাধিস্থ হয়েছিলাম কি না কে জানে! চিত্র-গ্রহণ শেষ হওয়ার পর আমাকে ধরে তুলতে হল। পৃথিবীটা, তখন মনে হল, চোখের সামনে বন বন করে' ঘুরছে।

ষ্টুডিও-র বিশ্রামাগারে গিয়ে শুয়ে রইলাম অনেকক্ষণ। সকলেই এলেন উদ্বিগ্ন হয়ে। বেশ সম্ভ্রমভরে আমার সম্বন্ধে করলেন আলোচনা। শো এসে দাঁড়ালেন সামনে :

—কেমন বোধ 'করছেন' ?

—অনেকটা ভালো।

—এখনি 'যাবেন' ?

—একটু পরে। দুর্বল হয়েছি বেশ! আর একটু হলে বোধ হয় ব্রহ্মপ্রাপ্তি হ'ত।...সকলের সামনে কি যোগনিয়ম হয়?...প্রাণায়ামানুষ্ঠানে একটু ভুল করেছি।...বড় কঠিন ব্যাপার...

শো-কে খুব বিষণ্ণ দেখাল। বেশ বুঝলাম অনিচ্ছাসত্ত্বেই সে বিদায় নিল আমার কাছ থেকে।

সন্ধ্যের পর বাড়ীতে ফোন করে জানতে চাইল আমি এসেছি কি না। বললাম :

—বু-র ব্রহ্মপ্রাপ্তি ঘটেছে।

—নটি বয়।...কেমন আছ এখন ?

—খুব ভালো! মুখ দিয়ে জ্যোতি বেরুচ্ছে!

—তবে এসো এক্ষুণি! দেখি!

—আজ আর নয় মিতা। বেশ দুর্বল। শুয়ে থাকি। কাল ষ্টুডিও থেকে সোজা তোমার কাছে যাবো! চা খাবো!

—ঠিক তো ?

—ঠিক!

পরদিন বিশ্বামিত্র অভিনয়ের শেষ দৃশ্য তোলা হ'ল। অভিনয় শেষে কোথাও আর দাঁড়ালাম না। সরাসরি শো-র বাড়ী গিয়ে উঠলাম।

শো-র মুখে চোখে দেখলাম কেমন যেন দুষ্টুমির হাসি।

—যাক, এসেছ তাহ'লে!

হাঁফ ছেড়ে বলল শো।

—মানে ? আসি না যেন কখনও ?

—আগে যখন আসতে, তখন ছিলে অন্যমানুষ। এখন তো একেবারে তপস্বী।...নারীজাতির ওপর ঘৃণা জন্মে গেছে ভীষণ।

—জানো না তো যে-পুরুষ যত অধঃপতিত, সে ততই নিন্দাবাদ করে নারীজাতির। ভাবটা দেখায় যেন গভীরভাবে ঘৃণা করে নারীজাতিকে ?

—থাক ! আর কথা নয় !

তর্জনী নির্দেশ করে' শাসনের ভঙ্গীতে শো বলল :

—চুপ করে বোসো এইখানে !

তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে গেল দ্রুত। একটু পরেই ফিরল হাসতে হাসতে। বলল :

—ওঠো !

—ব্যাপার কি ?

—ষ্টুডিও-র জামাকাপড় পরে থাকতে এখনো ভালো লাগছে ? স্নান করতে ইচ্ছা যাচ্ছে না ?

— × × ×

—ভয় নেই গো তপস্বী !

হেসে বলল শো, পাশের ঘরের দিকে অকারণে তাকিয়ে :

—এমন কোনো ভয়াবহ প্রস্তাব করছি না। বলছি, স্নান করে এসে বেশ পরিবর্তন করো : আমাকে সুযোগ দাও নিজের হাতে তোমাকে আজ সাজিয়ে দেয়ার !

— × × ×

—আজ একটু বেড়াতে যাবো আমরা !

অদ্ভুত প্রস্তাব। শো-র মুখে এই প্রথম শুনছি। সত্য কথা বলতে কি, এ-প্রস্তাবে তেমন উৎসাহ বোধ করলাম না। বরং সংস্কারে একটু আঘাত-ই লাগল। বলে' ফেললাম :

—'বন্ধু-র' পথ থেকে কি সরে যাচ্ছ না সুমিতা ?

—বন্ধুকে নিয়ে বেড়াতে যাওয়া বুঝি অন্যায় ?

—সু যখন থাকবে তখন অন্যায় নয়!

—এ আবার কেমন শাস্ত্র!

দুষ্টুমিভরা হাসি হেসে চঞ্চলা বালিকার মত বলল শো:

—সু যদি না-ই থাকে: ধরো, সে আমাকে একেবারে ত্যাগ করলো!

— × × ×

—বাব্বা, আচ্ছা গোঁড়া ঠাকুর্দাকে বন্ধু বলে' গ্রহণ করেছি!...আচ্ছা তপস্বী, জীবনটাকে কি কতকগুলো 'নীতি' আর আদর্শের সূত্রে একেবারে বেঁধে ফেলেছ? সেটা নড়বে না, সরবে না?

—সেটা নড়ে, সেটা সরে—এ-কথা সত্য। কিন্তু বিপথে সেটা নড়ছে বা সরছে কি না দেখতে হয়।

—বেড়াতে যাওয়ার ব্যাপার নিয়ে এত কথা? আজ যদি সু এসে বলতো, বন্ধু বেড়াতে চলো, যেতে না?

—যেতাম!

—আমি তোমার বন্ধু নই?

—তুমি আমার সবার বড় বন্ধু!

—তবে?

—বন্ধুত্বের তত্ত্বে, আমি মনে করি সুমিতা, নারী নারী নয়, পুরুষ নয় পুরুষ। তারা বন্ধু। তারা সহকর্মী। তারা সহমর্মী। সহধর্মী-ও তারা বটে। কিন্তু বন্ধুপূজার আনন্দে নারীর আচরণে যদি সহজ নারীত্ব-ই পায় প্রাধান্য আর পুরুষের আচরণে স্বামিত্ব, তবে বন্ধুত্বের মর্যাদার জন্যেই সরে যেতে চাই স-মানে! তা যদি না যাই, তবে আমি 'সামাজিক' বন্ধু নয়, 'স্বাভাবিক' পুরুষ মাত্র!...আমার তো বিশ্বাস সুমিতা, তোমার কাছে সু-পুরুষ ছাড়া আর কোনো পুরুষ নেই, আর যারা আছে তারা বন্ধু। অন্ততঃ হওয়া উচিত!

—জানি গো মশাই জানি!...তা আমার অধঃপতন প্রকাশ পাচ্ছে দেখে শঙ্কিত হয়ে খুব তো খানিকটা গালাগাল দিয়ে নিলে কৌশলে। এইবার আশ তো মিটল...এখন স্নানে যাবে না বাড়ী যাবে!

—মনটা অশান্ত, বাড়ীই যাই। উঠি!

উঠবার চেষ্টা করছি, অকস্মাৎ শো একটা কাণ্ড করল। অপ্রত্যাশিতভাবে তার দুটি হাত দিয়ে আমার জানুদ্বয় চেপে ধরল। বলল:

—ওঠো তো দেখি!

—এ কী ব্যাপার!...সরো!

—আমাকে এখন-ও তোমার ভয়?

—তোমাকে ভয় নয় সুমিতা!

বিষণ্ণ সুরেই বললাম:

—যদিও জানি তোমার মত নারী পেলে বশিষ্ঠেরও তপোভঙ্গ হয়!...জানো না, কী দ্বন্দ্ব-সংগ্রামের মধ্য দিয়ে চলতে হয় আমাকে! তবু আমি বন্ধু, শুধু তোমার নয়, সু-রও! সু ভাবতো, আমি তার 'প্রেমকে' নিচ্ছি ছিনিয়ে, সন্দেহ-ও করতো তাই। আজ তার বিশ্বাস হয়েছে—আমি তার যথার্থ বন্ধু: তার কোনপ্রকার ক্ষতি পারি না করতে।

—কে তোমাকে ক্ষতি করতে বলছে গো মশাই!

—× × ×

—নাঃ, আমি হার মানলাম!...সেদিন তোমাদের বাড়ী থেকে তোমার একটা পাঞ্জাবী এনে সেই মাপে মনের মত একটা গরদের পাঞ্জাবী করিয়েছি। শান্তিপুরী ধুতি আর চাদর এনেছি কিনে। তোমার পায়ের মাপে জুতো করিয়েছি তৈরী। ভেবেছিলাম—তোমাকে নিজের হাতে আজ সাজাবো।... তারপর...

—আর বোলো না। ঈর্ষায় বুকের ছাতি ফাটছে।...হার্টফেল করলাম বলে।

—কে? কার গলা? সু না?

পাশের ঘরের দরজা ঠেলে সু এল নাটকীয়ভাবে বেরিয়ে। অকারণে বুকটা দুর-দুর করে' উঠল। থর-থর করে কেঁপে উঠল দেহটা। ঘেমে নেয়ে গেলাম মুহূর্তে।

শো বুঝি এ-সব লক্ষ্যই করল না। ফুক দিয়ে হেসে উঠল নিতান্ত সাধারণ নারীর মতই।

তীব্র একটা জ্বালা অনুভব করলাম অন্তরে। বলেই ফেললাম:

—আমাকে পরীক্ষা করছিলে এতক্ষণ?

কৌতুক করতে গেল সু:

—দেখছিলাম আমার প্রতিদ্বন্দ্বী কত দূর যেতে পারে!

আমার বিষন্ন গম্ভীর মুখ দেখে শো এইবার কিন্তু শঙ্কিত হল। এগিয়ে এল আমার কাছে। হাত ধরে বলল:

—বোধ হয় রাগ করলে প্রিয়বন্ধু! কৌতুক করতে গিয়ে তোমাকে দুঃখই বোধ হয় দিলাম! এটা তো ভাবি নি!

—বুঝতে পারছি শো, তুমি আমার বন্ধু-ই নও! গুরুবলে আজ রক্ষা পেয়েছি কিন্তু কী ভয়াবহ প্রলোভনের পথে তুমি আমাকে টেনে আনছিলে—জেনে-ও তা তুমি উপেক্ষা করেছ।...আমি সত্যসত্যই মর্মাহত!

—এ-সব কী বলছ বৃ?

ব্যস্ত হয়ে বলল সু:

—উঠছ কেন? বসো!

—না, এ-বাড়ীতে এই আমার শেষ!...তোমরা দুজনে মিলিত হয়েছ, ভগবান জানেন, এতে আমি কত খুসী হয়েছি!...ঈশ্বরকে ধন্যবাদ আমাকে পুনর্বার তোমার সন্দেহভাজন হতে হল না!

নতজানু হয়ে শো বসে পড়ল আমার পায়ের কাছে।

—লঘুপাপে এমন গুরুদণ্ড দিয়ো না বৃ! ক্ষমা করো।

—হঠাৎ এতটা ক্ষুব্ধ হবে জানলে লুকিয়ে থেকে কৌতুক করতাম না ভাই। যা হবার হয়েছে! ক্ষমা করো ভাই! বসো!

বলল সু।

বসলাম না। সু আমার সঙ্গে সঙ্গে নিচে নেমে এল। শো ঘরের মধ্যে বসেই রইল পাষাণ মূর্তি!...

—এমনি রেগেছ, যে কেমন আছি একবার জিজ্ঞাসাও করলে না!

—ভালোই তো আছ!

'—একটু আছি। ভালো ছিলাম না ভাই...খবর তো নিতে না। একেবারে

শয্যাশায়ী হয়ে পড়েছিলাম। শো জানতে পেরে' গেছল। সেবাযত্নে টেনে তুলেছে। ওপরে চলো ব্, শুনবে সে-গল্প!

—ভালো লাগছে না সু!

—শুনে সুখী হবে মদ কয়েকদিন আর ছুঁই নি।

—ভালো!

পায়ের শব্দে পেছন ফিরে তাকালাম। শো এসে দাঁড়াল চোরের মত। দেখে-ও দেখলাম না তাকে।

হঠাৎ ক্ষিপ্রবেগে এগিয়ে এসে শো আমার বাঁ হাতখানি ধরল জড়িয়ে। বলল:

—এখনি এ-ভাবে তোমায় দেব না যেতে। চলো ওপরে!

—চলো ভাই!

অনুরোধ করল সু। বললাম:

—তোমরা দুজনেই আমার বন্ধু।...তোমাদের দুজনের কাছেই প্রার্থনা: আমাকে মুক্তি দাও!...

—ছেলেমানুষী করো না ব্!

—এমন কী হল যে রাগ সামলাতে পারছ না কিছুতে?

বলল শো। বিষণ্ণ তার কণ্ঠস্বর। বললাম:

—নির্জনে ভেবে দেখো!

—তাহ'লে কথা শুনবে না?

—না!

উত্তর দিলাম গম্ভীরকণ্ঠে। অসহায়ের মত শো তাকাল আমার মুখের দিকে। ধীরে ধীরে হাত ছেড়ে দিল তারপর।

—আচ্ছা! বলল অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হয়ে।

গাড়ীতে গিয়ে উঠলাম। ষ্টার্ট দিলাম কোনদিকে না চেয়ে।

পরদিন সকালে স্নানের পর ঘরে এসে বসেছি, যা ভেবেছি তাই, সু এল। এবার ভালো করে' লক্ষ্য করলাম তাকে। শীর্ণ, রক্তহীন বিবর্ণ হয়ে গেছে সু। চোখের হলদে ভাব এখনো কাটে নি। মৃত্যু যে হানা দিয়েছিল—তার চিহ্ন তার সর্বাঙ্গে।

—কী হয়েছিল ?

—যা হবার! সিরোসিস্ অফ দি লিভার: অত্যধিক মদ্যপানের প্রতিফল।...আর বাঁচতে সাধ নেই রে ভাই! প্রতিমুহূর্তে মনে হয়—এবার গেলেই হয়! যাক, এখন যদি যেতে হয় ক্ষোভ থাকবে না! কিন্তু কাল তুমি কী যে করে এলে, সুখ শান্তি, স্বস্তি যেন সব গেল!

—আমাকে আর দায়ী করো না সু!

—করবো না? আমাদের দুজনেরই তুমি শান্তি, সান্ত্বনা। তোমাকে ছাড়া আমাদের দুজনের একজন-ও কি সুখে থাকতে পারে ভাবো ?

—তোমাদের সৌহার্দে'র জন্যে আমি কৃতজ্ঞ!

—তোমার রাগ এখনো পড়ে নি দেখছি। কিন্তু এতটা কেন?... আমরা তো ভেবেছিলাম—কালকের ব্যাপারটাকে নিছক একটা কৌতুকখেলা বলেই তুমি গ্রহণ করবে। অনেকদিন পরে, অপ্রত্যাশিতভাবে আমাকে পেয়ে—এবং শো-র সঙ্গে আমার 'ভাবসাব' হয়ে গেছে জেনে—তুমি তো আনন্দিতই হবে আমরা ভেবেছিলাম।

—কিন্তু কৌতুকের ছলনায় মোহবশে যদি যা' তা' করার আনন্দে মেতে উঠতাম, তোমার সুখশান্তি থাকতো কোথায়? শো-রই বা অবস্থা কী হ'তো ?

—যা কখন-ও হতে পারে না, তা-ই-ই তুমি কল্পনা করছ। শো বলে: বিশ্বামিত্রের পতন হয়, বু-র পতন অসম্ভব!

—শো-কে অশেষ ধন্যবাদ! তার মুখে এটাই শোভা পায়। বিশেষ

করে' তোমার কাছে আমার এ-ভাবের প্রশংসা করায় তাঁর নিজের মর্যাদা-ই বাড়ে সু।...কিন্তু আমি তো জানি আমি কী!...মনে মনে আমি কত দুর্বল! আমার দুর্বলতায় ঘা দিয়ে দিয়ে দয়াহীনভাবে যে কৌতুক করে, তাকে আর যা' বলতে হয় বলো, বন্ধু ব'লো না, হিতৈষিণী বলো না!

—কী বলছ তুমি বৃ!

—ঠিক বলছি!...আমার বিশ্বাস সু...শো তোমাকে ফিরে পেয়ে এমনি আত্মহারা হয়ে গেছে, যে কার সঙ্গে কেমন ব্যবহার করতে হয় তা ভুলেছে!

—এ অনুমান যদি সত্য হয়, তবে বন্ধু হিসাবে তুমি তো তার আনন্দে আনন্দিত-ই হবে, করুণাই করবে!

চমকে উঠলাম গোপনে! বুঝতে পারলাম শো-সু-র পুনর্মিলন আন্তরিকভাবেই চাই বটে, কিন্তু অন্তরেরো বুঝি অন্তঃস্থল বলে' একটা দুর্জ্ঞেয় সত্তা আছে মানবচরিত্রে—যার ভাব ও ভাষা এবং গতিবিধি বোঝা সত্যসত্যই তেমন সহজ কথা নয়!...বলল সু:

—শো-র সুখে তুমি কি সুখী নও?

—তোমরা দুজনেই সুখী হও!

অন্তঃস্থল থেকে উঠে এসে আন্তরিকভাবেই বললাম:

—কিন্তু দোহাই তোমাদের, আমাকে আর তোমাদের মধ্যে টেনো না!

—তবে যাই শো-কে পাঠাই। বলি গে, আমার দ্বারা হ'ল না!

—না না, শত্রুতা করো না বৃ, শো-কে পাঠিয়ো না!

—শো-কে তবে বলি গে, তোমার প্রিয়বন্ধুটি তোমার মুখ আর দর্শন করবে না!

—বাজে কথা রাখো! মা-র সঙ্গে দেখা করতে চাও, করো গে'। অনেকদিন আসো নি, মা তোমার কথা বলছিলেন।...আমি এখন একটু পড়াশুনো করবো!

—দিনরাত পড়াশুনো নিয়েই তো আছ।...তোমার সঙ্গে অন্য একটা বিষয়ে জরুরী পরামর্শ আছে। আচ্ছা, সেটা পরেই না হয় হবে। মা-র কাছেই একবার যাই!...

বলতে বলতে সু পকেট থেকে একখানি নামহীন খাম বার করল।

—ভেতরে একখানি চিঠি আছে। পড়ো। মজা পাবে।

টেবিলে খামখানি রেখে দিয়ে সু বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

নিশ্চয়ই শো-র চিঠি। কাঁদুনি গেয়ে, কবিত্ব করে' আবার যেতে লিখেছে। চিঠিখানি দেখবার কোন আগ্রহ-ই হল না।...খবরের কাগজে মাথা ডুবিয়ে নিস্তব্ধ হয়ে বসে রইলাম।

মিনিট পনেরো পরে সু এল ফুলের সঙ্গে। জিজ্ঞাসা করল :

—পড়লে ?

—কি! না!

—চিঠিখানা পড়ো নি ?

—পড়বার ইচ্ছা নেই ও-সব চিঠি!

—তা হ'লে পড়েছ। বিশ্বাস করছ না, এই তো ?

সু-র কথা বুঝতে না পেরে মুখ তুললাম। সু বলল :

—নি যে এমন ভাষায় এমন কথা লিখবে এটা বিশ্বাস্য তো নয় বটে-ই!

—নি-র চিঠি ?

—তাহ'লে সত্যি পড়ো নি ?

মুখে কিছু না বলে' চিঠিখানি নেয়ার জন্যে হাত বাড়ালাম।

—ষ্ট্রেঞ্জ্!

শো-র চিঠি নয়। নি-র। নি লিখেছে সু-কে চিঠি—এটা এমন কিছু বিস্ময়ের ব্যাপার নয়। কিন্তু এই ভাষায়, এই মর্মে, এই আত্মদোষ স্বীকার করে' আশ্চর্য বিনম্রতার ঔদার্যে নি লিখেছে চিঠি ? এ যে অবিশ্বাস্য।

লিখেছে নি :

প্রিয় সু,

এ-চিঠি পেয়ে নিশ্চয়ই তুমি দুঃখিত হবে, প্রথমেই তাই তোমার কাছে মার্জনা ভিক্ষা করছি।

আমার সঙ্গে তোমার বিবাহের প্রস্তাব করে' যে-পত্র তুমি কয়েকদিন আগে লিখেছিলে—সে চিঠির জন্যে অশেষ ধন্যবাদ। কিন্তু তুমি হয়তো জানো না—বহুকাল আগে থেকেই একজন অভিজাত ভদ্রযুবককে আমি ভালবাসি। তার সঙ্গেই আমার সত্যকার বিবাহ হয়ে গেছে। লৌকিকভাবে রেজেস্ট্রিটাই কেবল হয় নি।...তোমাকে এটা আগে জানাই নি বলে আমি অপরাধী।

বন্ধুভাবে তুমি যে এতদিন আমার গৃহে আসতে, আতিথ্য স্বীকার করতে, সুভদ্র শোভন ব্যবহারে আমাকে তুষ্ট করতে, মর্যাদা দিতে, সেজন্য আমি কৃতজ্ঞ।...মনে পড়ছে একাধিক ক্ষেত্রে স্বার্থের অনুরোধে তোমার সঙ্গে ছলনা আমি করেছি, তোমার বাক্‌দত্তার কাছে গিয়ে তোমার নামে একবার যা-তা বলতে-ও গিয়েছি, ভান-ও করেছি তোমাকে-ই যেন আমার প্রয়োজন। সত্য কথা বলতে কি, এ-সব কারণে আজ আমি খুবই লজ্জাবোধ করছি।...

তোমার বিবাহ-প্রস্তাব আমি সমর্থন করতে পারলাম না বলে' আমি দুঃখিত।...তুমি আমার নাম ও প্রতিষ্ঠার জন্যে বহু চেষ্টা করেছ, বন্ধুর কাজ-ই করেছ। আমি কৃতজ্ঞ।

আমার শুভেচ্ছা গ্রহণ করো। এ-চিঠি পেলে কি না জানাবে। ইতি

তোমাদের বন্ধু
নি।

চিঠি পাঠ করে স্তম্ভিত হয়ে বসে রইলাম অনেকক্ষণ। সু হাসতে লাগল। বলল :

—বুঝলে কিছু?

—ব্যাপার কী ?

বললাম হতভম্বের মত।

—নি-র সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেছি বুঝলে না ?

—নি-ই তো দেখছি তোমার প্রস্তাবে সম্মত না হয়ে পত্র দিয়েছে।... ব্যাপার কী।

—বন্ধু, এ-সব কৌশল অতি বড় চতুর উকীলেরো মাথায় ঢুকবে না। বলি শোনো। কিন্তু শুনতে চাও তো সাধুবর ?

সাধুবর নীরব রইলেন। আপত্তি নেই বোঝা গেল। সু বলল ফুলকে :

—এখন এখান থেকে যাও তো লক্ষ্মী বোন্‌টি !

—আমি শুনবো !

—তুই কী শুনবি ? যা এখান থেকে !

বললাম তেড়ে উঠে। চলে গেল ফুল ঠোঁট ফুলিয়ে। সুরু করল সু :

—নি-র নিন্দাবাদ কাগজে বেরিয়েছিল দেখেছ। তারপর থেকে নি-র অবস্থা সত্যসত্যই খুব খারাপ হল। একেই তো দেনার দায়ে তার মাথা চারিদিকে বিকোনো। তবু শাহাজাদীর মত না থাকলে তার চলে না। ইদানীং আমি ছিলাম তার নানাবিষয়ে সাহায্যদাতা। তা আমরে সঙ্গে তো হল চটাচটি।...শুনছ।

—বলো, শুনছি তো।

—তা মাথা নিচু করে' কী যেন ভাবছ। চোখে চোখ রেখে শোনো... তা নইলে বলতে ইচ্ছা হবে কেন ?

—বলো।

—নি আমাকে ফোন করল বার কয়েক। উত্তর দিলাম না। এল বার দুই। কৌশলে তাড়ালাম। ভয় দেখালো কোর্টে যাবে। মনে মনে জানে গিয়ে ফল নেই। তবু দেমাক কি ছাড়ে ? গম্ভীরভাবে বললাম : দেরী করছ কেন, আজ-ই যাও।

—× × ×

আমাকে ভয় দেখিয়ে চলে যাওয়ার ঘণ্টা চার পরেই ফোন করল নি: টাকার বড় দরকার! হাজার দুয়েক টাকা যদি দিই! বললাম: হ্যাঁ, তোমাকে টাকা দিই, আর সেই টাকায় আমার বিরুদ্ধে তুমি মামলা রুজু করো! বলল মিনতি করে: মামলা করবো তোমার বিরুদ্ধে?... বললাম: টাকা দিতে পারি, আমার একটা প্রস্তাবে যদি রাজী হও।—কী প্রস্তাব? জিজ্ঞাসা করল নি। বললাম: এসো তবে আমার বাড়ীতে! আমি অসুস্থ, নইলে আমি-ই যেতাম!

—× × ×

টাকার সত্যিই দরকার। দায়ে পড়ে এল নি। তার আসার আগেই একখানি চিঠি রচনা করে রেখেছিলাম। সে আসামাত্র চিঠিখানি তাকে দেখালাম। বললাম এ-খানি নিজের হাতে কপি করে' তোমার নাম সই করে' যদি দিতে পারো, টাকা পাবে!

চিঠি পড়ে হাউ-মাউ করে উঠল নি। টুকরো-টুকরো করে' ছিঁড়ে ফেলল চিঠিখানা। ককিয়ে উঠল:—স্কাউনড্রেল!

—বাড়ি বয়ে এসে গালাগালি করছ!

চমকে গেল নি। ভিক্ষে করতে এসেছে, বুঝল: রাগ দেখানো সঙ্গত নয়। নরম হল কিছুটা। বলল:

—এ-চিঠি আমাকে দিয়ে লিখিয়ে নেয়ার অর্থ কি আমি বুঝি না?

—কে বলছে বোঝো না?

—এ-চিঠি লিখলে তোমার ওপর আমার তো কোনো 'ক্লেম'ই আর থাকবে না!

—এখন-ও কি আছে!

—কোর্ট থেকে থাকাবো!

—তবে এখানে কেন এলে? কোর্টে-ই যাও! আমি এক পয়সা দিতে পারবো না!

—দেখি দাও কি না!

বেরিয়ে গেল নি। এমনভাবে গেল, যেন এখনি যাচ্ছে মামলা রুজু করতে।

কিন্তু পরদিন সকালেই ফোনে সে আমার কুশল প্রশ্ন করল বড় মিষ্টি সুরে। এটা-সেটা অনেক কথা বলার পর জানালো—চিঠিখানি কপি করে' দিতে সে রাজী আছে। তবে সমস্ত ক্লেম এর দ্বারা যখন তাকে ত্যাগ করতে হচ্ছে তখন আরো বেশি কিছু দিতে হবে।

—সে-বিষয়ে অবশ্য 'কন্‌সিডার' করতে পারি। তোমার নামাঙ্কিত দুখানি চিঠির কাগজ নিয়ে তবে এসো!

বললাম গম্ভীরস্বরে। নূতন করে' আবার চিঠিখানি লিখলাম বেশ চিন্তা করে'। নি-র চিঠি বলে' যেখানি তুমি পাঠ করলে—ওখানি, বুঝতেই পারছ, আসলে কার লেখা?

চিঠিখানি কপি করার আগে টাকার কথা উত্থাপন করল নি। বললাম:

—কত চাও?

—অন্ততঃ পঞ্চাশ হাজার টাকা!

রাগের ভরে অশ্লীল একটা শব্দ বেরিয়ে পড়ল মুখ দিয়ে। নি তা গ্রাহ্য করল না। বলল:

—বিবাহ করলে আমার সন্তান-ই তো তোমার সমস্ত সম্পত্তির মালিক হতো!...অবশ্যই জানো, আমি মা-হওয়ার পথে!

কথাটা শুনে ক্রুদ্ধ বাঘের মত হঠাৎ চিৎকার করে' উঠলাম:

—দূর হও এখান থেকে! তোমার মুখদর্শন করতে চাই নে!

অন্য সময় হলে নি নিশ্চয়ই এর সমুচিত উত্তর দিত। আজ কিন্তু থমকে চমকে ওঠে বড় অসহায়ের মত তাকাল সে। চোখদুটি অকারণে হ্যাঁ—অকারণেই তো, জলে ভরে এল। বলল:

—মাথার ওপর ঈশ্বর কি নেই সু?

—যা করতে চাও তবে তার কাছে গিয়েই করতে পারো!...আমি একটা ফার্দিঙ-ও দেব না তোমাকে।

নির্মম সু ভরাজ্জ্ব এই নির্লজ্জ কাহিনীটা সহজভাবেই চলল বলে।

আশ্চর্য, একটু-ও তার বাধল না। আমাকে সে কী পেয়েছে জানি না! তার মত আমারো কি হৃদয় নেই, চরিত্র নেই, মন নেই, যৌবনের বেদনা বোধ নেই— অসহায় একটা আর্ত নারীর অন্তহীন এই আত্মাবমাননার করুণ ইতিহাস আমাকে শুনিয়ে-ই তার মুক্তি? আমি কি পাথর? নই মানুষ, নেই প্রাণ?

সু আমার দিকে চেয়ে-ও দেখল না। প্রকাশের সুযোগে মুক্তি পাওয়ার দুর্বার উত্তেজনায় সে অন্ধ। বলল:

—আমার রাগ দেখে, বুঝলে, নি একেবারে ঘেবড়ে গেল।...বললাম: সম্পত্তির জন্যেই এতদিন আমার ওপর শ্যেনদৃষ্টি দিয়েছিলে জানি।... দু-হাজার চেয়েছিলে, এখন তিন হাজার দিতে পারি। ইচ্ছা হয় লিখে দাও চিঠি—প্রমাণ দাও আমাকে কোনো ফ্যাসাদে ফেলার অভিসন্ধি তোমার নেই!

ভেঙে পড়ল নি। কেঁদে বলল:

—দেখ সু, তোমার ভরসায় কত জায়গায় কত দেনা করেছি!...এখন আমার এক পয়সা 'ইন্‌কাম' নেই যে শোধ দেব! সাহায্যকারীও কেউ নেই পাশে। মাস কয়েক বাদে এমনি আবার অসহায় হয়ে পড়বো যে ভাবলেই মনে হয় সুইসাইড্ করি!...তোমার ও-তিন হাজার টাকা নিয়ে আমি কী করবো?

—× ×

—আমার দেনাই হচ্ছে হাজার চারেক টাকা!

—× × ×

—এতদিন ভালবাসা দেখিয়েছ! আজ-ও কিছুটা দেখাও! আমাকে অপমান থেকে বাঁচাও!

বলতে বলতে নি সজল চোখে চিঠিখানি নিল। পড়ল। তারপর আত্মগতভাবে:

—যা হয় হক! ত্যাগ করতে চাইছ, করো, তোমার সঙ্গে জোর করে' আমি পারবো না!

বলে' নিজের নামাঙ্কিত একখানি কাগজের ওপর বেশ স্পষ্ট করেই

চিঠিখানি দিল কপি করে'। তলায় সই করল অনেকক্ষণ সময় নিয়ে। তারপর হঠাৎ ধরা গলায় :

—যাক তোমার ওপর কোনো দাবীই আমার আর রইল না! না থাক! নাও চিঠি!

নিলাম চিঠিখানি। লিভারের যন্ত্রণাটা যেন উঁকি মারছে।...বাঁ-হাতে পেটটা চেপে ধরে তাড়াতাড়ি চিঠিখানি পড়ে নিলাম। ঠিক আছে, ধন্যবাদ!

চেকবই বালিশের তলা থেকে বার করে' নি-র নামে দশহাজার টাকা লিখে দিলাম।

টাকার অংকটা দেখে নি খুসী, হ্যাঁ, খুসীই হল। আরোগ্য কামনা করে' উঠে দাঁড়ালো। এগিয়ে এ'সে আমার হাতদুটো জড়িয়ে ধরে' উঠলো ককিয়ে :

—বিদায় প্রিয়তম! আমাকে ভুলো না!

আচম্বিতে নিচু হয়ে আমার গালে একটা চুম্বন দিল। চোখ মুছে সোজা হয়ে দাঁড়ালো। খটখটিয়ে চলে গেল তারপর। ফিরে তাকালো না।

চিঠিখানি বালিশের তলায় রাখলাম। যন্ত্রণা চাগিয়েছে। খানিকটা বমি হয়ে গেল হড়হড়িয়ে। শয়ন করতে হল খানিকক্ষণ পরে-ই। 'মেথিডিন ট্যাবলেট' একটা মুখে দিয়ে আর্তনাদ করলাম অসহায়ের মত।

পরের দিন সকালে শো-কে ফোন করলাম অসুখের কথা জানিয়ে। কী সৌভাগ্য, শো ধৈর্য ধরে আমার কথাগুলি শুনল। কাতর হয়ে বলল :

—মদ খেয়ে নিজেকে একেবারে শেষ করে এনেছ তো?

—আর আমার বাঁচতে সাধ নেই!

একটু থেমে অভিনয় করলাম :

—বুঝতে পারছি বেশিদিন আমার আর নেই! তাই দলিল তৈরী করবো ঠিক করেছি। বৃ-কে সম্পত্তি দিয়ে যেতে চেয়েছিলাম, সে তো নিতে চায় না। তোমার ওপর অভিমান করে নি-কে অবশ্য বিবাহ করতে

চেয়েছিলাম, কিন্তু নি-র সম্প্রতি একখানি চিঠি পেয়েছি, লিখেছে সে অন্যের বাকদত্তা।...নি-র ওপর সাময়িক মোহ আমার হয়েছিল, কিন্তু বুঝতে পারছি তুমি ছাড়া পৃথিবীতে আমার সত্যসত্যই আর কেউ নেই!

শো কোনো জবাব দিল না। মিনিট কুড়ি পরেই মথুরকে সঙ্গে নিয়ে এল। তারপর প্রত্যহ আসতে লাগল। ডাক্তারের নির্দেশ অনুসারে তদারক করতে লাগল আমাকে। পরশু তার গা ছুঁয়ে দিব্যি করলাম: মদ ছোঁব না আর।

—নি-কে দিয়ে লিখিয়ে-নেয়া চিঠিখানি শো-কে অবশ্য দেখিয়েছ?

—দরকার হয় নি! ওটা তো ওকে দেখাবার জন্যে লেখাই নি, লিখিয়েছি ভবিষ্যতে রক্ষা পাবার উদ্দেশ্যে!

একটু থেমে হেসে:

—এ-সব চিঠি কি ইচ্ছা করে দেখাতে আছে? হঠাৎ কোনদিন শো যদি এ-চিঠি নিজে থেকে দেখতে পায় তখনি এর উদ্দেশ্য সফল হবে!

—ভালো!

বলে' একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললাম। সু চমকে উঠল। বুঝল আমার মনোভাব। বলল:

—আমার সম্বন্ধে কী ভাবলে তুমি, আমি জানি! বন্ধু, পাপীর আছে মা-গঙ্গা, আমার আছ তুমি! গোপনকথা চিরকাল তোমাকে বলেই হাল্কা হয়েছি!

—এবার সুখী হও ভাই, তাহ'লেই হ'ল!

—হ'তে দিচ্ছ কই?...গতকাল যে-সমস্যা পাকিয়ে দিয়ে এলে এতে তো সুখ মুখ লুকিয়ে পালালো!

— × × ×

—কি, আজ শো-র কাছে যাবে, না তাকে হানা দেয়ার জন্যে বলে' পাঠাবো?

—তোমাদের মধ্যে আর আমাকে টেনো না ভাই!

—নাঃ, শো-কেই আসতে হল! শো এলে তুমি স্থির থাকতে পারবে ভেবেছ? হাত ধরে টানতে টানতে সে নিয়ে যাবে না?

চারপাঁচদিন কেটে গেল তারপর। শো এল না, একটা ফোন পর্যন্ত করল না। সু-রও এ-কয়দিন আর দেখা পাই নি। এই দুজন বন্ধুর মধ্যে কেউ একজন আসুক—এটা তো আর চাই-ই না—তবে কেন প্রতীক্ষার বেদনা জাগল অন্তরে? অহরহ কেন মনে হ'ল: পৃথিবীতে কেউ কারুর বন্ধু নয়, এবং প্রেম নেই পৃথিবীতে?

কেটে গেল আরো দুটো দিন। মোট সাতদিন। কী আশ্চর্য, আমি একটি একটি করে' দিন গুণছি যেন। মা জানেন: ঘরের দরজা বন্ধ করে' আমি বুঝি যোগ করছি, জপ করছি, বাইরের লোক হঠাৎ এসে দেখছে —গৈরিকপরিহিত আমি তরুণ তপস্বী; কিন্তু মনের গহনে এ কী বালক-চাপল্যের বিক্ষুব্ধ সমুদ্র! দুলছে, ফুলছে, উঠছে, ফুঁসছে!

*

'শকুন্তলা'-র সুটিং পুরোদমে চলেছে। ইচ্ছা হল, কার কোন্ দৃশ্য তোলা হচ্ছে একবার দেখে আসি। কিন্তু পাছে সেখানে শো-র সঙ্গে দেখা হয়ে যায়—এই জন্যে যেতে ইচ্ছা সত্যই হ'ল না। আশ্চর্য এই মন!

হাতে কোনো কাজ নেই—ক'লকাতার বাইরে একবার ঘুরে এলে কেমন হয়? মাকে কথাটা বললাম। মা তো তৎক্ষণাৎ রাজী। ছেলের এই 'যোগতপস্যা' তাঁর ভালো লাগছিল না। দাদু-ও খুসী মনে রাজী হয়ে গেলেন।

কোথায় যাব মনে মনে চিন্তা করছি, অপ্রত্যাশিতভাবে একটা মস্ত সুযোগ জুটে গেল হঠাৎ। বোম্বাই থেকে 'প্রোসারপিনা ফিল্‌ম্‌স্' জানাল 'সাধু কবীর'-নাটকের নাম ভূমিকা আমাকে দেওয়ার প্রস্তাব হয়েছে!

মনে মনে ধন্যবাদ দিলাম ঈশ্বরকে। তবু বলা বাহুল্য, দুদিন সময় নিলাম বিষয়টা যেন ভেবে দেখবার জন্যে। এবং দুদিন পরে 'বিশেষভাবে অনুরুদ্ধ' হয়ে-ই ভূমিকাটি গ্রহণ করলাম প্রোসারপিনার কর্তৃপক্ষকে কৃতার্থ করে।

সকালের সংবাদপত্রে এ-খবরটা যথারীতি প্রকাশিত হল। বোম্বাই-এর ওপর অভিমান করে একাধিক পত্রিকা লিখল: টাকার জোরে বোম্বাই ক'লকাতার সর্বোৎকৃষ্ট প্রতিভাটিকে ছিনিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

কেউ কেউ আবার অনুরোধ জানাল: শ্রী ব্, প্রকৃত প্রস্তাবে, ক'লকাতারই সন্তান। ক'লকাতাকে ত্যাগ করা তাঁর পক্ষে সমীচীন হবে না।

দলে দলে লোক হানা দিল বাড়ীতে। ফোনে কৈফিয়ৎ দিতে হল শতবার। শ্রীমতী বি, বহুদিন পরে, স্মরণ করলেন:

—আপনি নাকি বোম্বে চলে যাচ্ছেন?

—চলে যাচ্ছি কেন বলছেন? একটা কোম্পানী থেকে অনুরোধ পেয়েছি। যাচ্ছি কয়েকদিনের জন্যে। সুবিধা হয় কাজটা নেব। কাজ শেষ হলে চলে আসবো, এই তো ব্যাপার!...এতে এত হৈ চৈ?

—হৈ-চৈ হবে না? আপনাকে আমরা কত ভালবাসি জানেন?

—অশেষ ধন্যবাদ!...

—বোম্বে যাচ্ছেন শুনছি, ভেসে এল নি-র কণ্ঠস্বর:

—মনে হয়, ভালো করছেন না। বোম্বের দর্শকরা একটু 'হিরোইক' ছবি পছন্দ করে। আপনি কি তাদের খুসি করতে পারবেন?

—আপনি পাশে থাকলে বোধ হয় পারবো!

একটু খুসি করতে গেলাম নি-কে, অকারণে। নি সত্যসত্যই আনন্দে গলে গেল। বলল:

—উইস্ ইউ গুড্ লাক্ এ্যাণ্ড গড্ স্পীড্!...তা আমার কথাটা সত্যসত্যই মনে রাখবেন।...এতে ভবিষ্যতে আপনারো উপকার হতে পারে—পারে কি না বলুন?

—পারে!

—চান্স পেলে এখানকার বাসা তুলে দেব! ক'লকাতায় বড় কষ্টে আছি।...আমার মনে হয়, আপনার দ্বারাই আমার কায হবে।

—মহাত্মা কবীরের ভূমিকা অভিনয় করতে যাচ্ছ! খবর পাঠালেন শ্রদ্ধেয়া সী :

—ভারতবর্ষে তুমিই এ ভূমিকার উপযুক্ত শিল্পী। কাশীবাস করতে যাচ্ছি, আর এদিকে আসবো না! তবু ইচ্ছা রইলো—তোমাকে দেখবো কাশীতে!

—এই বুঝি বেড়াতে যাওয়া দাদুয়া! দাড়িতে হাত দিয়ে দাদু এলেন ঘরে :

—বোম্বে যাচ্ছিস তো ছবির ব্যাপারে!

—হ্যাঁ দাদু!

—তাই বল্!...কবে যেতে চাস?

—ফিফ্থ। আর দুদিন পরে!

—হোটেলে থাকবি না কারুর বাড়ীতে থাকবি গেস্ট হয়ে?

—দু'দিনের জন্যে যাচ্ছি, হোটেল-ই ভালো!

—এখান থেকে সব বন্দোবস্ত করে দিতে হবে তো!

—ব্ আছ? ভেসে এল অসুস্থ কণ্ঠের শীর্ণ স্বর। সু না?

—সু?

—হ্যাঁ ভাই! আজ এইমাত্র শুনছি, শো খবরের কাগজ পড়ে শোনালো, তুমি বোম্বে যাচ্ছ। ভাই আমি আর বাঁচবো না!

মুখ দিয়ে হঠাৎ আর কথা বেরুল না। সু তাহ'লে আবার অসুস্থ হয়ে পড়েছিল? আর আমি তার ওপরে অকারণে অভিমান করেছিলাম? বলল সু :

—তোমার কাছ থেকে আসার পর আবার ভাই শয্যা নিয়েছি। কী যত্নটাই করছে শো! বাড়ী যায় না! রাতে-ও থাকে রে ভাই! বললে শোনে না।

—কী হয়েছে বলছে ডাক্তার?

—মরণের রোগ ধরেছে। লিভারের দফা রফা। 'অ্যাসাইটিস' হওয়ার

উপক্রম। এবার গেলেই হয়! বোম্বে যাচ্ছ, ফিরে এসে বোধ হয় দেখবে তোমার চরিত্রহীন অমানুষ বন্ধুটা আর নেই!

—তোমার অসুখ, একটা খবর তো দিতে হয়!

—কে দেবে? শো? ও এখন পৃথিবী ভুলেছে! বেচারার দুদিন বাদেই শকুন্তলার সুটিং! কী যে করবে! বলছে তো কনট্রাক্ট ক্যানসেল করবে। আজ একটু ভালো আছি। আসো তো...

—যাচ্ছি সু!...

গেলাম তৎক্ষণাৎ। সু উঠে বসল। একেবারে বিবর্ণ হয়ে গেছে বেচারা। দৈহিক অনাচারের ছবি ফুটেছে মুখের ছবিতে, কপালের রেখায়, চোখের কোণে!

একখানা চেয়ার টেনে নিয়ে তার কাছাকাছি বসলাম, বললাম:

—শো আসে নি?

—আসেনি কি! এসেই তো আছে!

শো এল 'ব্রোমোফাইলিনের' শিশি নিয়ে। এক চামচ খাওয়ালো সু-কে। আমাকে দেখে লজ্জিত হল কি পুলকিত হল, বোঝা গেল না। কৌতুক করল সু:

—আমাদের জন্যে বু কলকাতা ত্যাগ করছে!

শো এ কৌতুকে যোগ দিল না। অবশ্য মুখখানি তার অত্যন্ত বিষণ্ণ দেখাল।

—কোন্ ডাক্তার দেখছেন?

—দেখছেন সেরা ডাক্তার মিঃ চ্যাটার্জী। বলছেন ভালো হয়ে যাবো! আর হয়েছি!

—হবে না তো কি?

বলল শো হঠাৎ বেঁকিয়ে:

—ঢের ঢের মানুষ দেখেছি, তোমার মত ছেলেমানুষ দেখি নি কখনো!

—তোমার মত মেয়েমানুষও দেখি নি কখনো!

বলল সু:

—একটা মাতালকে বাঁচাবার জন্যে এ কী প্রাণপণ চেষ্টা! লোকে ভাববে : টাকার জন্যেই বুঝি এই সব সেবার ছলনা। আরে ভাই, সমস্ত সম্পত্তি লিখে দিতে চাইলাম, বেচারা কেঁদে আকুল। বলল : কী হবে ও-সব নিয়ে।

—আবার ওই সব কথা!

—আমার ছাই ওই সব কথা ছাড়া এখন অন্য আর কিছু মনেই আসে না।...কবে তুমি বোম্বে যাচ্ছ?

—ফিফ্‌থ্‌!

—ফিরবে কবে?

—দশ পনেরো দিনের মধ্যেই বোধ হয়!

—বোম্বের কাজ নিয়ে কি ভালো করছ বন্ধু?

—ভালো করছেন না তো কা!

এতক্ষণে কথা বলল শো :

—বড় হতে হলে বোম্বে কেন, সারা পৃথিবীটাই তো ঘুরতে হবে!

—বোম্বে যাওয়া তাহ'লে সমর্থন করছ?

বলল সু :

—ব্র-প্রতিভা বুঝতে পারে, এমন রসিক কি আছে বোম্বেতে?

—রসিক কি থাকে, রস সঞ্চার করে' মানুষকে রসিক করে' নিতে হয়!

কি জানি কেন, শো-র কথাগুলি আমার ভালো লাগল না। মনে হ'ল বন্ধু সু-র কথাই ঠিক, বোম্বে গিয়ে আমার তেমন লাভ হবে না। ডাকছে বটে, কিন্তু বুঝবে না!

শো তখন গ্লুকোস গুলছিল মাথা নিচু করে। সু-কে সেটা খাইয়ে দিয়ে হঠাৎ কী মনে করে উঠে গেল ঘর থেকে।

কি আশ্চর্য, আমি যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। এই কিছুদিন আগে পর্যন্ত যার সান্নিধ্য আমার কাছে স্বপ্নোপম মধুর বলে' মনে হ'ত, আজ তার সান্নিধ্য, মনে হল, এড়াতে পারলেই যেন বাঁচি।...সোজা হয়ে বসলাম। সু বলল :

—বোম্বে তুমি যেয়ো না ব্র!

হাসলাম। কিন্তু সংশয় রয়ে গেল অন্তরে। বোম্বাই আমার 'প্রেম' গ্রহণ

করতে পারবে বলে ধারণা হ'ল না। বোম্বাই চায় ছুটোছুটি, লুটোপাটি, রঙ্গারঙ্গি, লঙ্গালঙ্গি! ওখানকার ছবিতে কোথায় সেই সাত্বিকতা, সেই প্রসন্ন ধীরত্বের আনন্দ, প্রেমসাধনার সেই সূক্ষ্মসৌন্দর্যের প্রশান্তি? ওখানকার মানুষ তো দেখি দুর্দান্ত, দামাল। তারা খোলাখুলি, তারা গলাগলি। আমি যেখানে নারীর গায়ে হাত না-দিয়েই প্রেমসৌন্দর্যের আনন্দ ফোটাই, তারা সেখানে শুধু গায়ে হাত-দেয়া নয়, কাঁধে তুলে ছুট দিতে না-পারলে প্রেমজীবনে পায় না তৃপ্তি। প্রেমের ব্যাপারে অ্যামেরিকা যদি নবতরুণ, বোম্বাই তবে 'নওল কিশোর'! আর, আমি কবে যৌবন গিয়েছি পার হয়ে। আমি কি বোম্বাই-কে মুগ্ধ করতে পারব?...নি-ও তো বললেন: বোম্বাই গিয়ে আমি ভালো করছি না!

—বোম্বে তুমি যেয়ো না!

সু বলল আবার।

—কেন যাবেন না, নিশ্চয়ই যাবেন!

বলে' শো প্রবেশ করল ঘরে। হাতে খাবারের প্লেট আর চায়ের ট্রে। রাখল আমার সামনে।

—সবদিকে খেয়াল আছে ভদ্রমহিলার!

বলল সু, একগাল হেসে।

খুবই অস্বস্তি বোধ করলাম।...কাপে চা ঢালতে লাগল শো।

—আমাকেও একটু দেবে?

ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করল সু।

—খাবে তুমি? না! তুমি আর একটু গ্লুকোস খাও!

শো বলল স্নেহপ্রসন্ন সুমধুর স্বরে।

সু-র বাড়ী থেকে ফিরলাম আর মিনিট দশেক পরে। সু বলল:

—তোমার সঙ্গে নিচে আর নামবো না ভাই!

—না, না, তুমি নামবে কি?

শো আমার সঙ্গে এল। দালান পর্যন্ত এলে বললাম:

—এবার যাও! সু একলা আছে!

শো তবু আসতে লাগল। কথা বলতেই হ'ল। বললাম :

—বাড়ী ফিরছ কবে ?

—সু একটু ভালো থাকলেই ফিরবো। তা তুমি তো আর যাবে না বলেছ !

—তা বলেছি !

—দোষ হয়তো করেছি, কিন্তু দুঃখ রয়ে গেল ভাই, তোমার মত মানুষ-ও সাধারণের মত ব্যবহার করলো ! ক্ষমা করলো না !

—হয়তো আমি অসাধারণ কিছু নই !

—ও !

চমকে উঠলাম শো-র 'ও' উচ্চারণে। জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালাম তার মুখের দিকে। শো বলল :

—সেদিন পরীক্ষায় জয় লাভ করেছ বলে তোমার ধারণা। সু-র-ও ধারণা তাই। কিন্তু ভেবেছ কি আজ-ই চলছে পরীক্ষা ? আর সে-পরীক্ষায় প্রতিমুহূর্তে তুমি পরাজিত-ই হচ্ছ ?

—× × ×

—সু-কে ভালবাসি, এটা তো নতুন ঘটনা নয় প্রিয়বন্ধু !

শিউরে উঠলাম অন্তরে। তবু সরলতার ভাণ করলাম :

—হঠাৎ এ-কথা তুলছ কেন ?

—কেন তুলছি ?

বিষাদের হাসি হাসল শো। বলল :

—বন্ধু হয়ে-ও সেদিন তোমার সঙ্গে ছলনার খেলা খেলেছি, সেই কারণেই কী দুঃখ পেয়েছ, অন্য কোনো কারণে নয় ?

—কী বলছ তুমি সুমিতা ?

—তবে আমার ভুল হয়েছে ! ক্ষমা করো।—

বলতে বলতে শো পিছন ফিরল। হনহনিয়ে চলে গেল দালান পার হয়ে ঘরের দিকে।

ধরা পড়ে চোরের মত খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম কাঠ হয়ে

ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, ঠিক এই সময়েই কাজের ভার নিয়ে ক'লকাতার বাইরে আমাকে যেতে হল। বেঁচে গেলাম। ক'লকাতায় থাকতে হলে শূন্যগর্ভ 'মর্কট বৈরাগ্য' নিয়ে কর্মবিহীন তামসিকতার মধ্যেই থাকতে হত আচ্ছন্ন।...ভালোই হল, কিছুদিনের জন্য অন্ততঃ শো থেকে আমি বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলাম। মেলামেশার মাধুর্যের মধ্যে স্বভাব-জীবনকে শাসনে রাখা অসাধ্য না হলে-ও সুসাধ্য নয় সব সময়। দেহসত্তার ত্রুটি বিচ্যুতি সম্বন্ধে নিত্যসচেতন থাকতে গিয়ে শিল্পীমনটাকে অহরহ নিচের দিকেই দৃষ্টি মেলে রাখতে হয়। এই জন্যে মিলন নয়, বিচ্ছেদেই বোধ হয় শিল্পীমনটা সজাগ হয়ে থাকতে পারে সুন্দরের ধ্যানে।

সুন্দর যদি হতে চাই—শো থেকে আমি তফাতে থাকব, বোম্বে গিয়ে আমি 'ডায়েরী'তে লিখলাম : তফাতে না থাকলে প্রেম হয় না, সুরের প্রেম।

ঈশ্বর করুন, শো-র সঙ্গে আর কখনও যেন আমার সাক্ষাৎ না হয়। প্রার্থনা-ও করলাম কোনো এক বিহ্বল মুহূর্তে।

বোম্বেতে আমাকে মাসখানেক থাকতে হল। 'কবীর' নাটকের 'স্ক্রিপট' পড়লাম, কনট্রাক্ট-এ সই করে এ নাটকের ছোট-বড় সকল শিল্পীর সঙ্গে কয়েকদিন ধরে' আলাপ পরিচয়-ও করলাম।...মহরতের সভায় ক'লকাতার বিখ্যাত অভিনেতা বলে সকলেই আমাকে আন্তরিক শ্রদ্ধাসম্মান দেখালেন।

মন কিন্তু টিকল না! বারবার ছুটে এল ক'লকাতার পথে। রাশি রাশি চিঠি পেলাম প্রত্যহ। মা লিখলেন, দাদু লিখলেন, কমলা লিখল, ফুলও লিখল, লিখল সু, লিখলেন বি এবং নি, লিখলেন বু, অ ও পি—শুধু শো-ই লিখল না একটা পংক্তি! কমলার একটা চিঠিতে কেবল জানলাম—শো একদিন এসেছিল আমাদের বাড়ীতে : মার সঙ্গে গল্প করেছিল অনেকক্ষণ।

আর সু-র চিঠিতে: শো ফিরে গেছে তার বাড়ীতে, 'শকুন্তলা' নাটকের সুটিং-এ যোগ দিচ্ছে নিয়মিত।

বোম্বে থেকে ক'লকাতায় ফিরতে—শো নয়, নি দেখা করতে এলেন সবার আগে। সত্যি তাঁর জন্যে কোথাও চেষ্টা করি নি—করার তেমন মন-ও ছিল না, মনেও ছিল না। লজ্জিত হলাম খুবই। বললাম, দশদিন পরে কবীরের সুটিং সুরু হবে, তখন গিয়ে নিশ্চয়ই তাঁর কথা উত্থাপন করবো কোথাও।

একটু ক্ষুণ্ণ হয়েই ফিরলেন নি!

সন্ধ্যায় ক'লকাতার বন্ধুদের সবার বাড়ীতেই একবার করে গেলাম। যেতে কী ভালোই যে লাগল। সবাইকেই বড় নতুন বলে মনে হল! কী যে সমাদর দেখালেন শ্রীমতী বি!

সু-র বাড়ীতে গেলাম, দেখা হল না। বুঝলাম শো-র কাছে গেছে সে। সাত-পাঁচ ভেবে শো-র বাড়ী পর্যন্ত গেলাম, সাত-সতেরো ভেবে গাড়ী নিলাম ঘুরিয়ে।

বাড়ী ফিরে এলাম রাত দশটায়।

সেই রাত্রেই হন্তদন্ত হয়ে এল সু। আহ্লাদে বুকে জড়িয়ে ধরল আমাকে। বলল:

—এসেছ! বাঁচলাম! কথা কয়ে বাঁচবো!

দেখলাম সু-র নবীন বরবেশ। বাবুয়ানায় সে অবশ্য খুবই অভ্যস্ত। আবার বিচিত্র বেশধারণে-ও সুপটু: কখনো সাহেব, কখনো পাঞ্জাবী, কখনো আবার অলস বিলাসী বাবু বাঙালী। আজ তাকে দেখলাম বাঙালী বেশেই; শান্তিপুরী ধুতি পরেছে কুঁচিয়ে, গায়ে দিয়েছে গিলে-করা পাঞ্জাবী, গলায় দুলিয়েছে জরীপাড় চাদর, পায়ে সাদা সোয়েটের গ্রিসিয়ান স্লিপার। কানের পাশে ভরভর করছে এসেন্সের গন্ধ! চেহারাটা শীর্ণ হলে-ও বেশ একটু চকচকে দেখাচ্ছে! বুঝলাম, নবজীবনের নূতন বসন্ত দ্বারে তার জাগ্রত।

—শো-র বাড়ীতে ছিলাম।

বলল সে ঃ

—বাড়ী ফিরে শুনি তুমি এসেছিলে—সোজা চলে এলাম তাই।

—বেশ করেছ।

—শো-র বাড়ীতে যদি যেতে একবার। কী 'মিস' করেছ জানো না। আজ যা গান গাইল শো, শুনতে যদি...এমন গান কখন-ও শুনি নি রে ভাই!

—শো ভালো গাইবে এতে আশ্চর্যের কী আছে?

—না ভাই সবদিন গান জমে না। একই গান একই গলায় কোনদিন মনে হয় নিস্তেজ, কোনদিন মনে হয় একেবারে প্রাণমাতানো।

—এখন বেশ ভালো আছো তাহলে—

—তা আছি। খাওয়া হয়েছে?

—এইমাত্র হল।...তুমি খাবে?

—আরে না না। শো-র শাসনে আর কী যা-তা খাওয়ার যো আছে? সামনে বসে ওজন করে ভদ্রমহিলা খাওয়ায়।...এই তো খেয়ে এলাম। এখন তো ওখানে গিয়ে আমাকে খেতে হয়। আর বাড়ীতে যদি খাই, কী খেয়েছি লিখে রাখতে হয় দেখাবার জন্যে।...

—× × ×

—আচ্ছা চলি ভাই। তুমি শুয়ে পড়ো। কাল বৈকালে আসবো। মার সঙ্গে দেখা করবো। তুমি সন্ধ্যের সময় কোনো 'এনগেজমেণ্ট' যেন রেখো না। শো-র কাছে যেতে হবে।

সু চলে যাবার পর অনেক রাত পর্যন্ত জেগে রইলাম। সু-র সুখে সুখী হওয়া উচিত, মনে মনে বললাম চেঁচিয়ে। কাল বৈকালে-ই শো-র কাছে যাবো, যাওয়া উচিত! জটিল মনের কুৎসিত যত রহস্যাভিমানকে মানুষ দমন করতে পারে না বলেই কষ্ট পায়, অসামাজিক চিন্তা বা কর্মে মেতে ওঠে।—সু-কে তুমি ফিরে পেয়েছ, এতে আমি আনন্দিত-ই হয়েছি, তন্দ্রাঘোরে বললাম শো-কে, এবার যেন শান্তি পাও তুমি। কোনো দুঃখ,

কোনো দ্বন্দ্ব, কোনো সংশয়ের প্রশ্রয় আমি আর দেব না। শ্রদ্ধা দিয়েছ—এতেই আমি কৃতজ্ঞ। যা বাস্তব, যা অবশ্যম্ভাবী—হাসিমুখে তা যেন মেনে নিতে পারি সহজে।

কিন্তু সহজে মানতে পারলাম কই? সু-র ওপর সত্যসত্যই আমার ঈর্ষা নেই, শো-র প্রতি নেই মোহাকর্ষণ, তবু—পরদিন বৈকালে, সু আসার আগেই, বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেলাম অন্যত্র।

পরদিন সু এল আমি যখন টম্বু-কে দিয়ে বিছানাপত্র 'হোল্ড অলের' মধ্যে বাঁধাচ্ছি। বিস্মিত হল সু। বলল:

—ব্যাপার কী? যাচ্ছ নাকি আবার কোথায়?

—হ্যাঁ ভাই! লখ্‌নৌ। মা যাচ্ছেন।

—মা যাচ্ছেন?

—হ্যাঁ! বাবার চিঠি এসেছে আজ পাঁচ-সাতদিন হ'ল। লিখেছেন: অনতিবিলম্বে ফিরে যেতে। বম্বেতে ছিলাম বলে মা আমার জন্যে অপেক্ষা করছিলেন।...বীরেন্দ্রর বড় অসুবিধা হচ্ছে। কমলা-র সামনে পরীক্ষা, লেখাপড়ার ক্ষতি হচ্ছে খুব-ই।...আজ যাচ্ছেন সকলে।...

—তুমি-ও যাচ্ছ!

—ভেবে দেখলাম, একবার যাওয়া উচিত। সপ্তাহখানেক পরে ফের তো বোম্বে ফিরে যেতে হবে। একবার বাবার সঙ্গে দেখা করে আসি!

—ক'লকাতা একরকম ছেড়ে দিচ্ছ তাহ'লে?

—এ-কথা বলছ কেন? 'কবীরের' কাজ শেষ হলেই তো পুনর্মূষিকো ভবামি।

—যাই মা-র সঙ্গে একবার দেখা করে আসি!

বিষণ্ণ সুরে বলল সু:

—ভেবেছিলাম এই কয়দিন তুমি, আমি আর শো—তিনজনে মনভরে আনন্দ করবো। কত সব প্ল্যান করেছিলাম মনে মনে।

—সে সব পরে হবে!

—আর হয়েছে! বলে' উঠে গেল সু।

বাবার কাছে কোনো কালে স্নেহসমাদর যে পাব—স্বপ্নে-ও তা আমি কখনো ভাবি নি। বীরেন্দ্রকে সঙ্গে নিয়ে ষ্টেশনে বাবা এসেছিলেন, কামরা থেকে নেমে তাঁকে প্রণাম করতেই তিনি দু'বাহু প্রসারিত করে' আমাকে আলিঙ্গনে বদ্ধ করলেন। মস্তক আঘ্রাণ করে আশীর্বাদ করলেন অনেকক্ষণ ধরে'। মা সেই দৃশ্য দেখলেন পরমপুলকে। আনন্দে তাঁর চোখে জল এল।

সমস্ত পরিবেশটাকে সত্যসত্যই এবার বড় আপনার বলে' মনে হ'ল।... বাড়ী পোঁছে দেখি, বাবার শয়নকক্ষেই আমার স্থান হয়েছে। এ-গৌরব এতদিন বীরেন্দ্র-ই ভোগ করে' এসেছে! দিনকতক সে বেচারা বাবার সান্নিধ্য ও স্নেহ থেকে বঞ্চিত হল!...অবশ্য বীরেন্দ্র এতে এতটুকু ঈর্ষা অনুভব করল না।—জ্যেষ্ঠ পুত্রই তো পিতৃরাজ্যের অধিকারী, মা-র কাছে বলল কৌতুক করে'।

অফিস থেকে ফিরে বাবা প্রত্যহ আমাকে নিয়ে তাঁর পরিচিত বন্ধুবান্ধবদের গৃহে বেড়াতে বেরুলেন। পুত্রগৌরব স্পষ্টতঃ প্রকাশ করলেন না বটে—কিন্তু তার কার্যকলাপে কথায় বার্তায় এবং ব্যবহারে প্রতিনিয়তই প্রকাশ পেল। নানা বিষয়িনী বিদ্যা নিয়ে আলোচনা করলেন আমার সঙ্গে। মাকে একদিন বললেন বালকের মত উচ্ছ্বসিত হয়েঃ বু আমাদের এম্-এ পাশই করে নি, কিন্তু পাঁচ-সাতটা বিষয়ে এম্-এ সে দিতে পারে যে কোনো মুহূর্তে!

—তুমি একদিন কলকাতার বাড়ীতে চলো না বাবা, দেখবে বড়দার ঘরে কত বই! দিনরাত পড়ে বড়দা! কত লেখে!

বলল ফুল, আমার কোল ঘেষে এসে।

সুদূর শৈশব থেকে বাবার স্নেহে আমি বঞ্চিত, মা ও বোন দুটির করুণায়

ফিরে পেলাম আমার নির্বাপিত জ্যোতিঃসম্পদ। বীরেন্দ্রর মুখে শুনলাম কমলা ও ফুল আমার কর্ম-কৃতিত্ব ও গৌরবের কথা নানাভাবে বাবাকে লিখত। আমার সম্বর্ধনা সভার সমস্ত রিপোর্ট তাঁর কাছে তারা পাঠিয়েছিল যথাসময়ে। শুধু তাই নয়, আমি যে একজন সন্ন্যাসিকল্প সাত্ত্বিকচরিত্র এ-কথা মা-ও একবার গোপনে বাবাকে লিখেছিলেন। নাকি ভয়-ও করছিলেন : আমি বোধ হয় খেয়ালবশে সন্ন্যাসী-ও হয়ে যেতে পারি। উত্তরে বাবা নাকি লিখেছিলেন, বু র এবার বিবাহ দিয়ে দেয়া সঙ্গত। তা' গুরুদেব, কি কারণে জানি না, আমার বিবাহ দিতে নিষেধ করে গেছেন। বলে গেছেন, আমি যদি ইচ্ছা করে কোথাও বিবাহ করি, তবেই তা' সুখের হবে, নয়তো তা নিদারুণ দুঃখের করবে অবতারণা।

বাঙলাদেশ থেকে অহরহ এই সমস্ত রিপোর্ট পেয়ে আমার সম্বন্ধে বাবার ধারণা পাল্টে গেল। স্পষ্টতই তিনি মন্তব্য করলেন : সিনেমা-রাজ্যে প্রবেশ করলেই যে ছেলেরা বদ হয়ে যায়, এ-ধারণার মূলে কোনো সত্য নেই।

লখনৌ-এ পাঁচ ছ-দিন থেকেই আমি বুঝতে পারলাম, বাবার বাইরেটা লৌহ-গাম্ভীর্যের বর্ম দিয়ে ঢাকা হলে-ও ভেতরটা পুষ্পের মত মৃদু ও কোমল। ...আনন্দভরে দাদুকে একটা চিঠি লিখে বসলাম এই মর্মে।...

'কবীরের' সুটিং সুরু হবে বলে' তাড়াতাড়ি আমাকে ফিরতে হল—এবার কিন্তু আরো কিছুদিন লখনৌ থাকতে আমার ইচ্ছা ছিল। বাবা বললেন :

—কতদিন লাগবে এ-বই শেষ হতে?

—বছরখানেক বোধ হয়!

—খুব সাবধানে থাকবে! স্বাস্থ্যের দিকে সর্বদা রাখবে নজর, আর লেখাপড়াটা ছেড়ো না—

বলে' বাবা একটু থামলেন। তারপর :

—সুবিধা পেলেই চলে এসো এখানে! বাড়ীর সঙ্গে সম্বন্ধটা রাখতে হয়! একেবারে উদাসীন হওয়া ভালো নয় খোকা!

প্রণাম করলাম বাবাকে। তিনি আমার মাথাটা দু'হাতে জড়িয়ে ধরলেন। ললাটে চুম্বন করলেন। আশীর্বাদ করলেন:

—জয় লাভ করো জীবনে!

অকারণে আমার চোখে জল এল।

ক'লকাতায় ফিরে দাদু-কে আবার নূতন করে' বাবার কথা বর্ণনা করলাম। দাদু আনন্দে হাসতে হাসতে বুঝি কেঁদেই ফেললেন। তাঁর চোখদুটি জলে চক চক করতে লাগল। বললেন তিনি:

—তোদের বাপ্-বেটায় তাহ'লে মিল হ'ল। এবার তবে বাপের কাছে নিশ্চয়ই পালাবি।...একলাটি, আমি বুড়ো, এখন কী করবো দাদুয়া?

দাদুকে ছেলেমানুষের মত দুহাতে জড়িয়ে ধরলাম।

—তোমাকে ছেড়ে কোথাও থাকতে পারবো না দাদু!

বললাম ধরা গলায়।

—বোম্বে যাচ্ছিস্ কবে?

—কাল-ই যাচ্ছি দাদু!

—তবে?

—সেখানে শুধু কাজের সময়টুকুই তো থাকবো!

—যা সবাই একে একে চলে'!

—অমন করে যদি বলো, ক্যান্সেল করবো কনট্র্যাক্ট!...যাবো না!...

—গাঁট্টা মেরে যাওয়াবো!

বলে' দাদু হাসলেন। মনটা উদাস হয়ে গেল সে-হাসির বিষাদে। দাদু বললেন:

—ছাড়তে না পারলে বাড়তে কি পারে কেউ? বড় হতে হলে অনেক ত্যাগ স্বীকার করতে হয় দাদুয়া!

—তা' আমি জানি! কিন্তু আমার জন্যে তুমি কেন করবে?

—দাদু হও, তখন বুঝবে কেন করবো!

দাদু বললেন আমার গায়ে হাত বুলিয়ে।

বোম্বে আর ক'লকাতা, ক'লকাতা আর বোম্বে করতে হল বেশ কয়েকটা মাস। এর মধ্যে আরো দুটি কোম্পানী থেকে "অনুরোধ" এল। দাদুর পরামর্শে সে-দু'টি গ্রহণ-ই করলাম।

শ্রীমতী নি এইসময় সাক্ষাৎ করতে এলেন একদিন। সে চেহারা তাঁর আর নেই। যেন ভয়ানক একটা রোগ থেকে সদ্য এসেছেন উঠে। মুখে চোখে বেদনা ও হতাশার ছাপ।—কী হয়েছিল, জিজ্ঞাসা করার আগেই আমার হাতদুটো তিনি জড়িয়ে ধরলেন পরম আবেগে। ধন্যবাদ দিলেন উচ্ছ্বাসিত ভাষায়।

বললেন ঃ

—বোম্বে থেকে "ভেনাসের" কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে চিঠি পেয়েছি। আপনার 'রেফারেন্স' দিয়ে তাঁরা লিখেছেন।...সাতদিনের মধ্যেই বোম্বে যেতে হবে আমাকে।...

—আমি জানি মিস্ নি!

—বাল্যবন্ধুর কাজ করলেন আপনি। আপনাকে মনে রাখবো!

—× × ×

—এই সময়ে বোম্বে যাওয়ার সুযোগ যদি না হ'ত—বোধ হয় আমি 'সুইসাইড্' করতাম।...কী কষ্টে যে আছি!...আজ আমার কিছু নেই।

—আবার সব হবে মিস্ নি!

—আই হোপ আউ'ড্ এগেন রাইজ এণ্ড সাইন।...বোম্বে কি আমাকে এ্যাপ্রিসিয়েট্ করবে না?

—অবশ্য করবে।

—আপনার কথা আমি মনে রাখবো।...আপনার মত ভদ্র মানুষ সত্যি কোথাও দেখি নি। কিন্তু ভুল করে' কত নিন্দাই আপনার করেছি!... ওই সু-ই আপনার কত নিন্দা যে করেছে!

–সু আমার বিশেষ বন্ধু। অভিমান করে সময়-সময় যা' তা' বলে বটে কিন্তু সেইটাই তার আসল পরিচয় নয় মিস্ নি

—যাক সে-সব কথা! অতীতকে ভুলতে পারার নাম-ই তো 'প্রোগ্রেস্'। 'লেট্ দি ডেড্ পাষ্ট্ বেরি ইট্স্ ডেড্'। বোম্বে আপনাকে কি রকম 'রিসিভ' করলো?

—ভালোই!...আরো দুটি কনট্র্যাক্ট হবে শিগগীরই!

—তা তো হবে-ই! কত বড় লোকের আপনি নাতি! আপনাকে সকলেই 'চান্স' দেবে।...আপনার জন্যে আমারও চান্স হ'ল। কী বলে যে ধন্যবাদ দেব!

—কেন বারবার আমাকে লজ্জা দিচ্ছেন...আপনার নিজের গুণেই আপনি চান্স পেয়েছেন, আরো পাবেন। 'ভেনাসের' কর্তারা আপনার ছবি দেখেই আপনাকে পছন্দ করেছেন।

উৎসাহে, উত্তেজনায় নি-র বড়-বড় চোখদুটি জ্বল জ্বল করে' উঠল। বড় মায়া হ'ল দেখে।...বললেন নি :

—কিন্তু দেখুন, কলকাতার কত জায়গায় যাই, কেউ আজকাল আমাকে আর গ্রাহ্য করে না।

—গ্রাহ্য করবে, বাইরের 'সার্টিফিকেট' নিয়ে আসুন, দেখবেন সবাই আপনাকে গ্রাহ্য করবে।

—ঠিক বলেছেন।...ক'লকাতার বাসা তো তুলে দিতে হয়েছে। জানেন তো, এখন আমি দক্ষিণশহরতলীর একটা অখ্যাত গ্রামে আছি?

—জানতাম না তো!

—বড় কষ্টে আছি।' তবে এখন আর কোন বিষয়ে 'হাণ্ডিক্যাপ্ট্' আমি নই। এ্যাম্ নাউ ফ্রী।...আসবাব-পত্র যা আছে, সমস্ত বিক্রী করে' যাবো।...কিন্তু সেগুলোর কতই বা আর দাম হবে!...আপনি রাখবেন?

—কত টাকা আপনার দরকার?

—দরকার তো অনেক মিঃ ব্র!...বোম্বে গিয়ে বেশ কয়েকটা দিন হোটেলে তো থাকতে হবে!

—প্রথমটা তাই থাকবেন! তারপর কোনো একজন 'অভিনেত্রীর' বাড়ীতে 'গেস্ট্' হিসাবে থাকার চেষ্টা করবেন—খরচ কম হবে!

—তাই করবো!...আপাততঃ আমার পাঁচশো টাকা দরকার। সু-র কাছে আর চাওয়া যায় না, বেচারা অনেক দিয়েছে, অনেক করেছে। এবং শো, ভেরী জেনারস্ লেডী দিস্ শো ইজ্। অনেক করেছে অসময়ে। আমার পল্লীগ্রামের বাসায় পর্যন্ত এসেছে, থেকেছে, চাকরাণীর মত পরিশ্রম করেছে বিশেষ একটা কারণে।...কিন্তু আজ আর তার কাছে যাওয়া যায় না, চাওয়া যায় না।...ইয়েস্,

নি থামলেন হঠাৎ। তারপর আত্মগতভাবে :

—বোথ আর জাষ্টিফায়েড্ : আমার মুখ দেখা উচিত নয় মিঃ ব্!... কিন্তু কি করবো, বাঁচাতে তো হবে...লেট মি লিভেগেন, আমি বাঁচবো!

নি কী বলতে চাচ্ছেন, সব বুঝতে না পারলেও আভাসে অনুমানে কিছুটা বোধ হয় ধরতে পারলাম। লজ্জা ও বেদনা থেকে ফিরিয়ে আনার উদ্দেশ্যে স্পষ্ট কথাটাই তাই পাড়লাম :

—কবে যাচ্ছেন বোম্বে ?

—টাকাটা জোগাড় হলে-ই চলে যাই।

—আপনি প্রস্তুত হ'ন! টাকাটা আমি দেব!

—আসবাবপত্রগুলি পাঠিয়ে দিই তাহ'লে ?

—ওগুলো, ইচ্ছা করেন, অন্যত্র কোথাও রেখে যান! আমি আপনাকে টাকা ধারই দেব। যখন হবে, ফেরৎ দেবেন।

নি পরমোৎসাহে আমার হাতদুটো আবার চেপে ধরলেন। বললেন :

—এতসহজে দিতে রাজী হবেন, ভাবতেই পারি নি। শপথ করে' কথা দিচ্ছি, আপনাকে আমি ঠকাবো না : আপনার টাকা বাজে ব্যাপারে খরচ করবো না।...বোম্বে যাবো। নিজের পায়ে আবার দাঁড়াবো। তখন আপনার ঋণ পরিশোধ করবো।...সুযোগ যদি হয় আপনার হিরোইন হবো অন্ততঃ একটা কোনো ছবিতে! আমার বড় ইচ্ছা!...এখন তাহ'লে পল্লীর বাসাটা কিছুদিন রেখে যাই—কি বলেন?...আসবাবপত্রগুলো-ও থাক। বোম্বেতে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর বাসাটা তুলে দিলেই হবে!...

উৎসাহিত হয়ে বলে গেলেন নি।

'ভেনাসের' আহ্বানে নি চলে গেলেন বোম্বাই-এ, এ-খবরটা আমি-ই উদ্যোগী হয়ে সু-কে জানালাম।

—যাক, বাঁচা গেল!

বলল সু:

—'দানবী'টা বিদায় হল। শো কী বলে জানো তো? নিজের পেটের ছেলেকে অনাদরে অবজ্ঞায় মেরে 'ফেলে' নিজে যে-মেয়েমানুষ বাঁচতে চায়—তাকে বলতে হয় রাক্ষসী, দানবী।

উত্তপ্ত হয়ে উঠলাম হঠাৎ:

—শো-র অমন অবস্থায় পড়তে হয় নি সু, পড়তে হলে দেখতে অমন হীন কাজ না করে উপায় হয়তো থাকতো না।

—শিশুহত্যা তুমি সমর্থন করছ?

—মানুষ তা সমর্থন করে না। কিন্তু তুমি সু এটা মুখে এনো না! অন্য কেউ এটা বললে শুনবো, তোমার মুখে শুনবো না!

—অপরাধ?

—ন্যাকা সেজো না সু!...কিন্তু থাক অপ্রিয় আলোচনা! অন্যকথা বলো!

—বড্ড চটেছ দেখছি তবে চলি!

—× × ×

—কবীর তো শেষ হয়েছে। আরো কী সব ছবির দায়িত্ব নিয়েছ শুনছি!...আবার তাহ'লে বোম্বে যাচ্ছ?

—সুটিং সুরু হলেই যাবো।

—বোধ হয় আর ফিরবে না!

—সেই রকম-ই তো ইচ্ছা।

—যাও চলে! নি গেল পয়লা নম্বর 'কণ্টক'। বু যাক দোসরা নম্বর কণ্টক।...পাপের রাজ্যে পাপীদেরই হ'ক সুখসমৃদ্ধি অর্থাৎ আমি শ্রীযুক্ত সু,

বহুবল্লভ দুষ্মন্তের মত, নিষ্কণ্টক আনন্দে শকুন্তলার প্রেমমধু পান করি আর কালহরণ করি প্রেমালাপে।

—প্রেমালাপে এখন কি কিছু ব্যাঘাত ঘটছে ?

—ঘটছে না ? ক'লকাতায় আছ অথচ যাও না একবার, উপেক্ষা করছ সচেতন পৌরুষে, অতএব যা হবার তাই হচ্ছে। সু-বেচারার প্রেমালাপ জমছে না। শুধু করতে হচ্ছে ব্র-প্রশস্তি !

হাসলাম। সু তেড়ে উঠল কৃত্রিম ক্রোধে :

—অমন করে আর হেসো না। যত শীগগীর পারো ক'লকাতা ছাড়ো ! আমি বাঁচি। বলে' বাঁচি : ক'লকাতায় তুমি নেই, তাই আসতে পারো না !

—এখন-ই বলো না কেন ?

—বলো না কেন !

বলে' খিঁচিয়ে উঠল সু :

—কচি খোকা যেন ! আজ যাবে, না যাবে না ?

—দেখি !

—বুঝেছি !...যাও বাপু, বোম্বেতেই যাও !

—তাই যাবো !

পরিহাস করে' বললাম। কিন্তু যাবার দিন ক্রমশঃ ঘনিয়েই এল, মুখ লুকিয়ে চলে যাবার দিন এল ঘনিয়ে।

'শকুন্তলার জন্ম' বাজারে বেরুল। মনে মনে অহংকার ছিল : এ-ছবিতে বিশ্বামিত্র-ই বুঝি বাজিমাৎ করবে। শকুন্তলা কি দুষ্মন্ত মলিন হয়ে যাবে তার প্রভাবে।...কিন্তু একেবারে উল্টো ফল ফলল। বিশ্বামিত্রকে সাধারণে তো ভালো করে লক্ষ্যই করল না, যারা করল তারা নিন্দা করল গাল ভরে'। কোনো কোনো পত্রিকা উপযাচক হয়ে আমাকে উপদেশ দিল কত। 'ভাবের ন্যাকামি' আছে আমার অভিনয়ে—লিখল অনেকে। অর্থহীন ভাবে আমি নাকি তপশ্চর্যার ব্যাপারগুলো টেনে টেনে দীর্ঘ করেছি—মন্তব্য করল কেউ কেউ। কেউ কেউ আবার প্রশ্ন করল : কথা নেই, ঘটনা নেই, শুধু

ভাবের 'অভিব্যক্তি'—'সাইলেন্ট' যুগে ফিরে গেছি নাকি আমরা ?...এ-রকম লাইফলেশ অসাড় চরিত্রাভিনয় পয়সা দিয়ে দেখতে হবে—কলকাতার এটা দুরদৃষ্ট ছাড়া আর কী ?...ভাগ্যে শকুন্তলা ছিলেন কয়েকটা 'রীল' পরেই, তা' নইলে তো নীরস 'প্রাণায়ামের' কায়দা দেখতে দেখতে হাঁফিয়ে মরে যেতে হ'ত দম আটকে।...শো-কে অভিনন্দন জানালাম বন্ধুর ভাষায়।

অভিনন্দনের উত্তরে ক'লকাতার পত্রিকগুলির ওপর শো খুবই ক্রোধ প্রকাশ করল। আমি বললাম ঃ যা কৌতুকের বিষয়, তাতে ক্রোধ প্রকাশ করলে রসাভাস হয়।...

সত্যি, আমার বিরুদ্ধে নিন্দাবাদগুলি পাঠ করে' মনে প্রথমটা কৌতুকই অনুভব করলাম। কিন্তু যত দিন গেল কৌতুক রূপান্তরিত হ'ল অভিমানে। মনে হ'ল—ক'লকাতা ইচ্ছা করেই আমাকে বুঝতে চাইল না। এ-কথা সত্য—বিশ্বামিত্রের ভূমিকায় দেখাবার বিষয় আমার অল্প-ই ছিল, কিন্তু সেই অল্প বিষয়টুকুর মধেই প্রকাশরীতির কী নূতন আঙ্গিক আমি রচনা করেছি, কেউ-ই ধীরভাবে বুঝতে চাইল না!

দাদু প্রত্যক্ষঃ উত্তেজিত হয়ে উঠলেন এই সমস্ত সমালোচনায়। আমার ছবি সম্বন্ধে তাঁর খুবই আগ্রহ, আমি জানি। কিন্তু এ-বিষয়ে কোনদিন কোনো আলোচনা আমার সঙ্গে তিনি করেন নি। এবার কিন্তু করলেন। সাহস দিয়ে বললেন :

—ভয় পেয়ো না দাদু। এই ছবির অভিনয়-ই, আমি বলছি, সব থেকে ভালো হয়েছে। ছেলে-ছোকরা সমালোচকেরা কতটুকু বোঝে, কতটুকু চিন্তা করে?

—তবু তাঁদের দ্বারেই তো আমাদের যেতে হয় দাদু!

—না যেতে হয় না! অক্ষম যারা, তারা যায়! শক্তিমানেরা নীরবে সাধনা করে, কারুর দ্বারে যায় না। এতদিন তো ক'লকাতায় আছ, ক'জন সমালোচকের দ্বারে গেছ?

—এতদিন তো তাঁরা আমার প্রশংসা করেছেন। এতে কি প্রমাণ হয় না, যে ভালো যা তাঁরা দেখেন, বিনা তোষামোদে প্রশংসাই করেন?

—যা সহজ বুদ্ধিতে সুন্দর, যা গতানুগতিকতার মধ্যেই আপাতঃদৃষ্টিতে কিছু নূতন, সাধারণ সমালোচকেরা তার-ই প্রশংসা করে দাদু। 'ইজি বিউটি' সকলেই বোঝে, 'ডিফিকাল্ট বিউটি' সকলের পক্ষে বোঝা সহজ নয়, সম্ভব-ও নয়।

—সমালোচকেরা বলেন: যা সকলের জন্যে নয় তার মূল্য কি?

—তার মূল্য এই: তা বর্তমানে নিন্দিত হলে-ও সুন্দর ভবিষ্যতের সম্ভাবনা আনে। 'আর্ট ফর দি সেল্‌ফ্' হচ্ছে আজকের কথা, কিন্তু 'আর্ট ফর দি সোল' হচ্ছে আগামী কালের সান্ত্বনা। বিশ্বামিত্রে এই সান্ত্বনার নবত্ব আছে! অবশ্য এ-নবত্ব আস্বাদ করতে সময় লাগবে বৃ!

ক'লকাতার বাইরে অবশ্য, সময় কি জানি কেন, বেশি লাগল না। বোম্বাই ও মাদ্রাজের সমস্ত পত্রিকাই উচ্ছ্বসিত ভাষায় আমার প্রশংসা করল। সেই প্রশংসার বাণীগুলি চয়ন করে' নানাস্থানে বিজ্ঞাপন দিয়ে শ্রীযুক্ত বু কলকাতায় আমার নাম ও মর্যাদা রক্ষায় যথেষ্ট চেষ্টা করলেন, কিন্তু দাদু ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন ক'লকাতার উপর। বললেন:

—বোম্বেতেই তোর স্থায়ী বাড়ী করে দিই দাদু! থাকিস নি আর ক'লকাতায়!

—ক'লকাতার ওপর এমনি অকৃতজ্ঞ হবো?

বললাম শান্ত সুরে। দাদু এ-কথার জবাব দিলেন না।

কবীর বেরুল ওদিকে। নি-র একখানি পত্রে জানলাম, বোম্বাই নাকি সহস্রমুখ হয়ে উঠেছে আমার যশঃকীর্তনে। 'প্রসারপিনা'র কর্তৃপক্ষ উৎসাহিত হয়েছেন বিপুলভাবে। নাকি 'বিজ্ঞাপনে বিজ্ঞাপনে ভরিয়ে দিয়েছেন দেশ। কবীরের কাপি পাঠাচ্ছেন নানাস্থানে। ভারতের বাইরে-ও'।...রাতারাতি তবে ভুবনবিখ্যাত-ই হয়ে গেলাম! চীন, পারশ্য, রাশিয়া, জার্মানী ও ইতালি এবং অ্যামেরিকা থেকে এল উচ্ছ্বসিত প্রশংসাবানী। অনেকে জানালেন আমন্ত্রণ ৮

অনেকে জানতে চাইলেন আমার পরিচয়। লিখলেন বিদেশ থেকে অনেকে : ভারতবর্ষকে আমরা জানতে চাই। ভারতবর্ষ কী, কী তার ভাব ও ভাবনা, কী তার আদর্শ—ভারতীয় ভাবে কোথাও তার প্রকাশ দেখলে আমরা মুগ্ধ হই, নূতন কিছু পেয়েছি বলে' হই কৃতার্থ...মিঃ বু-কে ধন্যবাদ, তাঁর শিল্প-নৈপুণ্যে ভারতবর্ষকে আমরা দেখেছি!

উৎসাহিত হলেন দাদু। ক'লকাতার কতকগুলি সিনেমা-হাউসে 'কবীর' চিত্র আনাবার বন্দোবস্ত করলেন। এমনি অদৃষ্ট, কলকাতায় 'কবীর' দু-সপ্তাহের বেশি চলল না—কিন্তু বোম্বাই, মাদ্রাজ ও দিল্লীতে তা' চলল সপ্তাহের পর সপ্তাহ।

ক'লকাতায় আমার প্রতিষ্ঠার প্রদীপ তবে নিভে এল। অভিমানের অন্ধকারে একাকী করে' নিলাম নিজেকে। মনে হল ক'লকাতার সম্মান-ই আসল সম্মান। তা যে পেল না, তার জীবন ব্যর্থ!...

ব্যর্থ জীবন নিয়ে ক'লকাতায় বেঁচে থাকা অসম্ভব। যারা মান দিতে চাইছে, যাবো তাদের কাছে-ই! যাবো বোম্বাই!

সু-কে বললাম এ-কথা, একদিন বৈকালে। সু বলল নিষ্প্রাণ ভাবে :

—বিশ্বামিত্র কি কবীরের একটু প্রশংসা করেছে বলে' মনে কি করছ ওরা রসিক? ওদের ছবি দেখে বুঝতে পারো না ওরা কেমন?

—কেন, ওদের সব ছবি যে খারাপ, এ কথা আর্টিষ্ট হয়ে বলবো কেমন করে?...বিশেষ করে ওদেশে এখন এমন সব নূতন আর্টিষ্ট এসেছেন, যাঁদের সঙ্গে ইয়োরোপ অ্যামেরিকার যে কোনো প্রথমশ্রেণীর আর্টিষ্টদের তুলনা করা যায়!

—কারা তারা, শুনি নাম!

—কত নাম করবো?...শো-র কাছে শুনো!

উত্তেজিত হল সু :

—শকুন্তলার বিরহ-চিত্র দেখেছ বু? দেখতে দেখতে মনে হয় আমি আর জগতে নেই।...ভালো লাগে নি তোমার?

—শো-র চিত্র কার না ভালো লাগে সু ?

—তবে চলো তাকে অভিনন্দন জানাবে !

বললাম :

—অভিনন্দন জানাবো তুমি বললে, তবে ?

—চিঠিতে অভিনন্দন আমরা 'এ্যাক্সেপ্ট্' করি না। বলতে বলতে সু আবার উদ্বেলিত হল উচ্ছ্বাসে। আমার বোম্বাই যাওয়ার প্রসঙ্গ একেবারে চাপা পড়ে গেল।

বড় অসহায় মনে হল নিজেকে। ছিলাম যেন রাজপুত্র, মুহূর্তে হয়ে গেলাম পথের ভিখারী। দেশ বিদেশের অকুণ্ঠ প্রশংসাবাদ গণনার মধ্যেই আনতে ইচ্ছা হল না। কেমন যেন বিষণ্ণ বেদনায় চিত্ত অসাড় হয়ে রইল অহরহ।

সন্ধ্যা নামল। অন্ধকার হয়ে শুয়ে রইলাম ইজিচেয়ারটায়। দাদু বেরিয়ে গেলেন, শুয়ে শুয়েই তা' টের পেলাম। তিনি আমার মনোবেদনা বোঝেন বলেই আমাকে আজ বুঝি ডাকলেন না।

ইন্দ্রাসন এল একটু পরে। ঘরের আলো দিল জ্বালিয়ে। বলল :

—বিকেলে স্নান করলে না। কিছু খেলে না। শরীর খারাপ করেছ তো দাদাবাবু !

—করি নি রে ! তুই যা ! আলোটা নিভিয়ে দে !

—সত্যি ভালো আছ তো ?

—হ্যাঁ রে হ্যাঁ !

আলো নিভিয়ে চলে গেল ইন্দ্রাসন। খানিক পরেই কিন্তু এল ফিরে। আলো দিল জ্বালিয়ে।

—আবার জ্বালালি !

—সেই মেমসাহেব মেয়েটি আসছে !

কে আবার ?...উঠে বসতে হল। তারপর অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে :

—একি আপনি ! শ্রীমতী বি ! আসুন, আসুন ! আমি ভাবতেই পারি নি আপনি আসবেন !

—আলো নিভিয়ে শুয়েছিলেন, শরীর খারাপ নাকি ?

—মাথাটা বিকেলে ধরেছে। ও কিছু নয়!

—তবে তো আপনাকে কষ্ট দিলাম!

—না, না এ আমার সৌভাগ্য আপনি এসেছেন...তারপর কী খবর বলুন!

বি আমার মুখের দিকে নিষ্পলক দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন কিছুক্ষণ।

—কী চেহারা হয়েছে আপনার? শরীর বেশ খারাপ হয়েছে, মনে হচ্ছে...আপনার মুখচোখ দেখে তো মনে হচ্ছে খুবই অসুস্থ আপনি!

—ন্‌না!

বলে' একটু হাসতে গেলাম। বি বললেন আনমনে:

—মুখে কি রকম হতাশার ছবি! যেন কত কী হারিয়েছেন!

—হারাই নি কী?

—কী আবার হারালেন?

হেসে বললেন বি:

—বরং বলুন আমরা হারাতে বসেছি: বোম্বে তো চলে যাচ্ছেন?

হাসলাম।

—শো বললেন একটু আগে, কলকাতার মূর্খ পত্রিকাগুলোই আপনাকে তাড়াচ্ছে!

—'মূর্খ' বলছেন কেন? মনের মত কথা যাঁরা বললেন না, তাঁদেরি বলবো মূর্খ—এত ঠিক বিদুষীর কথা নয়.

অপ্রতিভ হলেন বি। একটু পরেই কিন্তু দৃঢ়স্বরে:

—আপনার অমন কৃতিত্বপূর্ণ অপূর্ব অভিনয়কে তাঁরা অমন ইতর ভাষায় নিন্দা করতে পারলেন আর আমরা তাঁদের বলতে পারবো না অরসিক?

—খুব বলুন। তাঁরা বলুন আমরা অপদার্থ, আর আমরা বলি তাঁরা অরসিক। শিল্পী ও রসজ্ঞের মাঝখানে এমনিভাবে রচিত হ'ক ব্যবধান। সুন্দর প্রেমের প্রকাশ করতে গিয়ে কুৎসিত বিদ্বেষের দিই প্রশ্রয়। দেশ-মানসের এতেই হবে কল্যাণ!...শিল্পজীবনেরো হবে উন্নতি!...

অপ্রস্তুত হয়ে বি মাথা হেঁট করলেন। বললাম:

—থাক যত বাজে কথা ! কেমন আছেন বলুন ?

—ভালো আছি !...বোম্বে যাচ্ছেন কবে ?

—দেরী আছে !

—এ-মাসের মধ্যে তো নয় ?

—কেন বলুন তো ?

—এ-মাসের শেষে 'টোয়েন্‌টি সিক্‌স্‌থ্‌' আমার বিবাহ। আপনাকে জানাতে এলাম।...থাকতে হবে।

উল্লাসে উৎসাহে বি-র একখানি হাত চেপে ধরলাম দুহাতে।

—থাকবো, নিশ্চয়ই থাকবো !

বললাম চেঁচিয়ে। আমার উৎসাহে পুলকিত হলেন বি। কৌতুক করলাম :

—কাকে ভাগ্যবান করছেন ?

একটু যেন লজ্জিত হলেন বি। মুহূর্তের জন্য। তারপর :

—সিনেমাজগতের কেউ তিনি নন। একজন ইন্‌জিনিয়র ভদ্রলোক। এতদিন জার্মানীর বন্‌ য়ুনিভারসিটিতে রিসার্চ করছিলেন। 'ডক্টারেট' পেয়ে ফিরেছেন।

—অনেকদিনের ভাবসাব ?

দাদুর ভঙ্গীতে, একটু চিবিয়ে চিবিয়ে কথাকয়টি উচ্চারণ করলাম। সরলভাবে বললেন বি :

—কলেজে যখন পড়তাম মাঝে মাঝে আসতেন বাড়ীতে। একদিন আমার ছবি দেখেন জার্মানীর একটা 'ফিল্‌ম্‌ ফেস্‌টিভ্যালে'। চিনতে পারেন। তারপর থেকে চিঠিপত্র লিখছিলেন নিয়মিত।

—তবে তো অমর পত্রসাহিত্য রচিত [illegible] গেছে নিভৃতে !

মৃদু হেসে মাথা নীচু করলেন শ্রী[illegible]ড় ভালো লাগলো তাঁর সরমসুন্দর নারীত্বের মঞ্জু-সৌজন্য। ব[illegible]

—সুখী হ'ন—বন্ধুর এই আন্তরিক শুভেচ্ছা রইলো ! আপনার বিবাহের আগেই যদি বোম্বে চলে যেতে হয়, যথাসময়ে ঠিক আবার আসবো, যোগ দেব আপনার প্রীতিমিলনে !...আপনাকে আমি ভুলবো না শ্রীমতী বি !

কৃতজ্ঞতার আনন্দে বি-র চোখ দুটি করুণ হয়ে এল। বললেন :

—বলছেন বটে ভুলবেন না, কিন্তু ভুলে যাবেন জানি। ধরুন সিনেমা-জগৎ থেকে যদি সরে যাই, তখনো কি মনে রাখবেন ?

—সরে যাবেন কিসের জন্যে ?

—ভালোবাসার জন্যে !

হেসে বললেন বি :

—এই মর্মে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি বলেই তিনি আমাকে গ্রহণ করতে সম্মত হয়েছেন।...তিনি মনে করেন, তাঁর পত্নী হওয়ার পর সিনেমা করা আমার পক্ষে আর শোভন হবে না।

—বিষয়টা কি তর্ক সাপেক্ষ নয় ?

—কিন্তু এটা তো আপনার প্রশ্ন, তাঁর না ! ভালবেসে তিনি আমাকে গ্রহণ করতে চাইছেন, একরকম করেইছেন, তাঁর জন্যে কোনপ্রকার ত্যাগই তো আমার পক্ষে কঠিন মনে করা সমীচীন নয় !

—ও-কথা মানি !...প্রেমের জন্যে নারী যুগে যুগে আত্মবিলোপের পথে স্বেচ্ছায় গেছে এগিয়ে !

—'আত্মবিলোপ' বলছেন কেন ?

— × × ×

—সিনেমা ত্যাগ করছি, কিন্তু সিনেমাই তো জীবনের সর্বস্ব নয়। আমার গৃহ আছে, সমাজ আছে, দেশ আছে, আছে বিপুলা এই পৃথিবী। সিনেমাকে আনন্দের কর্ম হিসাবে গ্রহণ করেছিলাম, মানুষের আনন্দের জন্য তা করতাম। আজ সিনেমা না করি, অন্যতর আনন্দের কর্ম তো করতে পারি। দেশ, সমাজ ও মানুষভাইদের যদি না ভুলি—আমি গান গাইব, সাহিত্য করবো, সমাজসেবার কা[illegible] এবং তাতেই হবে আত্মবিকাশ। প্রেমে তো আত্মবিলোপ হয় না, [illegible] নব নব পথই তাতে খুলে যায়।

বি-র একখানি হাত পরমাদরে হাতের মধ্যে তুলে নিলাম। কিছু বলবার আগেই বি বললেন আবেগদীপ্ত সুরে :

—সিনেমাকে প্রাণভরে ভালোবাসি, বাবা-ও যে এ ভালোবাসা সমর্থন

করেন আপনি তো জানেন। আপনাদের, বিশেষ করে আপনার ও শো-র, সাহিত্য ও বন্ধুত্ব ত্যাগ করা আমার পক্ষে যে কত কঠিন, আমি-ই তা জানি। তবু ভালোবাসার মানুষটি যা চায় তাতো আমাকে করতেই হবে। ভালবাসার জন্যে ভোগ যেমন সত্য, ত্যাগও তেমনি সহজ। ভালোবাসার জন্যেই তো সব ?

—আপনার বন্ধু হতে-পারার সৌভাগ্যে আমি কৃতার্থ।

বলে' বি-র চম্পাকল্প অঙ্গুলীগুলির ওপর একটি চুম্বন অর্পণ করলাম শ্রদ্ধাসম্ভ্রমে।...বি উঠে দাঁড়ালেন :

—আপনার শরীর দেখে বড় চিন্তিত হয়ে কিন্তু ফিরছি!...সাবধানে থাকবেন।...কত ভালোবাসি যে আপনাকে! কত চিন্তা হয় আপনার জন্যে...

—কিছু চিন্তা করবেন না। কিছুই আমার হয় নি!

বলে' উঠে দাঁড়ালাম কৃতজ্ঞ সৌজন্যে।

বি চলে যাওয়ার পর আলো নিভিয়ে আবার শুয়ে রইলাম। কিছুক্ষণ। আমার জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করতে পারে এমন মেয়ে যদি থাকত কোথায়, একবার ভাবলাম। বিষাদঘন অন্তরের অন্ধকারে, এ কী অদ্ভুত চিত্তবিকার, শো-র মুখখানি চাঁদ হয়ে উঠল জ্বলে'।...লজ্জায় এতটুকু হয়ে চোখ বুজিয়ে আবার অন্ধকার হলাম।

দাদু ফিরলেন। আমার ঘরে ঢুকে আলো দিলেন জ্বালিয়ে। এতক্ষণ অন্ধকারে এমনভাবে এখনো কেন শুয়ে আছি, জানতে চাইলেন না। সরাসরি বললেন সহজ সুরেই :

—বন্দোবস্ত করে' এলাম ব। 'স্যাণ্ড ক্রজে' আপাততঃ একটা বাসা মিলবে। কোর্টনি রোডের ওপর বাসা—বেশ ভালই। পরে তেমন বুঝিস, ...নের মত জায়গায় একটা ভালো বাড়ী নিস তৈরী করে'।...সঙ্গে চাকর, ...য়োয়ান আর বাবুর্চি যাবে। সব ঠিক করে' এলাম।

—দাদু আমাকে তাড়াতে পারলেই বাঁচে।

কৌতুক করতে গেলাম। বললেন দাদু :

—যা খুসি বল্‌ দাদু, কিন্তু ক'লকাতাতে আর নয়!...একটা কাগজ-ও তোকে সাপোর্ট করে কিছু লিখলো না। একজন মানী আর্টিষ্ট-এর মর্যাদা-ও জানে না কেউ!...এমন যে 'কবীর'—দেশবিদেশের লোকে দেখে শুনে পাগল হয়ে গেল, ক'লকাতার একটা লোক-ও তা' দেখে ভালো বললো না।

উঠে বসলাম। হঠাৎ অকারণেই:

—ক'লকাতা ছাড়তে কিন্তু ইচ্ছা হচ্ছে না দাদু—

—কে আছে তোর ক'লকাতায়?

উত্তেজিত হয়ে উঠলেন দাদু। তারপর আমাকে আর কিছু বলতে না না দিয়েই ঘর থেকে গেলেন বেরিয়ে।

শো-কে মনে পড়ল। শো থেকে অনেক তফাতে আজ আছি, কিন্তু দাদু জানেন না—দাদুর মত-ই আমার শিল্প সম্বন্ধে মত পোষণ করে আর একজন—আমার শো—এই ক'লকাতার-ই মেয়ে।

কি জানি কেন, শো-র জন্যে হঠাৎ মনটা কেমন-কেমন করে' উঠল। রাত যে অনেক হয়েছে, তা নইলে আজ এখনি চলে যেতাম তার কাছে!...

রাত তখন ঠিক দশটা। আহারের পর ঘরে এসে ফোনটার দিকে একবার তাকালাম। আচম্বিতে, অভিমানেই বুঝি, ফোনটা ককিয়ে উঠল:

—ক্রিক্রিং ক্রিং ক্রিং: শরীর নাকি খারাপ হয়েছে?

এ কী মেঘ না চাইতেই জল?...বিদ্যুৎবেগে ভেসে এল শো-র উদ্বিগ্ন কণ্ঠস্বর:

—এইমাত্র ঝি জানালো: তুমি নাকি ভালো নেই?

—ভাগ্যে ঝি তা জানালেন। তা নইলে তো খোঁজ-ই নিচ্ছিলে না।

—খোঁজ আমি নেব, না তুমি দেবে?

—তুমি বলো আমি দেব, আমি বলি তুমি নেবে। দেয়া ও নেয়ার মাঝখানে গজিয়ে উঠুক অভিমানের দুর্লঙ্ঘ্য পর্বত। এত বড় হয়ে উঠুক যাতে অতি বড় দুঃসাহসিক 'মাউনটেনীয়ার'ও পার না হতে পারে!...

—তোমার যত বাজে কথা। কী হয়েছে বলো না স্পষ্ট করে'।

—কিছুই হয় নি।

—তবে যে বি বলল !

—একেবারে শয্যাশায়ী ?...এসে দেখে যাও !

—যেতে পারি না ভাবছ ?

—এই রাত্রে ?

—তাকে কি ?

—এসো তবে !...'এসো এসো ঘন বরষায়' !

—এখন করছ কি ?

জিজ্ঞাসা করল শো। কৌতুক করলাম :

—ক'লকাতা থেকে রাতারাতি পালাবার জন্যে 'হোল্ড অল' বাঁধছি।

— × × ×

—হ্যালো !

—ক'লকাতা-কে তুমি ক্ষমা করো প্রিয়বন্ধু !

—মায়ের মত স্নেহময়ী আমার এই ক'লকাতা। অনেক পেয়েছি। অনেক দিয়েছে সে। দিয়ে দিয়ে অহংকার দিয়েছে বাড়িয়ে। এখন পেতেই চাই !...না পেলে অভিমান যদি করি, দোষ কার ?

— × × ×

—চুপ করে আছ যে !

—কি বলবো !...কী বেদনায় যে আছি, তুমি কি বুঝবে ? এ-কথার জবাব এল না মুখে।...শো বলল :

—তুমি ক'লকাতায় আর আসবেই না ?

—আসবো বৈ কি। যেমন ভাবে তুমি চাইতে, তেমন ভাবেই আসবো, আসবো যুবরাজের মত, ভিক্ষুকের মত নয় !...ওতে আমার লজ্জা !

শো নীরব হয়ে রইল কিছুক্ষণ। জিজ্ঞাসা করলাম :

—আজকের মত তবে কথা শেষ ?

—তোমার সঙ্গে কি কথার শেষ আছে, প্রিয়বন্ধু !

—তবে আদেশ করো কাল আবার যাই তোমার কাছে। প্রাণভরে কথা কয়ে আসি !...একবার ডাকো !...

—হায় রে কপাল! যাকে মনে প্রাণে ধ্যানে জ্ঞানে অহরহ ডাকি, সে-ই আজ অসহায়ের মত আদেশ চান আসার জন্যে!

—মন রাখা কথা বললে না তো?

একটু খুঁচিয়ে দিলাম ইচ্ছা করেই:

—বলতে কি চাও আগের মত আমার জন্যে এখনো অনুভব করো প্রাণময় সেই মধুর সৌহার্দ?

—না করলে বাঁচবো কী নিয়ে?

—× × ×

—আমি জানি বন্ধু, কোথায় তোমার বেদনা! গভীর রাত্রে ককিয়ে কেঁদে উঠি তার জন্যে! কিন্তু দুঃখ এই, তুমি বুঝেও আমাকে বুঝলে না!

—× × ×

—সরে যাচ্ছ যাও! কিন্তু আশা দিয়ে যাও, আশা নিয়ে যাও! বন্ধু, বেদনার বন্ধনে আমি নারী, কিন্তু চেতনার আনন্দে আমি তো শিল্পীও বটে!...শকুন্তলার বিরহ কি শুধু রক্তমাংসের একটা মানুষের জন্যে, স্বপ্নসুন্দর মহান কোনো জীবনপ্রেমের জন্যে নয়? নারীর আশ্রয় পুরুষে, তা তো জানো। কিন্তু জানো কি শিল্পীর আশ্রয় কোথায়, কোন্ দেবপুরুষের প্রেমপ্রসন্ন ব্রতাদর্শে?

—বোধ হয় জানি!

—বুদ্ধি দিয়ে জানো! হৃদয় দিয়ে মানো না! তা যদি মানতে এত দুঃখ আমাকে দিতে না!

—× × ×

—প্রিয়বন্ধু, সু-র জন্যে আমি সব দিয়েছি, নিষ্ঠাবতী আমি সু-র প্রেমে। কিন্তু যা সে নিতে পারে না, দিতে পারে না, কাকে তা দেব, কার কাছ থেকে তা নেবো? প্রিয়জনের প্রেমে পাই যৌবনের প্রাণ, কিন্তু যৌবনের গান পাই কবিজনের প্রতিভায়।.. প্রাণ খুব বড় জিনিষ, কে না জানে, কিন্তু গানে যার আনুরক্তি, কবিজনে তার যে প্রয়োজন!

শো-র এসব কথার মত কথা আগেও শুনেছি। আজ কিন্তু নূতন করে রোমাঞ্চ জাগল যৌবনে। অতীতের আনন্দঘন স্বপ্ন-মুহূর্তগুলি বসন্তের বাতাসের মত পুনর্বার স্পর্শ করে গেল মর্মদেশ।...উৎকর্ণ হয়ে শুনতে লাগলাম শো-র গানের মত কথাগুলি :

—সার-অসার সবটুকু একসঙ্গে না পেলে পাওয়ার মত পাওয়া হল না বলেই সাধারণে মনে করে। আমি জানি, প্রিয়বন্ধু, তুমি তা কখনও মনে করো না।...সাধারণ পুরুষে যখন নারীকে চায়, চায় তার দেহ, মন, আত্মা সব। কিন্তু নারী যদি গৃহকর্মে ব্যাপৃত থেকে-ও যমুনাকূলে বাঁশরী শোনার সুরচেতনাটিকে সজাগ রাখে, প্রেমিক পুরুষ সেই তার ব্যাকুল সুরচেতনার প্রাণ যে পায়, গান যে গায়—এ কথা তুমি যদি না জানো তবে কে জানবে?...দেহ যেমন দেহকে টানে, সুর তেমনি সুরকে টানে প্রিয়বন্ধু! দেহাধিকারের অহংকারে সুরের স্বর্গটিকে-ও কেড়ে নেবে—এমন দম্ভ পুরুষ বা নারী, কেউ যেন আর কখনও না করে!...জানো কি, পৃথিবীর ঘরে-বাইরে মিলনের মধ্যে-ও কেন এত ট্র্যাজেডীর বেদনা ?

—× × ×

—বৃ, প্রিয়বন্ধু!

—সুমিতা!

—তবু ভালো, আবার একবার মিতা বলে' আমাকে ডাকলে!

—মনে মনে লক্ষবার ডাকি। ও-নাম আমার গুরুমন্ত্র সুমিতা!

—সত্য বলছ ?

—কেন এ-প্রশ্ন ? মনের মধ্যে টের পাও না ?

—পাই বোধ হয়। তবে আশা তো দাও নি, ভয় জেগে থাকে শিয়রে! ...মনে ভাবি, ওটা আমার মনের রচনা, মনের মায়া!

—মায়া নয় সুমিতা। মনের ঈশ্বর জানে, তোমাকে স্মরণ করেই আমি ধন্য!

—এ-কথা তুমি বলেই বলতে পারলে প্রিয়বন্ধু! কিছু যাকে দিলাম না, নিতে পারলাম না, তবু আপন মনের মাধুর্যে ধ্যানের পূর্ণতায় যে ধন্য, সেই [illegible] সেই তো বন্ধু। জীবনসুন্দরের সেই শিল্পীবন্ধু আমার তুমি!

কত দেখলাম কিন্তু তোমার মতটি তো দেখলাম না কোথাও।...দেহী মানুষের প্রণয়সুখে নিবৃত্ত হয়ে-ও প্রেমশোভন ভাবের সাধক যে অন্তর্মানুষ—সেই আমার কল্পবন্ধুর মহিমা দেখেছি তোমার চিত্রে, তোমার চরিত্রে। আরো, আরো দেখবো, অন্তর্জীবনে আরো বড় যে হতে চাই তোমার প্রেমে।...কই আশা দাও...কথা কইছ না কেন?...তুমি কই?

—এখনো আমি হই নি সুমিতা! কিন্তু হবো! তোমার প্রেম প্রকাশ করবো আমার প্রতিভায়! আজ কথা দাও, যখনি ডাকবো, পাশে এসে দাঁড়াবে। দুঃখে দেবে সান্ত্বনা, সুখে জানাবে আনন্দ। সংসারজীবনে চলার পথে ক্লান্ত হয়ে যদি বসে পড়ি, উৎসাহদানে শক্তি সঞ্চার করবে যৌবনে।

—ডাকবে তো?

—ডাকার অধিকার দাও সুমিতা!

—আশা পেলাম! আর আমার কোনো দুঃখ রইলো না!

সুমিতা বলল।

যেতে
না
হি
দিব

অমিয়রঞ্জন মুখোপাধ্যায়

শো-জীবনের অন্যতর একটি স্মরণীয় অধ্যায়।

অবস্থার পাকে পড়ে অসহায়া নারী সমাজজীবনের শান্তি হারায়, হারায় শুচিতা, কিন্তু মহত্তর জীবনের সন্ধানে অন্তরগহনে যদি তার ব্যাগ্রতা জাগে, জাগে কান্না, তবে সে কি আর পেছিয়ে থাকে? ব্যাকুল বেদনা-বেগে সে এগিয়ে আসে: লাভ করে মায়ের মহিমা, বোনের মাধুর্য।...ভাগ্যবিপর্যয়ে শো সিনেমার অভিনেত্রী হল, নারীজীবনের শান্তি ও সান্ত্বনা হারাল। কিন্তু স্নেহ ও সেবার অমিত আগ্রহ পুনর্বার তাকে ফিরিয়ে আনল দিদির মমত্বে, উদ্বুদ্ধ করল মায়ের মহত্বে: মহত্তর হৃদয়াবেগের আর্ত অনুরাগ যেতে দিল না তার শাশ্বতী শুচিতা, তার প্রীতিসুন্দর হৃদয়রুচির মাধুর্য!

তত্ত্বের বিচারে 'যেতে নাহি দিব' উপন্যাসের এই সত্য, এই প্রতিপাদ্য। রসের বিচারে অবশ্য অন্য কথা-ও আছে।

প্রিয়জনকে আমরা কাছে-কাছে রাখতে চাই, ভালবাসার আবেগে বলতে চাই: 'যেতে নাহি দিব'। কিন্তু বাস্তব সত্য নাকি এই: 'তবু... যেতে দিতে হয়'।

'যেতে নাহি দিব' উপন্যাসে বলা হয়েছে: ভালবাসা যেখানে সত্য ও সবল, সেখানে হারিয়ে-ও মানুষ ফিরে পায় প্রিয়জনকে। ভালবাসার জগতে যাওয়ার কথা-ই শুধু নয়, আসার কথা এবং থাকার কথা-ও প্রাসঙ্গিক।

পৃথিবীর জীবনে প্রতিনিয়ত কত কী আসছে, কত কী যাচ্ছে চলে। আমাদের চিত্তে সকলের জন্যেই যে সাড়া জাগে, এমন নয়। যেটির জন্যে সাড়া জাগে, একতারায় সুর লাগে, সেটির জন্যেই আমাদের আর্তি,

আমাদের কান্না : 'যেতে নাহি দিব'। কান্না যত গভীর ও আন্তরিক, চিত্ত ততই অধীর ও অসহায়।

এই অসহায় চিত্তের শক্তি কিন্তু অপরিসীম। মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়ে-ও সে প্রিয়জনকে আগলায়। এবং বিচিত্র কথা এই : মৃত্যু পরাস্ত-ই হয় : কিশোরের টানে স্বর্গতা বিজয়া তাই ফিরে আসে শোভনা-র হৃদয়ে; সামাজিক শাসন তাই হার মানে, কিশোরবেশে আসে উৎপল বিধিনিষেধের বেড়া ভেঙে; শত্রুতা ভুলে সুশীতল আসে পরমাত্মীয়ের স্নেহাবেগ নিয়ে, পালন করে তার 'লিলির নির্দেশ : দুঃসহ দারিদ্র্যের মধ্যে থেকে-ও অসহায় কিশোর বড় হওয়ার তাই পথ পায়, উচ্চশিক্ষা লাভের পায় সুযোগ সুবিধা।

প্রেমের চেয়ে প্রভুত্ব, জেদ, মোহ ও আত্মাভিমান-ই যেখানে বড়, সেখানে অবশ্য যেতেই দিতে হয়। জুলিয়া আত্মাভিমানের মোহে স্বামী কিশোর-কে তার দিদি শো-র কাছে যেতে দেবে না বলে' জোর করল। জোর টিঁকল না। বালক বয়সে কিশোর মাষ্টারমশায়দের নিষেধাজ্ঞা যেমন মানতে পারে নি, জুলিয়ার জেদ-ও তেমনি মানতে পারল না। ছুটে এল দিদির কাছে।

অন্য দিকে সুশীতল, শো-র প্রণয়ী, জেদ ও জোর ফলিয়ে শোভনা ও কিশোরের মিলনপথে পর্বতপ্রমাণ বাধা করল রচনা। কার্যকরী হ'ল না বাধা। বিক্ষিপ্ত প্রভুত্বের অহংকারে মৃত্যুর মতই বলতে গেল : যেতে দিতে হবে, যেতে দিতেই হয়। কিন্তু সে-অহংকার হার মানল প্রেমের আর্ততার কাছে। অবশেষে তাই সু-ই হোল ভাই-বোনের মিলনে সহায়ক। রহস্য উদ্‌ঘাটিত হলে দেখা গেল সু আর কেউ না, কিশোরের স্বর্গতা দিদি বিজয়ার সে স্বামী। কিশোর তাহ'লে তার দিদিকে ফিরে পেল স্বর্গ থেকে, জামাইবাবুকে সমাজ থেকে।

কিশোর যখন বিলাত থেকে জুলিয়াকে বিবাহ করে' ফিরল, শোভনা অভিমানে হল মর্মহীনা, যেতে দিতে হল জুলিয়াকে। সেই-সঙ্গে, কিশোরকে।

গ্রন্থের উপসংহারে শোভনা মাতৃবোধের ঔদার্যে অর্থাৎ আন্তরিক স্নেহ-ভাবের আনন্দে প্রমুদিত হয়েছে। জুলিয়া তখন শোভনার কাছে শুধু মাত্র ভ্রাতৃজায়া নয়, সে যেন তার পুত্রবধূ। মায়ের মন নিয়ে শোভনা জুলিয়াকে আনতে চলল। ইঙ্গিতে বোঝাল, কিশোরকে সে যেতে দেবে না, জুলিয়াকে সে যে ফিরিয়ে আনবে-ই!

প্রেমশক্তির এই অমোঘতার মর্ম শো তো জানে। তবু 'জানা' মানে-ই তো 'করা' নয় সব সময়? কিশোরকে শোভনা স্নেহদানে সাহায্যদানে বড়টি করে তুলেছে বলে' অভিমানে সে একদিন তার ওপর জোর ফলাতে চাইল।

'যেতে নাহি দিব'র বিষয়বস্তু তথাকথিত সমাজচেতনামূলক, সাময়িক তত্ত্বসমস্যার সমাধানে অথবা কামবেদনাসম্বন্ধীয় গতানুগতিক রস-রোমান্সের সংস্কারে প্রগল্‌ভ নয়। জীবনরহস্যের একটি দুরধিগম্য সত্যের উদ্‌ঘাটনে ঘরের বাইরে নিতান্ত ঘরোয়া যে-পরিবেশের প্রয়োজন, নূতন একটি আঙ্গিকরীতিতে তারই ভাবময় ভূমিকা লেখক রচনা করেছেন। দলনিরপেক্ষ একজন রসজ্ঞ সমালোচক লিখেছেন: "স্নেহপিপাসার অভিব্যক্তি, প্রাণের সঙ্গে পরিবেশের সংঘাত 'যেতে নাহি দিব'র উপজীব্য। অত্যন্ত সাধারণ কয়েকটি চরিত্রকে আশ্রয় করে' অভিনব আঙ্গিকে, সংযত সাবলীল ভাষায় স্নেহসত্তার এই সম্পূর্ণ বিকাশ সাহিত্যসৃষ্টির একটি শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।... সাহিত্যক্ষেত্রে প্রেমকে আশ্রয় করার রীতিই দেখা যায় সর্বাধিক। কিন্তু স্নেহমূলক প্রবৃত্তির পটভূমিকায় লেখক যে অপূর্ব চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন তাতে তাঁর প্রতিভাদীপ্ত শিল্পনৈপুণ্য অবশ্যস্বীকার্য। বিশেষতঃ মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে লেখকের তীক্ষ্ণ [illegible] গভীর অন্তর্দৃষ্টি মনকে অবিসংবাদিতভাবে আকৃষ্ট করে। [illegible] নাহি দিব' সাহিত্য-ক্ষেত্রে সমাদৃত হবে।"